প্রথম ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক

সম্পাদিত।

প্রথম বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে
,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,, জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, নবীনচন্দ্র সেন	,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়
,, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	,, হেমচন্দ্র মিত্র
,, চন্দ্রনাথ বসু	,, নরেন্দ্রনাথ বসু
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	,, ষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, রামগতি মুখোপাধ্যায়
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	,, চিরঞ্জীব শর্ম্মা
,, চন্দ্রশেখর বসু	,, দীনেশচন্দ্র সেন
,, নীলকণ্ঠ মজুমদার	,, তারণবন্ধু ভট্টাচার্য্য
,, দেবেন্দ্র বিজয় বসু	,, মোহিনী মোহন দত্ত
,, কালিনাথ দত্ত	,, গোপালচন্দ্র চৌধুরি
,, রজনীকান্ত গুপ্ত	,, সিদ্ধেশ্বর রায়
,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	,, হেমচন্দ্র ঘোষ
,, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	,, গোবিন্দচন্দ্র দাস
,, প্রমথ নাথ বসু B. Sc. London.	,, গোবিন্দমোহন রায়
,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,, রসিকলাল রায়
,, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	,, বামদেব দত্ত
,, কালিবর বেদান্তবাগীশ	,, ঈশানচন্দ্র বসু
,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী

কলিকাতা।

৫১ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট, সাধারণী প্রেসে শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

সূচিপত্র।

বর্ষশেষে দুই একটি কথা।

নবজীবনের একবৎসর পূর্ণ হইল। দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

বড়ই আহ্লাদের কথা, সকল সম্প্রদায়ের সুলেখকগণই নবজীবন পোষণ করিয়াছেন, আরও আহ্লাদের কথা সকল শ্রেণীর পাঠকেই আগ্রহের সহিত নবজীবন গ্রহণ করিয়াছেন। লেখক পাঠকের মর্য্যাদায় আজি আমরা অকিঞ্চন হইয়াও মর্য্যাদাবান্।

এত আহ্লাদের কথায় একটু বিষাদের কথা আছে। জনকত লোক সূতিকা হইতেই আমাদের উপর বিরূপ। ইহারা কথায় কথায় আমাদের উপর সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক আরোপ করিতে যত্নবান্। আমরা উত্তরে মুখ ফিরাইলে, বলেন, এই চলিল তিব্বতে; ইহারা এবার থিয়সফিষ্ট হইবে। পূর্ব্বমুখ হইলে বলেন, ঐ দেখ বুড়া ঋষিগণের না বুঝিয়া অনুকরণ করিতেছে, পশ্চিম মুখে ফিরিলে বলেন, এইবার ইহারা মক্কায় গিয়া ফতোয়া পড়িবে,—দক্ষিণমুখ হইলে, বলেন—যাক্, এইবার ইহারা যমালয়ে গেল।

এরূপে অঙ্কুশ ইঙ্গিত দেখিয়া আমাদের উপর যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদেরই নিকট আমাদের দীর্ঘজীবন কামনা করি; কেন না সেই দীর্ঘজীবনই কেবল তাঁহাদের অনর্থক আশঙ্কা তিরোহিত করিতে পারে। ভগবানের ভরসায় তাঁহাদের শাপে আমাদের বর হইবে।

ত্রুটি আমাদের বহুতর হইয়াছে; হইবার কথা বটে, কিন্তু শ্লাঘার কথা নহে; আমরা সকলের নিকট সেই অসংখ্য ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক; 'বড় গল্প নয়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ জন্য, আমরা সত্য সত্যই দুঃখিত। অনেকে ভাসা ভাসারূপে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে তাহাতে সম্প্রদায় বিশেষের উপর অযথা লক্ষ্য আছে; একটু ভাল করিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিবেন, সেরূপ কোন লক্ষ্য নাই; সুতরাং আমরা সেজন্য দুঃখিত নহি। সুরুচি কুরুচির কথা তুলিয়া কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিয়াছিলেন; সেজন্যও নহে। তবে গল্পটি যে ইংরাজি গল্পের অনুবাদ তাহা আমরা প্রকাশের সময় ধরিতে পারি নাই তজ্জন্যই দুঃখিত; ধরিতে পারিলে ওরূপ গল্প কখনই নবজীবনে স্থান পাইত না।

নবজীবনের আটকৌড়ে।

আটদিনে আট্‌কৌড়ে আছে পূর্ব্বাপরে,
নবজীবনের আট্‌কৌড়ে হল' সম্বৎসরে।
আটকৌড়ে বাট্‌কৌড়ে ছেলে আছে ভাল?
ছেলের মার কোল জুড়িয়ে
ছেলের বাপের মুখে ঢাল।

বাপে গালি দিয়া করে ছেলের আশীর্ব্বাদ
আত্মবন্ধুর খোয়ার করে যার যত সাধ।
চীৎকারে ধীৎকার দেয় ছন্দে বন্দে আর,
কুলোবাজায়ে ফেলেদেয় আঁতুড় ঘরের
পার।

এমন উৎসব আর কোন দেশে নাই.
গাল দিলে আশীর্ব্বাদ এই দেশে ভাই।
তবে,
যাও লেগে তেগে তেগে যে যেথানে আছ
বাজাও কুলো ছড়াও ধূলো
লম্ফে ঝম্পে নাচ,
গালাগালি চুণকালি কর মনের আশে
আহ্লাদে হাসিব মোরা জল্লাদের ভাষে।
নবজীবনের আটকৌড়ে পড়ে গেল ধুম,
চারিদিকে কুলোবাজে ধুড়ুম্ ধুড়ুম্,
হুলস্থূল তোলপাড় হয় বঙ্গভূম
সেই রবে ভেঙ্গে যায় কুম্ভকর্ণ ঘুম
অঙ্গে বঙ্গে রঙ্গে ঢঙ্গে নানারূপে আজি
বাহিরিল শত্রুমিত্র নানা বেশে সাজি।
নেংটা পরী কক্ষে লয়ে রুচির বাহার দিয়ে
অঙ্গনেতে সঞ্জীবনী এলো সঙ্গী নিয়ে,
এম এ বি এল এলো কত উড়ায়ে পতাকা
ভুবন বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আছে আঁকা।
সঙ্গে তার শাস্ত্রী মিস্ত্রী ইস্ত্রী কারীগর
সাম্যভাবে কাম্যলাভে সব ধনুর্দ্ধর
কাঁসাই ভাসায়ে এল নবীনা মেদিনী
ভারত করেছে মাটি তবু তেজস্বিনী;
বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য আসি উপস্থিত,
অষ্ট কপর্দ্দীব স্মৃতি প্রমাণ সহিত
সুরভি আইল মৃদু সুরভিসঞ্চারে
নীলপাড় লাগায়েছে গরবের ভরে।
সস্তাদরে কস্তাপেড়ে লম্বাকোঁচা দোল,
"এত সস্তা আর নাই" অহরহ বোল।
হাঁটু পাড়ি হামাগুড়ি এলো ভারতবাসী
তেই তেই থেই থেই গালি দেই হাসি
পাদমূলে বসি কেহ শিক্ষা লতে গিয়া,
গুরু গালি দিল এবে গুরুকে লইয়া।
শিক্ষা বটে দীক্ষা বটে কলির ব্যাভার,
আট্‌কৌড়ে দিনে কাণ্ডজ্ঞান নাহি আর
গলা উঠে মুখ ছুটে লাজ টুটে এবে;
যন যে বা গালি দিবা ডর কিবা তবে।

তবে,
বাও লেগে তেগে তেগে যে যেখানে আছ,
বাজাও কুলো ছড়াও ধূলো
লম্ফে ঝম্পে নাচ;
গালাগালি ঢলাঢলি কর মনের হাসে,
আহ্লাদে হাসিব মোরা জল্লাদের ভাষে।
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল
ছেলের মার কোল জুড়িয়ে
ছেলের বাপের মুখে ঢাল।
নাহি বোধ মানামান,
কেবল অসত্য প্রাণ
নিতান্ত নীচার্থ লঘুচিত্ত।
ভাষাকে সাজায় সাজে,
অলঙ্কারে, ঘসে, মাজে,
এসব লেখক বেশ্যাবৃত্ত।*
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব)জীবন ভাল?
পাঠকদের প্রাণজুড়ায়ে
লেখকদের উপর ঢাল।
নবজীবন সম্পাদক,
রাধাকৃষ্ণ উপাসক,
খেলে সেই সুচতুর খেলা,
হিন্দুধর্ম্ম উত্থাপক,
বিষ্ণু-ধর্ম্ম প্রচারক
কণিক ম্যাকিয়াবেলি চেলা। †
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে,(নব)জীবন ভাল,
পাঠকদের কোল জুড়ায়ে,সম্পাদকে ঢাল।

---

* "কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,বঙ্গীয় পাঠক সমাজ এইরূপ কুলটাবৃত্ত, লঘুচিত্ত, আত্ম-সম্মান-বোধ-হীন লেখকগণেরই আদর ও প্রতিপত্তি বেশী।"
প্রতিবাদ, নবজীবন সম্পাদক ও বিধবা বিবাহ। আলোচনা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

† "আর একটি বিষয় অক্ষয় বাবুকে কনগ্রাচুলেট করিতে ইচ্ছা হয়। সেটি অক্ষয় বাবুর সূক্ষ্মদর্শিনী, কণিক ম্যাকিয়াবেলি পদানুসারিণী

এই ত হিন্দু সমাজ,
এই পরিবার মাঝ,
পূতি গন্ধময়ী নারী, তাকি তুমি জান না?
কেবল ভাষার চোটে,
কেবল কথার জোটে,
পশার জাঁকাবে বলি, সত্য কথা মান না।*
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব)জীবন ভাল?
সম্পাদকে গালি দিয়া, মনের দুঃখ ঢাল।
চিরকাল গেল বয়ে,
এবে যারা প্রৌঢ় বয়ে,
অনুবাদকেরে সাথী করি,
পড়ে মনুসংহিতা,
অথবা ভগবদ্গীতা,
তারা ধর্ম্ম প্রচারক! মরি!
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে, ছেলে ভাল আছে?
প্রচারকে গালি দিয়া ভারতবাসী নাচে।
পুণ্যভূমি বারাণসী,
অন্নসত্রে অন্নরাশি,
ধ্বংশ করি অঙ্গপুষ্ট যার,
গৈরিক বসন পরি,
মুখে বলি শিব হরি,
সেই করে ধর্ম্মের প্রচার।*
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে দেখাও, আন।
সকলকে ছেড়ে দিয়ে চূড়ামণিকে টান;
নাহি কিছু সৎসাহস,
নৈতিক ভীরুতাবশ,
জনগত স্বতন্ত্রতা নাই,
ঘোর আত্মম্ভরী তায়,
শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়,
সৎকর্ম্মে কেবল বালাই।†
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে আপ্তসার কর,
নবজীবনেরে রেখে, শিক্ষিতকে ধর।
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য,
তব মুখে, অত্যাশ্চর্য্য,
তুমিই না শিক্ষিত? হা! ধিক্!
ধিক্ তব শিক্ষায়,
ধিক্ তব দীক্ষায়,
জীবনেতে ধিক্ ততো ধিক্।‡

বুদ্ধি। * * * * * * * * নবজীবন-সম্পাদক, বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক, আদর্শ নায়ক নায়িকা রাধা-কৃষ্ণের উপাসক, হিন্দুধর্ম্মের উত্থাপক মহাশয় যে অতি সুচতুর লোক, তাহা না বলিলেও চলে।" ঐ ঐ ঐ

* "একথা যিনি বলেন, তিনি হয়, সাধারণ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু পরিবারের কথা কিছুই জানেন না; অথবা জানিয়া শুনিয়া ভাষার চোটে, কল্পনার তরঙ্গে, পসার জাঁকানর লোভে সত্যের অপলাপ করেন। * * * * * * (হিন্দু) রমণীগণ সর্ব্ব প্রকার পূতিগন্ধ হইতে মুক্ত থাকিয়া* নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম পালন করিতেছে, এ অসম্ভব কথা প্রচার কর কেমন করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না।" ঐ ঐ ঐ।

* "আধুনিক ধর্ম্ম প্রচারক * * * * সম্ভবত প্রৌঢ় বয়সে কষ্টে অনুবাদকের সাহায্যে কিয়দংশ মনুসংহিতা বা ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন, নতুবা পুণ্যভূমি বারাণসীর অন্নসত্রে কিয়ৎকাল দেহ পুষ্ট হইয়া গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক ধর্ম্ম সমুদ্ধরণার্থ ব্রতী হইয়াছেন।" [ভারতবাসী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ]

† "সৎসাহসের পরিবর্ত্তে নৈতিক ভীরুতা, জনবিশেষের স্বাতন্ত্র রক্ষার পরিবর্ত্তে ঘোর আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি বিশেষ দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে।" [নব-মেদিনী। প্রবন্ধ 'তুমি না শিক্ষিত যুবক?'

‡ "* * * বিধবা বালিকার বিবাহ দেওয়া অন্যায়, তাহাদিগকে ব্রহ্ম-

আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছেড়া টি;
নবজীবনের দায়ে,এবার শিকি তেরে কাটি।
আপনারা ভোগসুখে,
থাক দেখি মুখে মুখে
বিধবায় বল ব্রহ্মচর্য্য।
লঘুচেতা স্বার্থপর,
কাপুরুষ—পামর,
এই তব শিক্ষা পারম্পর্য্য। *
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে নবজীবন আন,
একজনকে ছেড়ে দিয়ে দশ জনকে টান।
শকুন্তলা অভিজ্ঞান,
জয়দেব গীতিগান
পড়ি কর. শাস্ত্রের বিচার।
স্বর্গের দেবতাগণ,
পদক্ষেপে কুণ্ঠ হন,
নির্ব্বোধের সেথা অধিকার। †
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল?
ছেলের মার কোলজুড়ায়ে,
ছেলের বাপের মুখে ঢাল।

চর্য্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেও বলিয়া চীৎকার করেন, স্বদেশ হিতৈষী বলিয়া বুক ফুলাইয়া চলেন, আপনাকে অতি সুশিক্ষিত লোক বলিয়া মনে করেন। ধিক্ ইহাদের শিক্ষা, ধিক্ ইহাদের জীবন।"ঐ ঐ ঐ

* "বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে এক শ্রেণীর হৃদয় বিহীন, লঘুচেতা, স্বার্থপর, কাপুরুষ লোক জন্মিয়াছে, যাহারা সেইরূপ পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া, ও উৎকৃষ্ট ভোগসুখে নিজেরা থাকিয়া, দুঃখিনী হিন্দু বিধবাদিগকে উপদেশ দিতেছেন,"তোমরা ব্রহ্মচর্য্য কর, ব্রহ্মচর্য্যের সমান গুণ নাই।" ৩রা জ্যৈষ্ঠ, পতাকা।

† "অভিজ্ঞান শকুন্তলা উত্তর রাম চরিত, জয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থ পাঠ করিয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত

ভ্রূণহত্যা পাপকর্ম্ম,
বঙ্গে সনাতন ধর্ম্ম,
ব্যাখ্যা পুন হইবে সভায়,
সুকুলীন বংশজাত,
এম এ উপাধি গত,
সভাপতি থাকিবেন তায়।
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে তুল ঘর
লেখককে ছেড়ে দিয়ে সভাপতিকে ধর।
গদ্যে পদ্যে কুলোরবাদ্যে বাঙ্গালা হল স্থুল,
বঙ্গাঙ্গনে প্রলয়ের হয় যেন তুল।
সম্পাদক লেখকের প্রচারকের আর।
ক্রমেতে হইল এবে ত্রিকুল উদ্ধার।
শেষে বঙ্গবিধবার হইল খোয়ার,
প্রমাণ হলো ঘরে ঘরে হয় ব্যভিচার।
শতেকে নিরানব্বই বিধবা অসতী,
চীৎকারে বলিল বঙ্গে 'শ্রীপূঃ' মহামতি,
দেবানন্দ শান্তিপুর নাম মাত্র সার,
সাব্যস্ত সমস্ত বঙ্গ মেছুয়াবাজার।
শেষেতে সিদ্ধান্ত হল মিলি বিচক্ষণ,
বঙ্গদেশে সুজাতক নাহি একজন।
সুসিদ্ধান্ত তবু ক্ষান্ত নহে গণ্ডগোল;
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে চারিদিকে রোল,
কবি কহে না মিটিবে মিঠাই না পেলে
গিন্নি বলে এই লও হাতে হাতে পেলে।
তোমাদের গালাগালি আমাদের বর।
আশীর্ব্বাদ করি এবে সবে যাও ঘর।
ঘরে গিয়া গালাগালি কর মনের আশে,
আহ্লাদে হাসিব সবে জল্লাদের ভাষে।
এবার পেলে অল্পস্বল্প ভাল মুখে যাও,
ষষ্ঠী পূজায় দিব খই—বাকি যাহা চাও।

হওয়া বিড়ম্বনা। * * * কিন্তু ইংরাজি কথায় বলে যেখানে স্বর্গের দেবতাগণ পাদক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন, নির্ব্বোধেরা সবেগে সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হয়।" সোমপ্রকাশ ২০শে জ্যৈষ্ঠ।

নবজীবন।

১ম ভাগ।] শ্রাবণ ১২৯১। [১ম সংখ্যা।

সূচনা।

যাহা সকলেই বুঝেন, তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা; জানিয়া শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়া, যে এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বুঝাইলাম। তবে আর বলিব কি? বলিবার কথা অনেক আছে।

আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্রের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এত দিন ধরিয়া যে ভাবে সাময়িক পত্র সকল চলিতেছিল, সেইরূপ পত্রেই কি বর্ত্তমান বাঙ্গালির অভাব পূরণ এবং মানসিক তৃপ্তিসাধন হইবে? আমাদের তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালির হৃৎক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত। যখন তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, সেই এক যুগ; বিবিধার্থ সংগ্রহ, আর এক যুগ; বঙ্গদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাবে তৃতীয় যুগ; এখন আবার যুগান্তর উপস্থিত। নূতন দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড়িয়াছে; বঙ্গবাসী নূতন অভাব অনুভব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত; বাঙ্গালি আজি কালি নব উৎসাহে উৎসাহিত; আমরা এই উৎসাহের উৎসবে যোগ দান করিতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা বিবেচনা করি-

তেছি, এই কথাটি একটু বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। আরও দশবিধ কারণে আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, কিন্তু সে সকল কথার বোধ হয় কৈফিয়ৎ না দিলেও চলিবে।

ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মব্রত। পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোকের প্রতিবিম্ব পাইয়া প্রথমে ভারতবাসী ধর্ম্মের নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিল। ধর্ম্মের কথাই কহিতে লাগিল। খ্রীষ্টানের একেশ্বরবাদের কথা শুনিয়া আপনাদের প্রাচীন বৈদান্তিক এবং তান্ত্রিক একেশ্বরবাদ গৌরবে প্রচার করিল। মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন। দেশীয় ও বিলাতীয় একেশ্বরবাদে ঘোরতর বিতর্ক চলিতে লাগিল; ইংরাজি ও বাঙ্গালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তিকা প্রচারিত হইল। আন্দোলনে বাঙ্গালা মাতাইয়া মহাত্মা স্বর্গারোহণ করিলেন; ঝঞ্ঝাবাত্যা থামিল; তরঙ্গ কমিয়া আসিল; কিন্তু স্রোত চলিতেছে। সেই স্রোতের বাহিনী—তত্ত্ববোধিনী। সুতরাং প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী, কেবল ধর্ম্ম কথাতেই পরিপূরিতা। আমাদের দেশে কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব একটু না বুঝিলে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা কঠিন; কাজেই তাহাতে প্রত্নতত্ত্ব আসিল; ক্রমে দেহতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব আসিয়া পড়িল; চারুপাঠের জ্রূণ তত্ত্ববোধিনী-গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; যুগ হইতে যুগান্তর এই রূপেই হয়। য়ুরোপীয় ধর্ম্ম-হীন বিজ্ঞান ক্রমেই দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল; ধর্ম্মের স্রোত মন্দা হইল, তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্ব কথা আর কেহ পাঠ করিল না। তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রাণীতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন।

পদার্থতত্ত্বে প্রবেশ করিতে করিতে বঙ্গবাসীর ভূগোল ইতিহাসের বুভুক্ষা হইল; এই বুভুক্ষা নিবারণের জন্যই বিবিধার্থ সংগ্রহের অবতারণা। বাঙ্গালিকে নুটকা জাতির অবস্থা পর্য্যন্ত, নোবাজেমব্লা দ্বীপের বিবরণ পর্য্যন্ত,—শুনান হইল; বাঙ্গালি মধ্যে, কাশ্মীরের ইতিহাস শুনিল, রাজপুতগণের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিল; বহুকালের পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্থানে কর্ষিত হইল; জাতি-ভক্তি বীজের এখানে সেখানে অঙ্কুর দেখা দিল। বাঙ্গালি তখন অল্প স্বল্প জ্ঞান লাভ করিয়া উপদেশ লাভের জন্য ব্যস্ত হইল।

বঙ্গদর্শন এই উপদেষ্টা বন্ধু ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, ভারতী—উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক; ইহাঁদিগকে কাণে-কলমদেওয়া পাখীর কথা বলিতে হয় নাই; জল জমিলে বরফ হয়, বুঝাইতে

হয় নাই ; ভারতচন্দ্রের জীবনী বা রত্নাবলীর কেবল গ্রন্থ ভাগ বাঙ্গালিকে শিখাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়া উচ্চতর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে বালকের প্রলোভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয়, ইতিহাস ভূগোল ছিল না। বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালি-জীবনে, ও বঙ্গসাহিত্যে আবার যুগ প্রলয় হইল।

বাঙ্গালি কোম্‌তের প্রত্যক্ষ বাদ, ডার্ব্বিনের পরিণাম বাদ, রুষোর সাম্য বাদ, মিলের হিতবাদ ও স্বৈর বাদ, সাংখ্যের দ্বৈত বাদ, বেদান্তের মায়াবাদ, হিন্দুর অদৃষ্ট বাদ, এ সকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি হইতে শিখিতে লাগিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্ম দর্শনে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে তত্ত্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পুষ্টিতে জগৎ সংসার ব্যাপিয়া লইল ; মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালিকে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতলের কথা গভীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মত ধীরে ধীরে শিখাইয়াছে। জাপানের বাক্সর মত, পলাণ্ডুর কোষের মত যে আধ্যাত্মিক জগতের, স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহা বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই দেখাইয়াছেন। পুরাণে, ইতিহাসে,—দেবতত্ত্বে, সমাজতত্ত্বে,—কবিত্বে, সাহিত্যে,—সর্ব্বত্রই যে স্তরের নীচে স্তর আছে, বঙ্গদর্শন আজি বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন পৌরাণিক মহাদেবতার অন্তর স্তরে, যে, বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত তিনটী জড়শক্তির ভাব রহিয়াছে, কৃষ্ণ-চরিত্রের বাহ্যকোষ ভেদ করিলে, যে একটী মহান্ পুরুষ তন্মধ্য হইতে আবির্ভূত হন, দ্রৌপদীকে অন্তর্বীক্ষণে দেখিলে, যে একজন মহতী তেজস্বিনী আর্য্যরমণী দেখিতে পাওয়া যায়, দশ মহাবিদ্যার পৌরাণিক স্তর ভেদ করিলে, যে ভারতের অবস্থান্তর পরিণাম বুঝিতে পারা যায়, এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শনই বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে, পূর্ব্বতন সময়ের জন শ্রুতির স্তর ভেদ করিলে, মাতৃগুপ্তই কালিদাস ; মধ্যকালে যাহা ভারত-কলঙ্ক বলিয়া মনে ধারণা করিয়াছ, ইতিহাসের সূক্ষ্ম অস্ত্র লইয়া সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিবে, তাহাই ভারত-গৌরব। এমন কি, সে দিন যাহা শুনিয়াছিলে জালপ্রতাপের অত্যাচার, সেটি কেবল আসল ইংরেজের অবিচার। বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে কোম্‌তে। মহামনু—পুরাণের নারায়ণ ; কারলাইলের

অশ্রান্ত পরিশ্রমই—হিন্দুর প্রকৃত বৈরাগ্য। কবিত্ব সাহিত্যের স্তরোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে, কুমার-সম্ভবের শিব পার্ব্বতী অনন্ত জগতের অনন্ত কালের পুরুষ প্রকৃতি; দেখাইয়াছেন, যে, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি গূঢ় সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ; দুষ্মন্ত—কঠোর রাজ-ধর্ম্মের সহিত, দৃঢ় নিবিষ্ট সমাজধর্ম্মের সহিত—মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতির ঘোরতর সংঘর্ষণ। স্তরোদ্ঘাটন ব্যাপারে বঙ্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও উপেক্ষা ছিল না। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছেন, যে বাঙ্গালির আহার ভুষি, আমোদ বিভীষিকা। রামচন্দ্র বনে গেলে দশরথ বেহালা বাজান, কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঙ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় নব-মনুসংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে।

বঙ্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েরই অন্তঃস্তর দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছি। এই ব্যগ্রতায় যুগান্তর উপস্থিত।

স্তরোদ্ভেদ করিবার অভ্যাস বশত আমরা যেন ক্রমেই একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি, যে, সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে, একটি সাধারণ স্তর আছে। মানব-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব,—জড়তত্ত্ব,জীবতত্ত্ব,—পুরাণ,ইতিহাস—কবিত্ব,সাহিত্য—শ্রদ্ধা, ভক্তি—সকল স্তরের অন্তরে একটী মহান্ ও বিশাল স্তর, সকলের আধাররূপে, আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া, অবলম্বনভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই আধারের সহিত আধেয় সকলের সম্বন্ধ না বুঝিলে, কি অবলম্বনে জীবতত্ত্বাদি অবস্থিত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কোন বিষয়েই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এই যে সমুদ্রে কত জীব জন্তু, কত রত্নরাজি, কত পাহাড়, পর্ব্বত, কতপ্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে, সে সকলের আকৃতি প্রকৃতি বুঝিতে গেলে আমরা কি সমুদ্রের সহিত ঐ সকলের কি সম্বন্ধ তাহা না ভাবিয়া পরিষ্কাররূপে কিছু বুঝিতে পারি? তাহা পারি না। লবণাম্বু মধ্যে বাস করে বলিয়া, সাগরচর জীবগণের রক্ত মাংস কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃপ্রবাহ তরঙ্গাভিঘাতে পাহাড় পর্ব্বতের গঠন কিরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে, জলমধ্য হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া কিরূপে জীবগণ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধান করে, সামান্য উত্তাপে, আলোক অভাবে জলতলে শৈবালাদি কি কৌশলে বর্দ্ধিত হয়,—ইহার কোন একটি কথা বুঝিতে হইলেই,

অগ্রে সমুদ্রের প্রকৃতি এবং কৃতি বুঝিতে হইবে। যেরূপ সমুদ্রতত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া সাগর-চর জীবাদির আকৃতি বা প্রকৃতি সম্যক বুঝিতে পারা অসম্ভব, সেইরূপ যে বিশাল মহান্ স্তর সমাজতত্ত্বাদির আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থা পরিবর্ত্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া,—সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু, তাহা না বুঝিয়া,—সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব—সম্পূর্ণরূপে না হৌক, কিন্তু অংশ ত সকল তত্ত্বের একেবারে সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,—[illegible] ও তত্ত্বের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালি [illegible]খিতে দেখিতে এই অন্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, সেই মূলীভূত সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ [illegible]যম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান্ আশ্রয়-স্তরের নাম—ধর্ম্ম। নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে [illegible] বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, ধর্ম্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না।

এতদ্দিন পরে আমরা এই ভাবের আভাস পাইয়াছি মাত্র; ধর্ম্মের [illegible]শাদর ভাব যে আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা [illegible] আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব, এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে। আজি কালি বঙ্গদেশে যে অস্ফুটশক্তি [illegible]কাশোন্মুখী হইয়া নব-মুঞ্জরিত বঙ্গ-সমাজ-পাদপে একটু একটু দেখা [illegible]তেছে, যদি আমাদের দুর্ব্বল চেষ্টায় দশ দিনের জন্যও শীত বাতাতপ হইতে, কীট পতঙ্গ হইতে, তাহা সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। সিদ্ধি, মানবের সাধ্যায়ত্ত মধ্যে নহে। তবে সাধনা করিতে আমরা পারি বটে। সকলে বলুন, এই সাধনায় যেন আমাদের জ্ঞানকৃত ত্রুটি না হয়।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

শিষ্য। মহাশয়! আজ আপনাকে যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিব, শুনিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না। অনেকে অনেক কঠিন বিষয় আয়ত্ত করিয়াও, অতি সহজ ব্যাপার বিনা-উপদেশে বুঝিতে পারে না। আমি তাহারই এক জন।

গুরু। প্রশ্নটা কি?

শিষ্য। ধর্ম্মে কিছু কি প্রয়োজন আছে?

গুরু। ইহার কি কোন উত্তর কোথাও শুন নাই?

শিষ্য। শুনিয়াছি। যথা—ধর্ম্মে পরকালে উপকার হয়।

গুরু। সেটা কি সদুত্তর নয়?

শিষ্য। যে পরকাল মানে তাহার পক্ষে এটা সদুত্তর হইলে হইতে পারে। কিন্তু যে পরকাল মানে না? তাহার পক্ষে কি ধর্ম্মে কি কোন প্রয়োজন নাই?

গুরু। যে পরকাল মানে না, এমন একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, শোন সে কি বলে?

শিষ্য। সে বলিবে ধর্ম্মে প্রয়োজন আছে। কেন না ধর্ম্মে আস্থাশূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে সম্মত নহে।

গুরু। বাপু হে, ধর্ম্ম কথাটা লইয়া তুমি বড় গোলযোগ করিতেছ। কখন্ কোন্ অর্থে ইহা ব্যবহার করিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ধর্ম্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতি-শব্দের দ্বারা আগে নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য "ধর্ম্ম বিরুদ্ধ" "মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র" "ধর্ম্মসূত্র" ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায়, ইহার আর একটী নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালি একালে

আর কিছু থাকুক না থাকুক "নীতি বিরুদ্ধ" কথাটা চট করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়ত ধর্ম্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্ম্মাত্ম মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্ত্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্ম্মিক। এখানে অধর্ম্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ রিলিজন বা নীতির অনুমোদিত যে কার্য্য তাহাকেও ধর্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম্ম বলে। যথা দান পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্ম্ম। ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ম্মের নাম "Sin"—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—"Good deed" বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা চৌম্বুকের ধর্ম্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম্ম, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। যথা, "পরনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম্ম।" এই অর্থে মনু স্বয়ং "পাষণ্ড ধর্ম্মের" কথা লিখিয়াছেন, যথা—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে, ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥"

পুনশ্চ—"পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ"। আর ষষ্ঠতঃ ধর্ম্ম শব্দ কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।"

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম্ম কখন রিলিজনের প্রতি কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মতার প্রতি, এবং কখন পুণ্য কর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে, নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম্মে, কর্ম্মের লক্ষণ অভ্যাসে

ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে,ধর্ম্ম (রিলিজন)—উপধর্ম্ম সঙ্কুল,নীতি—ভ্রান্ত,অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতিও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।

শিষ্য। আমি এমন কি কথা বলিলাম, যে তাহাতে এ সকল বড় বড় কথা আসিয়া পড়ে?

গুরু। তুমি বলিলে, "ধর্ম্মে আস্থাশূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে।" এখানে তুমি নীতি অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছ। আবার যখন জিজ্ঞাসা করিলে, "ধর্ম্মে কিছু প্রয়োজন আছে কি?" তখন তুমি রিলিজন অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছ?

শিষ্য। কিসে বুঝিলেন?

গুরু। নীতিতেই আস্থা-শূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য। কিন্তু রিলিজনে যে আস্থা-শূন্য বলিয়া কেহ আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য নহে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। অথচ রিলিজনের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এইরূপ য়ুরোপীয় বিস্তর কৃতবিদ্য, ভাবুক, বিজ্ঞ, এবং সচ্চরিত্র লোক আছেন, তাঁহারা রিলিজনের আবশ্যকতা মানেন না। এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক এবং তুমিও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ "ধর্ম্মে কি কিছু প্রয়োজন আছে?"

শিষ্য। আপনি কেন মনে করেন না, যে আমি নীতিরই প্রয়োজন সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছি।

গুরু। আমি তাহা মনে করিতে পারি না, কেন না নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহে।

শিষ্য। যদি তাহাই হইবে, তবে এত দুর্ব্বিনীত লোক দেখিতে পাই কেন?

গুরু। দুর্বিনীত মনে করে, যে আমার নীতির বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সে কখন মনে করে না, যে আর সকলেরও নীতির বশবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন নাই। চোর ইচ্ছা করে না, যে অন্যে

তাহার ধনাপহরণ করুক, নরঘাতী ইচ্ছা করে না, যে অন্যে তাহাকে খুন করুক, পারদারিক মনে করে না, যে অন্যে তাহার ভার্য্যাহরণ করুক। অতএব দুর্নীতেরাও নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে।

শিষ্য। আপনি যে কয়টি উদাহরণ দিলেন, সে গুলি আইনের কাজ। হইতে পারে দুর্নীতেরাও ইচ্ছা করে না, যে আইন উঠিয়া যাক্, কেননা তাহা হইলে কেহই সমাজে বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কি নীতির প্রয়োজন স্বীকার করা হইল ?

গুরু। আইন নীতি মাত্র। ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিধিবদ্ধ বা প্রচারিত যে নীতি, তাহাই আইন। এই কথা তলাইয়া বুঝিলে বুঝিতে পারিবে, যে মানবাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র—হিন্দু নীতি মাত্র, হিন্দু ধর্ম্ম নহে। তাহার বিপর্য্যয়ে, আচার ভ্রংশ ঘটিলে ঘটিতে পারে, ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে না। কিন্তু সে পরের কথা। আইন নীতি; তাহার লঙ্ঘন সমাজ অথবা সমাজের মুখপাত্র রাজা দণ্ডিত করেন। আর কতকগুলি নীতি আছে, তাহা সমাজ বা রাজা দণ্ডিত করেন না, প্রকৃতি একাই তাহার দণ্ডপ্রণেত্রী। যথা, অধিক সুরা পান। রাজা ইহার দণ্ডবিধান করেন না। অনেক সমাজও ইহার দণ্ডবিধান করে না। মহাভারতে যদুবংশীয়দিগের ও অপরের মদ্যাসক্তির বর্ণনা যেভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, অতিশয় মদ্যাসক্তি তখন সমাজ কর্তৃক দণ্ডিত হইত না। কিন্তু রোগ, অবনতি, ক্ষয় প্রভৃতি দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি এ পাপের দণ্ড করিয়া থাকেন। মহাভারতের কবিও সে কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। মৌসল পর্ব্বে সেই দণ্ডের কীর্ত্তন আছে। এই দ্বিবিধ নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন। সুরাপায়ীও কখন বলিবে না, সমাজ শুদ্ধ মাতাল হউক। এক্ষণে বুঝিলে যে তোমার প্রশ্ন কেবল রিলিজন সম্বন্ধেই সঙ্গত।

শিষ্য। আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার সদুত্তর প্রার্থনা করি।

গুরু। উত্তরের আগে, একটা নিয়ম করা যাউক। এই রিলিজন কথাটা বাঙ্গালায় সর্ব্বদা ব্যবহার করা চলে না। এ বিচারে ধর্ম্ম শব্দই আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের ছয় প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে—দেখাইয়াছি। এই ছয়টি সর্ব্বদা একের স্থান

অপরে অধিকার করে। ইহা মহান্ অনর্থের মূল। এই জন্য এই ছয়টির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শব্দ নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। আমি রিলিজনকে ধর্ম্মই বলিব আর কিছুকে ধর্ম্ম বলিব না। Morality অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় অর্থে নীতি শব্দ ব্যবহার করিব, ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিব না।

শিষ্য। এখন কথাটা পরিষ্কার হইল। এক্ষণে প্রার্থিত উপদেশ প্রদান করুন—ধর্ম্মে প্রয়োজন কি?

গুরু। কিছুই পরিষ্কার হয় নাই। ধর্ম্মে প্রয়োজন কি,—জিজ্ঞাসা করিতেছ। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম কি তাহা না বুঝিলে কি প্রকারে বলিব, তাহাতে কোন প্রয়োজন আছে কিনা?

শিষ্য। ধর্ম্ম ত রিলিজন।

গুরু। রিলিজন কি?

শিষ্য। সেটা জানা কথা।

গুরু। বড় নয়—বল দেখি কি জানা আছে?

শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস।

গুরু। প্রাচীন য়ীহুদীরা পরলোক মানিত না। য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। যদি বলি দেব দেবীতে বিশ্বাস।

গুরু। ঈস্লাম, খ্রীষ্টীয়, য়ীহুদ, প্রভৃতি ধর্ম্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্ম্মে দেবও এক—ঈশ্বর। এ গুলি কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম?

গুরু। এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা যায়, যে তৎ প্রণয়নের সমকালিক আর্য্যদিগের ধর্ম্মে অনেক দেব দেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যে গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই গুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধর্ম্ম হীন নহেন, কেন না তাঁহারা কর্ম্ম ফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বর বাদ ধর্ম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism। তাহা বলিলে তোমার প্রশ্নের উত্তরটা সহজ হইয়া আসিল। যদি লোকাতীত চৈতন্যের অস্তিত্বের প্রমাণ থাকে, তাহাতে বিশ্বাস অবশ্য কর্ত্তব্য। অবশ্য কর্ত্তব্য কেন, অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। কেন না যাহার প্রমাণ আছে, তাহাতে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রয়োজন প্রমাণের উপর নির্ভর করিল। কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মত, লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই—ধর্ম্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থেও ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। যথা "Religion of Humanity."

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম্ম কাহাকে বলিব।

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন 'নোদনা লক্ষণো ধর্ম্ম।" নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। শুধু এই টুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার উপর কথা উঠিল, "নোদনা প্রবর্ত্তকো বেদবিধিরূপঃ" তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্ ধর্ম্ম গ্রন্থ ততগুলি পৃথক্-প্রকৃতি সম্পন্ন ধর্ম্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল বিধিই ধর্ম্ম; মুসলমানও কোরাণ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্ম্ম পদ্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে "বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্ম্মঃ।" এই সকল কথার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে যাগাদিই ধর্ম্ম এবং সদাচারই ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে,—যথা মহাভারতে

শ্রাদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এবচ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়িতা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥

কেহ বা বলেন, "দ্রব্য ক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম্মত্বং" এবং, কেহ বলেন ধর্ম্ম অদৃষ্ট বিশেষ। এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা তুমি সম্প্রতি শুনিয়াছ, এজন্য আমি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না। ফলত আর্য্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্য্যই ধর্ম্ম যথা বিশ্বামিত্র—

যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণংহি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।
সধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। "দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্মযদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ," ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ত্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরধর্ম্ম। ভগবদ্গীতার স্থূল তাৎপর্য্যই কর্ম্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু ধর্ম্মবাদের সাধারণত বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি, অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে, সর্ব্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দু শাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণ পর্ব্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্ম তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত-কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই

ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব্ব হইতে ধর্ম্মব্যাধোক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এস্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্ম্মের যে ব্যখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শব্দে কি প্রকারে তাহার নাম করণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

"For Religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life, are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the

people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day to erect it into a separate entity *

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমত রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে *re-ligare* হইতে ঐ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন, যে ইহা re-legere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্ম বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফূরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ, অনেকটা religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম্ম=ধৃ+মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্ম্মকে religo শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য। তা হোক—এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন।

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্ম্মানেরাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জর্ম্মান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষ

* লেখকের প্রণীত কোন ইংরেজী গ্রন্থ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল। উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা, আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি তাঁহারা না বুঝিলে, লেখা বৃথা। অতএব এই রুচি বিরুদ্ধ কার্য্যটুকু পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

মূলরের পুস্তক হইতে জর্ম্মাণদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের মত পর্য্যালোচনা কর।

"According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine Commands, that, he thinks constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion); on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands."

তার পর ফিক্টে। ফিক্টের মতে "Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind." সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্নপ্রকার; তারপর শ্লিয়েরমেকর। তাঁহার মতে,—"Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something, which through it determines us, we cannot determine in our turn." তাঁহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন,—"Religion is or ought to be perfect freedom; for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit—" এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটী ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি?

গুরু। তিনি বলেন, "Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite."

শিষ্য। Faculty! সর্ব্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে, বুঝা যাইবে,—faculty বুঝিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। এখন জর্ম্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই একজন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাহেব বলেন, যে

যেখানে "Spiritual Beings" সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেই খানেই রিলিজন। এখানে "Spiritual Beings অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেব দেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত ইহাঁর বাক্য ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রম জ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌস্থকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতি মাত্র বাদী, ধর্ম্মবিরোধী।

গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে।—যাই হৌক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্ম সকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন "The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত, "Ecco Home" এবং "Natural Religion" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে।* বাক্যটি এই *"The Substance of Religion is Culture."* কিন্তু তিনি একদল লোকের মতের সমালোচন কালে, এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সর্ব্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন *"habitual and permanent admiration."* ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

"The words Religion and worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God.

* দেবী চৌধুরাণীতে।

But those feelings—love, awe, admiration,—which together make up worship—are felt in various combination for human beings and even for inanimate objects. It is not exclusively, but only *par excellence* that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. But without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration.*

শিষ্য। এ ব্যখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই "habitual and permanent admiration" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence.

গুরু। এ ভাব, ধর্ম্মের একটি অঙ্গ মাত্র।

শিষ্য। কেন?

গুরু। "Habitual and permanent admiration," ইহার দেশী নামটি কি,—তোমার স্মরণ হইতেছে না?

শিষ্য। কি?

গুরু। ভক্তি। কেবল ভক্তি ধর্ম্ম নহে। যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগস্ত কোম্‌তের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, কেন না কোম্‌ৎ নিজে একটি অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, Religion, in itself expresses the state of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to con-

verge towards one common purpose."—অর্থাৎ "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্ম্মব্যখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে, ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

শিষ্য। তবে সেই ভগবদ্গীতায় যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, আমাকে তাহাই বুঝাইয়া দিন।

গুরু। তাহা পারিতেছি না। কেন না তোমাকে যাহা বুঝাইতে হইতেছে, তাহা রিলিজন। ভগবদ্গীতার রিলিজন সকল রিলিজনের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহাতে রিলিজনের প্রতিশব্দ কোথাও নাই। সমগ্র মানবধর্ম্মের যে ভাব টুকু রিলিজন, তাহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা কোথাও নাই। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। আর্য্যদিগের চিত্তে সমগ্র মানব-জীবন হইতে রিলিজন কখন পৃথগ্ভূত হয় নাই।

শিষ্য। তবে আমার রিলিজন বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহাদিগের মনে রিলিজন-ভাব কখন উদ্ভূত হয় নাই—তাঁহারা যদি তদভাবেও

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রণয়নে সক্ষম হইয়াছিলেন, তবে আমার সেই বৈদেশিক চিত্ত-বিকারের আন্দোলনে কিছুই প্রয়োজন নাই। গীতায় যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাই বুঝিবার বাসনা করি।

গুরু। এখন আর ধর্ম্মস্রোতে রিলিজন ভাসাইয়া দিলে চলিবে না। বিদেশ হইতেই হউক, স্বদেশ হইতেই হউক, স্বর্গ হইতেই হউক, নরক হইতেই হউক, যখন রিলিজন সামগ্রীটা ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে অবশ্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ফেলিয়া দিই বা ঘরে তুলি, না বুঝিয়া কিছু করা হইবে না। কথাটি না বুঝার কারণে অনেক সামাজিক উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। যাহারা রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, তাহারা তদন্তর্গত বলিয়া সেই সঙ্গে নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মশব্দ বহ্বর্থ। অনেক অর্থ যখন আছে, তখন অনেক সামগ্রীও আছে। সকল সামগ্রী গুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লওয়া চাই।

শিষ্য। তবে আপনিই আমাকে রিলিজন বুঝাইয়া দিন। জৈমিনি হইতে অগস্ত কোম্‌ৎ পর্য্যন্ত যে সকল পণ্ডিতকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা আপনি আমাকে শুনাইলেন, তাহাতে আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অনেক আলোতে যেমন লোকের চোক ধরিয়া যায়, আমার সেইরূপ হইয়াছে।

গুরু। তুমি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? কেবল কৌতূহল বশত অথবা কথোপকথনের ইচ্ছায় যদি তুমি এ প্রশ্ন করিয়া থাক—তবে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট; তা ছাড়া তোমার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল কি?

শিষ্য। সকলেই ধর্ম্ম কামনা করে—সকলে করুক না করুক, আমি করি। নীতি কি তাহা জানি—ধর্ম্ম কি তাহা জানি না, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।

গুরু। পরকাল মান?

শিষ্য। তত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

গুরু। তবে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়াছ কেন? ইহলোকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া যশস্বী হইবে এই বাসনায়?

শিষ্য। ঠিক তা নয়। ধর্ম্মে যদি সুখ থাকে এই সন্দেহে।

গুরু। তবে ঠিক বল দেখি তুমি খুঁজিতেছ কি? ধর্ম্ম না সুখ?

শিষ্য। সুখ খুঁজি বলিয়াই ধর্ম্ম খুঁজিতেছি।

গুরু। যেমন অন্ধকারে হাতড়াইয়াও লোকে ঠিক পথ পায়, তোমার সেইরূপ ঘটিয়াছে। প্রকৃত সুখের যে উপায় তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আর সকল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ।

শিষ্য। এ কি ভয়ঙ্কর কথা। লৌকিক বিশ্বাস ত ঠিক বিপরীত! লোকের বিশ্বাস যে যদি পরকাল থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মে পরকালে সুখ হইলে হইতে পারে (সে স্থলেও প্রমাণাভাব), কিন্তু ইহলোকে যে ধর্ম্মে সুখ হয়, এ কথাটা ত ভূয়োদর্শন বিরুদ্ধ।

গুরু। সে ভূয়োদর্শনটা কিরূপ?—

শিষ্য। দেখুন ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তথাচ সুখ বটে।

গুরু। ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি মাত্রই যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ, এটা ঘোরতর মূর্খের কথা। আমি, মনে কর, নীতি-সঙ্গত উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া উত্তম আহার সংগ্রহ করিয়াছি, দরিদ্র প্রভৃতি যাহাদিগকে দেয়, তাহাদিগকে উপযুক্ত অংশ দিয়াছি; তার পর, যদি অবশিষ্ট অংশের দ্বারা স্বাস্থ্যের উপযোগী পরিমাণে নিজের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করি, তবে অধর্ম্ম কোথায় হইল?

শিষ্য। যে ভোগাসক্ত, সে কি ধার্ম্মিক?

গুরু। ভোগাসক্তি কি সুখ? ইন্দ্রিয়ের পরিমিত এবং যথাকর্ত্তব্য পরিতৃপ্তি সুখ হইলে হইতে পারে—কিন্তু ইহা সুখের অল্পাংশ; একটা নিকৃষ্ট প্রকারের সুখ মাত্র। সুখের যাহা উপায়, তাহাই ধর্ম্ম, এই কথার যথার্থ ব্যাখ্যার পূর্ব্বে আগে বুঝা চাই যে সুখ কি?

শিষ্য। বলুন সুখ কি?

গুরু। পিপাসা পাইলে জল খাইলেই সুখ। মনুষ্য প্রকৃতি পিপাসাময়। মনুষ্য প্রকৃতিকে কতকগুলি শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক বৃত্তির সমষ্টি মনে করা যাইতে পারে। সেইগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ। যদি ইংরেজি কথা ব্যবহার করিতে চাও, তবে ইহাকে Culture বলিতে পার।

শিষ্য। বৃত্তি কথাটা লইয়া ত প্রথমে গোলে পড়িলাম। এই মাত্র faculty কথা লইয়া মক্ষমূলারকে উপহাস করিতেছিলাম।

গুরু। মনুষ্য প্রকৃতি এক বটে, কাঠের বোঝা বা শাকের আটির মত মত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমষ্টি নহে। তথাপি, মনুষ্য প্রকৃতি অবি-

ভাজ্য এক বস্তু হইলেও, তাহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ আছে। যে বলে আমার হাতের বল, সেই বলেই আমার পায়ের বল। তথাপি হাত ও পা পৃথক। ক্রোধ ও স্নেহ একই মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া। এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বল না কেন? দেখা যায়, কাহারও কোন প্রকার কাজে অধিক পটুতা, তাহার সেই বৃত্তি সমধিক স্ফুরিত বল না কেন?

শিষ্য। এতে ত ঘোর ঐন্দ্রিয়কতা দোষে দূষিত হইতে হয়। প্রথম মানসিক বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিই। দেখুন যদি শারীরিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমি খুঁজি, তাহা হইলে আমি ঘাতক, পারদারিক এবং চোর হইবারই সম্ভাবনা।

গুরু। দুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে না। প্রথমত তুমি যদি চোর, পারদারিক এবং ঘাতক হইলে, তবে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি কোথায়? তোমার সে বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ হইলে তুমি কি চোর পারদারিক এবং ঘাতক হইতে পারিতে? দ্বিতীয়ত তুমি সংসারে একা নহ; তুমি মনুষ্যসমাজের একটি মনুষ্য মাত্র; সমাজের সঙ্গে তুমি গ্রন্থিত; সমাজ-সমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র। সমাজ সুখী না হইলে, তুমি একা কখন সুখী হইতে পার না; কেন না তুমি সমাজের অংশ মাত্র। এখন, সামাজিকদিগের পরদারাদি নিরতি, অর্থাৎ পরস্পর অনিষ্ট সাধন কখনই সমাজের সুখের কারণ হইতে পারে না; এবং কাজেই তোমারও হইতে পারে না, কেন না তুমি সমাজ-ভুক্ত। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতিতে প্রথমত তোমার নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি প্রবলতর হইয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তির স্ফূর্ত্তি এবং পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া সুখের ধ্বংস করিবে, দ্বিতীয়ত দুঃখ তোমার উপর প্রতিহত হইয়া তোমার সুখের ধ্বংস করিবে। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতি বা স্বার্থপরতা সুখ নহে, দুঃখ।

শিষ্য। তা বুঝিলাম, কিন্তু সুখ কি এখনও বুঝি নাই।

গুরু। সুখ বলিয়াছি, আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, ও সমুচিত পরিতৃপ্তি। এই বাক্য গুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝ। সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা যতদূর স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার একটি সীমা আছে—পরস্পরের সামঞ্জস্য। কেহই যেন এতদূর স্ফুরিত হইতে না পারে, যে তদ্দারা অন্য বৃত্তির বিলোপ বা উপযুক্ত স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয়। আর সমুচিত পরিতৃপ্তি—অর্থাৎ যেরূপ পরিতৃপ্তিতে আপনার এবং পরের অনিষ্ট না হয়। এই সুখ; ইহা প্রাপ্তির উপায় ধর্ম্ম। ২১,৭৪।

গুরু। অনুশীলনও ইহার এক উপাধি—অনুশীলন কি ধর্ম?

গুরু। অনুশীলনই ধর্ম নয়—অনুশীলন ধর্মাচরণ—অর্থাৎ ধর্ম্মানুমত কার্য্য। এক্ষণে অনুশীলন ও পরিতৃপ্তি অর্থাৎ সুখে জীবন নির্ব্বাহ, অন্তর্জগত ও বহির্জগতের অধীন। পার্শ্ববর্ত্তী জড়প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি সেই অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির উপায়ও বটে, সীমাও বটে। অতএব বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদিগের জানা চাই। যেখানে জানিতে না পারি, সেখানে একটা তত্ত্ব মনে মনে স্থির করিয়া লই—যথা, এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্ট, এবং ঈশ্বর-নিয়ত; এবং ইহলোকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। জগৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই ধর্ম্মের মূল। বৈজ্ঞানিক সত্যও ইহার অন্তর্গত। "Religion of Humanity." নামক অভিনব ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানাংশ কেবল বৈজ্ঞানিক।

শিষ্য। ধর্ম্মের যে ভাগকে "Doctrine" বা "Creed" বলা যায়, বোধ হয়, এ ভাগ তাই।

গুরু। যদি ইংরেজি কথা নহিলে, বুঝিতে না পার, তবে তাই বলিও। এক্ষণে শোন। তত্ত্ব জ্ঞানের অন্তর্গত যে সকল পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাস্য পদার্থ পাই। এক্ষণে মিলের সেই বাক্য স্মরণ কর—"Ideal object of the highest excellence" ইহা তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পাই। ইহাই উপাস্য। ইহা কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেব দেবী, কোথাও গাছ পাথর, কোথাও Humanity। পরে সীলীর সেই বাক্য স্মরণ কর। ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মানসিক অবস্থা— "habitual and permanent admiration." ইহাই উপাসনা। ইহা ধর্ম্মের দ্বিতীয় উপাদান।

শিষ্য। Worship বা Rites.

গুরু। ঠিক। তারপর, কি জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা মনে কর। আমাদিগের বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন এবং চরিতার্থতার অর্থাৎ জীবননির্ব্বাহের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে যে নিয়মে উহার অনুশীলন ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, সে সকল ঐ জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া লই। সেই নিয়ম নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা ধর্ম্মের তৃতীয় উপাদান।

শিষ্য। Morality.

গুরু। এই তিনের সমবায় ধর্ম্ম। সমাজস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ইহার দ্বারা নিয়ত, এবং সম্যক্ সমাজের ইহাই কেন্দ্রীভূত। অতএব ইহাই

উল্লিখিত কোম্‌তের বচনানুমত ধর্ম্ম; মিল ও সীলীর ব্যাখ্যাও ইহার অন্তর্গত, এই মাত্র বলিয়াছি। কান্তের নীত্যাত্মিকা ও হিকেলের জ্ঞানাত্মিকা ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যার অন্তর্গত দেখিতে পাইতেছ। আর, যাহা কার্য্যের প্রবর্ত্তক তাহাই যদি নোদনা হয়, তবে এ ধর্ম্ম "নোদনালক্ষণঃ" বটে।

শিষ্য। এ ব্যাখ্যায় আমি তত সন্তুষ্ট হইলাম না। ইহাতে আমার প্রথম আপত্তি এই যে, অনেক এমন ধর্ম্ম আছে, বিশেষত অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্ম, যাহাতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনটি বা কোন দুইটি নাই। কাহারও তত্ত্বজ্ঞান আছে, উপাসনা নাই। কাহারও বা উপাসনা আছে, কিন্তু নীতি নাই। এ সকলগুলিকে ধর্ম্ম বলিবেন কি না?

গুরু। আমাদিগের সম্মুখে যে ইমারতের আধখানা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে ইমারত বলিবে কি? আমার এই ইংরাজি গ্রন্থখানি, অল্পমাত্র রচিত হইয়াছে, উহাকে গ্রন্থ বলিবে কি? ঐ সকল ধর্ম্মও সেইরূপ। কাল নামক মিস্ত্রী উহা গড়িতেছে বা রচিতেছে। ক্রমে অঙ্গত্রয় বিশিষ্ট হইবে।

শিষ্য। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে এ ব্যাখ্যার অনুমত ধর্ম্ম ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। তত্ত্বজ্ঞান, প্রমাজ্ঞানও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে পারে। যতটুকু তাহাতে ভ্রম থাকিবে, উপাসনা ও নীতি সেই পরিমাণে দূষিত হইবে। তারপর, তত্ত্বজ্ঞান খাটি হইলেও, তাহা হইতে উপাস্যের অবধারণে ভ্রান্তি হইতে পারে। উপাস্য ঠিক হইলেও, উপাসনা ভ্রান্ত হইতে পারে। আর নীতিত অনুমানের বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অতএব তত্ত্বজ্ঞান খাটি হইলেও নীতি ভ্রান্ত হইতে পারে। অতএব ধর্ম্ম ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি কোন ধর্ম্মবিশেষকে ঈশ্বর বা অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত, এবং সেইজন্য অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

গুরু। আমারও ঠিক সেই মত। আমি কোন ধর্ম্মকেই ঈশ্বর প্রণীত বা অভ্রান্ত ঋষিপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করি না। সকল ধর্ম্মেই অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা আছে মানি। কিন্তু ধর্ম্ম মাত্রেই যে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা স্বীকার করি না। তাহা বলিলে মনুষ্য বুদ্ধির অনুচিত অবমাননা করা হয়। বস্তুত সকল ধর্ম্মেই কিছু মিথ্যা, কিছু ভ্রম আছে। আবার সকল ধর্ম্মেই কিছু সত্য আছে। কেহই একেবারে সত্য, বা একেবারে মিথ্যা নহে। একেবারে মিথ্যা, এমন কোন ধর্ম্ম যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, এবং তদ্দারা মনুষ্যের কোন উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই।

শিষ্য। এই কথায় আমার তৃতীয় আপত্তিও খণ্ডন হইতেছে। আমি বলিতে যাইতেছিলাম, যে যখন জ্ঞানের তারতম্যে, ধর্ম্মের পার্থক্য জন্মিতে পারে (ও জন্মিয়াছে), তখন ধর্ম্মের নিত্যত্ব কোথায়? কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে সকল ধর্ম্মেই যখন কিছু সত্য আছে, তখন সকল ধর্ম্মেরই কিয়দংশ নিত্য। কিন্তু আমার চতুর্থ আপত্তি এই যে, এই ব্যাখ্যানুসারে নিখিল ধর্ম্মের অন্তর্গত, একটা শারীরিকধর্ম্ম মানিতে হয়।

গুরু। শারীরিকধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এবং বিশুদ্ধ চিত্তে শারীরিক ধর্ম্ম আচরিত করিতে হইবে। তদ্বিপর্য্যয়েই এই বলিষ্ঠ আর্য্য জাতি দুর্ব্বল হইয়া পরাধীন হইয়াছে; এবং পরাধীন হইয়া অন্যবিধ ধর্ম্মচ্যুত ও সুখচ্যুত হইয়াছে। ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ বিশিষ্ট। একের ধ্বংসে অন্যের ধ্বংস হয়।

শিষ্য। আমার পঞ্চম আপত্তি, যদি সুখের জন্য ধর্ম্ম, তবে ধর্ম্ম নিষ্কাম হইল কই? আপনি এই মাত্র ভবদ্গীতার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ত ভগবদ্বাক্যের সঙ্গে মিলে না।

গুরু। নিষ্কাম ধর্ম্মই সুখের উপায়, সকাম ধর্ম্ম সুখের উপায় নয়। সকাম ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, অধর্ম্ম। আমি তোমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছি, যে সুখের উপায়ই ধর্ম্ম। বস্তুত ধর্ম্মই সুখ। এখানে সাধনায় এবং সাধ্যে ভেদ নাই। বৃত্তিগুলির অনুশীলনই পরিতৃপ্তি—এই জন্য সাধনই সাধ্য। এই জন্য ধর্ম্ম ও সুখ,—একই। আমাদের বুঝিবার জন্য উহার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করিয়া নামকরণ করিতে হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণে ধর্ম্মভিন্ন যদি আর কিছু কামনা কর, তবে তোমার ধর্ম্ম বিপথগামী হইল—তোমার ধর্ম্মচ্যুতি হইল। নিষ্কাম ধর্ম্মের এরূপ তাৎপর্য্য নহে, যে ধর্ম্ম কামনা করিবে না। ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই কামনা করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। ধর্ম্মার্থ কর্ম্ম করিবে, কর্ম্ম-ফলের জন্য কর্ম্ম করিবে না। নিষ্কাম ধর্ম্ম এত অল্প কথায় বুঝান যায় না। সে আর এক দিনের কথা।

শিষ্য। আমার ষষ্ঠ আপত্তি এই যে, ধর্ম্ম মাত্রেই যদি ভ্রম এবং মিথ্যার সংস্রব আছে, তবে কোন ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হয় না। কেননা মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে।

গুরু। এই জন্য সকল ধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক। যে ধর্ম্মই অবলম্বন কর, তাহার সংস্কার পূর্ব্বক, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তদন্তর্গত সত্যকে ভজনা করিবে।

শিষ্য। তবে কি সকল ধর্ম্মই তুল্য রূপে অবলম্বনীয় হইতে পারে?

গুরু। আমি এমন কথা বলি না যে, জেলখানায় যেমন একটি মা কটক, স্বর্গেরও তেমনি একটি মাত্র দ্বার। যে ব্যক্তি বলে, আমার গৃহীত ধ ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, কেবল আমি আর আমার সধর্ম্মীরাই স্ব যাইবে, আর সকলই নরকে পচিয়া মরিবে, তিনি আর্য্যঋষিই হউন, পাণ্ডি ত্যাভিমানী ইংরেজই হউন, বা সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা জর্ম্মানই হউন, আমি তাঁহাকে ঘোরতর মূর্খ মনে করি। আমি ঈশ্বরকে কখনও এমন পক্ষপাতী এবং খল ভাব মনে করিতে পারি না, যে; তিনি কেবল জাতিবিশেষকে স্বর্গে যাইবা উপায় বলিয়া দিয়া, পৃথিবীস্থ আর সকল জাতিকে নরকে পাঠাইবার বন্দব করিয়া রাখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় নরক কেবল—ইহলোকের নরক হউক বা পরলোকের নরকই হউক, এক শ্রেণীর লোকের জন্য—যাহার কোন ধর্ম্ম মানে না। তথাপি, আমি এমন বলি না, যে সকল ধর্ম্মই তুল্যরূপে অবলম্বনীয়। যে ধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, অর্থাৎ যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধি সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর, এবং মনোবৃত্তি সকলে স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতি উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্মসর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। আপনার মতে কোন্ ধর্ম্ম এই লক্ষণাক্রান্ত? কোন্ ধর্ম্ম সব শ্রেষ্ঠ?

গুরু। হিন্দু ধর্ম্মই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহাই অবলম্বন কর।

শিষ্য। শুনিতে পাই, ইহ জগতের সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মই মিথ্যা ধর্ম্মপূর্ণ, অধর্ম্মপূর্ণ, কদর্য্য, এবং পাশব ধর্ম্ম।

গুরু। তুমি হিন্দু ধর্ম্মের কিছু জান কি?

শিষ্য। হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি।

গুরু। ম্লেচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান না।

শিষ্য। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই না হয় এবিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন

গুরু। আমি ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাই পুরুষ পরম্পরাগত আমার ব্যবসা। অতএব, আমার শাস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য হইলেও আমি তোমাকে যথাসাধ্য হিন্দুধর্ম্মে উপদিষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি; তবে আজ বেলা অবসান হইয়াছে, সময়ান্তরে হইবে। আজ, একজন ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের একটি মুক্ত তোমাকে উপহার দিব—রাত্রে শুইয়া তুমি তাহা কণ্ঠস্থ করিও।

আচার্য্য গোল্‌ডষ্টুকরও আমার মত বলেন ;—হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম। এই কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

"If the creed of an individual is founded on Texts held Sacred it is a national creed; no nation can surrender it without laying the axe to its own root. For a religion based on Texts believed sacred, embodies the whole history of the Nation which professes it; it is the shortest abbreviation of all that ennobles the nation's mind, is most dear to its memory, and most essential to its life." *

এমন অমৃতময়ী বাণী ম্লেচ্ছ ভাষায় আর কখন আমার কাণে যায় নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সিংহলযাত্রা।

১২৯০।২০শে মাঘ—অদ্য বেলা সাড়ে আটটার সময়ে ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়াষ্টীম নাবিগেসন্ কোম্পানীর কোএটা নামক বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিলাম। প্রথম শ্রেণীর সিংহল যাত্রীকে ১৮০৲ টাকা রিটরণ টিকিটের জন্য দিতে হয়; টিকিটের মিয়াদ ছয় মাস পর্য্যন্ত। তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত জাহাজের অধ্যক্ষেরাই করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি একজন চাকর লইলে, তাঁহাকে নিজে আহারের বন্দোবস্ত করিতে হয়; কেবল চাকরের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া লাগে না। আমি একজন চাকর লইয়াছিলাম; সুতরাং আহারের বন্দোবস্ত নিজে করিতে হইয়াছিল। যাত্রীদের স্মরণ থাকা উচিত যে, জাহাজ চলিলে রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা হয়; সুতরাং তাঁহারা যুবা হইলে, কেবল ব্রাহ্মণের বিধবার ন্যায় আহার্য্য লইলে চলে না। নদীর মধ্যে জাহাজের মন্দ গতি। এমন কি ১০ টার সময় কলিকাতা ছাড়িয়া উলুবেড়িয়া আসিতে প্রায় দুইটা হইল। প্রায় ছয় টার সময় জাহাজ কুল্পীর অপর পারের নিকট নঙ্গর করিল। এইস্থলে নদীর পূর্ব্বপারে অল্প জল; পশ্চিম পারে অধিক জল। আরোহীদের মধ্যে কয়জন মগ্ ছিল, তাহাদের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক। প্রসিদ্ধ তামাসা প্রদর্শক মেষ্টার বার্ণম্ ইহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেছেন। মগ্ সকল সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত ও হাস্যমুখ। যাহারা

---

* Goldstucker's Literary Remains, Vol II, p 41.

রেঙ্গুন বা মুলমেনে গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষে বিষণ্ণ-মুখের সংখ্যা অধিক; কিন্তু ব্রহ্মদেশে হাস্য-মুখের সংখ্যা অধিক। ইহার কারণ কি? বিষণ্ণ বদন কি গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ? যাঁহারা ঈশ্বরকে আনন্দ-স্বরূপ বলেন, যাঁহারা তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকেন, তাঁহারা এত নিরানন্দ কেন? যদি বল হিন্দুরা বড় দরিদ্র, অন্নচিন্তায় সর্ব্বদা চিন্তিত। আমি একথা স্বীকার করি, কিন্তু ইহাও বলি যে, মুখ ভারী করিয়া থাকিলে জঠরানলের নিবৃত্তি হয় না, তবে অকারণ চিত্তের স্ফূর্ত্তি কেন হারাই?

২১ শে মাঘ—অদ্য দুই প্রহরের পর জাহাজ ছাড়া হইল। প্রায় একটার সময় রাঙ্গাফলায় শ্বেতস্তম্ভ দৃষ্ট হইল। আমি ডায়মণ্ড হার্ব্বর মহকুমায় কিছুকাল ছিলাম; সুতরাং রাঙ্গাফলা সম্বন্ধে আমার দুই এক কথা বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস এই যে চব্বিশ পরগণায় যতগুলি মহকুমা আছে, তাহাদের মধ্যে ডায়মণ্ড হার্ব্বর খলতায় অগ্রগণ্য; এবং ডায়মণ্ড হার্ব্বর মহকুমার মধ্যে রাঙ্গাফলা ফাঁড়ির এলাকার লোক সর্ব্বাপেক্ষা খল। যদি কাহারও এ কথায় সংশয় হয়, উক্ত মহকুমার কয়েকটি দেওয়ানী ও ফৌজদারী নথী দেখিলে, তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবেনা। বিশেষত মথুর দাস এবং অদ্বৈত দাস নামক দুই ভায়ের গুণ যাহাতে কীর্ত্তিত আছে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন মানব প্রকৃতি কত দূর অধম হইতে পারে। বাখরগঞ্জ জেলার সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে তথাকার লোক নরহত্যা করিয়া কখন কখন মিথ্যা মোকদ্দমা প্রস্তুত করে। যিনি ডায়মণ্ড হার্ব্বরের পুলিসে বা ফৌজদারী আদালতে কার্য্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে এই মহাপাপ চব্বিশপরগণায়ও একান্ত বিরল নহে। বাঙ্গালার যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, সেখানেই সীমার বিবাদ, হাঙ্গামা, দাঙ্গা, মিথ্যা নালিস, মিথ্যা সাক্ষ্য ও কৃত্রিম নিদর্শন পত্রের প্রাদুর্ভাব। ভূমির উর্ব্বরতা বাঙ্গালীর পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

জাহাজ ঘোড়া মারার নিকটে পৌঁছিলে বোধ হইল যেন উভয় কূলের গাছ জল হইতে উঠিয়াছে।

সাগর উপদ্বীপের নিকটে নদীর পশ্চিম পার দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। সাড়ে চারিটার সময় জাহাজ উপদ্বীপ ছাড়াইয়া সমুদ্রে পড়িল। ঘোলা জল ক্রমে হরিত বর্ণ হইল। অদ্য নীলাম্বু দেখিতে পাইলাম না। গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত নাবিক-সহায় দীপ-পোত (Light-ship) সাড়ে পাঁচটার সময় ছাড়াইলাম।

এইখানে পাইলট্ সাহেব আমাদের জাহাজ হইতে নামিয়া কলিকাতাভিমুখ-গামী এক জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ চালানির ভার সম্পূর্ণরূপে কাপ্তেন সাহেবের হাতে পড়িল। কয়েকটা সাগর-চর কিংহংস (sea-gulls) জাহাজের নিকট ইতস্তত বিচরণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে; অন্য কোন পশু পক্ষী দেখিতে পাইলাম না। অদ্য সমস্ত রাত্রি জাহাজ চলিল।

২২শে মাঘ—অদ্য প্রাতে প্রথমত নীলাম্বু দেখিলাম। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই ঘন শ্যাম জল রাশি। এক্ষণে সমুদ্রের শান্ত মূর্ত্তি; কোন ভয় নাই; তথাপি যে যাত্রী আর কখনও সমুদ্র দেখে নাই, তাহার মনে অবশ্যই অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। পূর্ব্ব কালে কাহারও পোত নির্ম্মাণে নৈপুণ্য ছিল না। কেহ কোম্পাসের ব্যবহার জানিত না, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারায় পোতের স্থান নিরূপণ করিতে পারিত না; তখন ভয়ের প্রচুর কারণ ছিল। এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্ভয়ে সমুদ্র যাত্রা করিতেছে। তথাপি বঙ্গোপসাগরে ভয়ের কারণ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে,—এমন কথা বলা যায় না। কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসে এমন বাত্যা হয়, যে নিত্য সাগরচর, অভিজ্ঞ নাবিকদেরও ভয় পাইতে হয়। আমি এক জন নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবর্ত্তনী-বাত্যার(cyclone) সময় আপনারা কি করেন?' তিনি বলিলেন, 'ডুবিয়া মরিব, আর কি করিব?' বঙ্গোপসাগর, চীনোপসাগর এবং ওএষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ পুঞ্জের নিকট আট্লাণ্টিক মহাসাগর—এই তিন স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রচণ্ড বায়ুর প্রধান আকর। মিষ্টর ব্লান্‌ফোর্ড ১১৫টি আবর্ত্তনী-বাত্যার (cyclones) সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এতগুলি পবনোৎপাত বঙ্গোপসাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার একটিও ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটে নাই; জানুয়ারিতে ২টি, মার্চে ২টি, জুলাইয়ে ৩টি, আগষ্টে ৪টি, সেপ্টেম্বরে ৬টি, এপ্রিলে ৯টি, ডিসেম্বরে ৯টি করিয়া, জুনে ১০টি, নবেম্বরে ১৮টি, মে মাসে ২১টি, এবং অক্টোবর মাসে ৩১টি ঘটিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে কার্ত্তিক মাস বায়ব্যোৎপাতের সর্ব্বপ্রধান মাস।

বঙ্গোপসাগরের তটস্থ বলিয়া মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম জেলায় যেমন পবনোৎপাত হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য জেলায় তদ্রূপ কখনও হয় না। ১৮৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবরের ঝড়ে লক্ষাধিক মনুষ্য দক্ষিণ সাহাবাজপুরে ও চট্টগ্রামে বাটীতে থাকিয়া ডুবিয়া মরি-

গিয়াছে। এমন প্রলয়োপম প্রচণ্ড বাত্যা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ।

সিংহল বঙ্গোপসাগরের নৈঋত কোণে স্থিত; কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড বাত্যা বিরল *। এজন্য সিংহলের পূর্ব্বোপকূলে ত্রিকোমালী নগরের নিকট ভারতবর্ষের রণতরী সমস্ত রক্ষিত হয়। অদ্য কোন জলচর বা পক্ষী দেখিতে পাইলাম না। একটি কিংহংসও নাই। কল্য দুই প্রহর হইতে অদ্য দুই প্রহর পর্য্যন্ত জাহাজ ২৬০ গিরা অর্থাৎ ১৭০ ক্রোশ চলিয়াছে। গত কল্য সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছিলাম; অদ্য ভাল করিয়া দেখিলাম। কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য! যাহা বর্ণিতে বঙ্কিমের ও হেমচন্দ্রের লেখনী অশক্ত, আমি তাহার বর্ণনার চেষ্টা করিব না; তবে বলিব যিনি সাগর ও হিমাদ্রি না দেখিয়াছেন, তিনি ভগবানের মহিমার কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে অক্ষম।

২৩শে মাঘ—জাহাজ অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে। প্রতি ঘণ্টায় ১০ কি ১১ গিরা—প্রতি গিরায় এক মাইল। দক্ষিণ দিকের ৩৫০ অংশ পশ্চিমে ধাবমান। ঘোর নীল, কৃষ্ণবর্ণ প্রায়, জলরাশি মধ্যে দুই একটি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিলাম এবং তদুপরি বহুসংখ্যক পক্ষধর মীন (flying fish) উড্ডীয়মান দেখিলাম। প্রাকৃত ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে এই মৎস্যের উড়ন—কেবল বৃহল্লম্ফ মাত্র; ইহাদের বক্র গতি নাই। অধিকাংশ পক্ষধর মীনের গতি সরল রেখায় (প্রকৃত প্রস্তাবে প্রক্ষেপণী রেখায়) বটে; কিন্তু আমি দেখিয়াছি কয়েকটা মৎস্য উড়িতে উড়িতে আপনাপন বাম বা দক্ষিণ দিকে গেল। তবে ধাবমান জাহাজ হইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার দৃষ্টির ভ্রম হইলেও হইতে পারে।

জাহাজের কর্ম্মচারী ও আরোহীদের মধ্যে কেহই আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করেন নাই। কাপ্তেন টেম্পল্টনের মুখে কেবল এক কথা "বাবু কেমন আছ? কি খাইতেছ? তুমি বড় আহাম্মক্ যে আমাদের সঙ্গে আহারে যোগ না দিয়া কষ্ট পাইতেছ।" আমি বলিলাম "যতদূর পারি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিব; কষ্ট অধিক হয় নাই; যদি এমন কষ্ট হয়,

---

* The atmospheric disturbances which periodically agitate the Bay of Bengal and carry in hurricanes and cyclones destruction to the shipping on the exposed road-stead of Madras and the devoted Hooghly, seldom or never approach the north eastern shores of the island—Ferguson's Ceylone in 1883, P. 94.

যে তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে বা প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়, তখন কোন নিয়ম বা আজ্ঞা মানিব না; এমন স্থলে নিয়ম মানিয়া চলা আপনাদের শাস্ত্র নহে, আমাদেরও শাস্ত্র নহে; আপনাদের দাউদ রাজা প্রাণ রক্ষার্থ—য়িহুদী যাজকদের ভুক্ত্য, অপর লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ, নৈবেদ্য রুটি খাইয়াছিলেন; আমাদের বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার্থ চণ্ডালদত্ত কুকুরের মাংস খাইয়াছিলেন।" ২।৭৪।

মান্দ্রাজ যাত্রী একজন ইংরেজ ইলবর্ট বিল সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "সকল বাঙ্গালির যে মত, আমারও সেই মত; কিন্তু উহা এমন কিছু পদার্থ নহে, যে উহার জন্য এতটা গোলযোগ ভাল দেখায়।" আমি ইংরাজিতে এই কথা বলিয়া শেষ করিলাম; "The game is not worth the candle." শ্রীরামপুর প্রবাসী বাপ্তিষ্ট মিসনের একজন পাদ্রী বাটী যাইতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ১৫।১৬ বৎসর মধ্যেই ইহ লোকের শেষ হইবে; পরে স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হইবে। তিনি বলিলেন "আমার বোধ হয় যে, কেশবচন্দ্র সেন খৃষ্টিয়ান ছিলেন, স্বজাতীয়দের মধ্যে আপন প্রতিপত্তির হ্রাস হইবে বলিয়া প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই।" আমি বলিলাম "যতদূর জানি, সেন মহাশয় খৃষ্টকে মহাপুরুষ বলিয়া মানিতেন; পরমাত্মার অবতার বলিয়া মানিতেন না।" পাদ্রীসাহেব খৃষ্ট মাহাত্ম্য বিষয়ক কয়েকটি বাঙ্গালা গান রামপ্রসাদী সুরে গাইলেন; এবং কেশবচন্দ্র রচিত ভিন্ন সুরে সেই বিষয়ে, আর একটি গানও করিলেন। তাঁহার উচ্চারণ ঠিক্ বাঙ্গালির মত; তবে 'ত' বলিতে 'ট' বলেন এবং 'ধ' বলিতে 'ঢ' বলেন। তিনি ট্রিনিটারীয় খৃষ্টিয়ান বটেন; তথাপি তনয়েশ্বরকে জনকেশ্বরের ন্যূন বলিয়া মানেন। তিনি রামায়ণের অনেক প্রশংসা করায়, এলাহাবাদ প্রবাসী একজন পাদ্রী আমাদের নিকটে ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, 'আমি জানি কোন কোন খৃষ্টিয় যাজক কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারতের বচন লইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ রাম চরিত্র ভাল হইলেও তাহা নিষ্পাপ নহে; কেবল খৃষ্টই মানব মণ্ডলের মধ্যে অপাপ-বিদ্ধ ছিলেন।" আমি কোন উত্তর দিলাম না; কারণ গোঁড়াদের সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল।

২৪ শে মাঘ। অদ্য প্রাতে উঠিয়া দেখি জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছে। ৯২ ঘণ্টায় ৭৭০ মাইল আসিয়াছে। উপকূলে তরঙ্গ রোধ

(Break-water) নির্ম্মিত হইয়াছে; তথাপি এখানকার ঢেউ বড় ক্ষুদ্র নহে। এখানে জাহাজ যেমন দোলে অন্যত্র এমন দোলে না। যে নৌকায় উঠিয়া বেলা ভূমিতে যাইতে হয়; তাহাকে মসুল্লা বোট বলে; যেমন ঢেউ, তাহার উপযুক্ত নৌকা। সমুদ্র হইতে মান্দ্রাজ নগর দেখিতে অতি সুন্দর; তবে কোম্পানীর বাগান হইতে কলিকাতা যত সুন্দর দেখায় তত সুন্দর নহে। ধীবরেরা মৎস্য ধরিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় উপকূল হইতে ৪। ৫ ক্রোশ দূরে যায়। কর্কট, আহার্য্য কস্তুরি (oysters), সামুদ্রিক বাগদা চিঙ্গড়ি (prawns), সামুদ্রিক গলদা চিঙ্গড়ি (lobsters); সামুদ্রিক খৈারসোলা (mullets) ও অন্যান্য অনেক প্রকার মৎস্য মান্দ্রাজের বাজারে পাওয়া যায়। ডেস্ মৎস্য ইলিশের ন্যায় সুস্বাদু কিন্তু তাহা হইতে বড়। বাঙ্গালোর হইতে ষ্ট্রবেরি ও রাস্পবেরি ফল আইসে; এখনকার ফলের মধ্যে তাহাই উৎকৃষ্ট। মান্দ্রাজে যে হিমক্ষীর (ice-cream) প্রস্তুত হয়, তাহা কলিকাতার বরফের কুল্পী অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হয়। উপ-কূলে ভাল ভাল টীনের বাক্স ও ত্রোঙ্ক প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজে পীপ্‌ল্‌স্ পার্ক নামক উদ্যান ও পশ্বালয় অতি রম্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত আমার তাহা দেখিবার অবকাশ হয় নাই।

মান্দ্রাজের ভদ্র পল্লীতে (যেখানে ব্রাহ্মণ ও শেঠীর বসতি) বেড়াইয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা তথায় স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক অধিক। ইহার কারণ এই যে, এতদঞ্চলে মুসলমানদের অধিক প্রাদুর্ভাব হয় নাই, সুতরাং এখানে প্রাচীন হিন্দুদের অনেক রীতিনীতি আছে। আমার বিবেচনায় কলিকাতায় অন্তত মান্দ্রাজের ন্যায় স্ত্রীস্বাধীনতা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালীরা কি বলিতে পারেন, যে মান্দ্রাজের তামিল, স্ত্রীলোক এবং বোম্বায়ের মহারাষ্ট্রীরা বঙ্গাঙ্গনাদের অপেক্ষা দুশ্চরিত্রা? মান্দ্রা-জের চলিত ভাষা তামিল; কিন্তু এখানের কুলীরা পর্য্যন্ত ইংরাজী কহিতে পারে; তাহাদের ইংরেজী কলিকাতার চীনে বাজারের ইংরাজী অপেক্ষা ভাল। একজন কৃষ্ণকায়, মলিন চীর-পরিচিত, দরিদ্র বালক আমার নিকট এই বলিয়া ভিক্ষা চাহিল, "No rice, sir; no pice; very hungry; eating congee, sir." জাহাজের উপর মান্দ্রাজী আয়ারা যেরূপ ইংরেজী উচ্চারণ করে, তাহা শুনিলে, অনেক কলেজের ছাত্রদের অবাক হইতে হয়। আমি মান্দ্রাজের দুইটি পাঠশালা দেখিয়াছি। শিক্ষক গানের সুরে

একখানি তামিল গ্রন্থ পড়িতেছেন। ছাত্রেরা উড়িয়া পাণ্ডাদের মত টুপী মাথায় দিয়া, লৌহ লেখনীর দ্বারায় তালপাতে আঁচড় দিতেছে। দোয়াত কলমের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই।

২৫শে মাঘ—অদ্য দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজ মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণের ১৫ অংশ পূর্ব্বে চলিল। ক্রমে মান্দ্রাজের দক্ষিণের পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইল। আবার সেই অকূল নীলাম্বু রাশি। জাহাজের অনেক মেম সাহেব রূপার চুড়ি পরিয়া থাকেন। চুড়ির গঠন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের চুড়ির সদৃশ নহে। একগাছি ডায়মণ্ড কাটা রূপার দীর্ঘ তার স্ক্রুর পেঁচের ন্যায় পাক দিয়া ঐ বিবি-আনা চুড়ি প্রস্তুত হইয়াছে। মেম সাহেবদের মধ্যে নীল ফিতা ধারিণী মিস্ মিনোর সহিত আমার ভাল আলাপ হইয়াছিল। তিনি মদ্য খাওয়া মহাপাপ বলিয়া অনেক উপদেশ দিলেন, এবং তদ্বিষয়ে কয়খানি গ্রন্থ আমাকে পড়িতে দিলেন। বোধ করি তাঁহার এই বিশ্বাস, যে বাঙ্গালি বাবুরা সকলেই মদ্যপায়ী। আমি বলিলাম, "শুনিয়াছি সমুদ্রে বমনোদ্যম হইলে, অল্প পরিমাণে সুরা পান করিলে ভাল হয়।" তিনি বলিলেন "এ কথা মিথ্যা; যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাগর-পীড়া (sea-sickness) হয়, কিছুতেই বমন নিবারণ হয় না; কেবল স্থির হইয়া শুইয়া থাকিলে এবং কিঞ্চিৎ বরফ সেবন করিলে পীড়ার উপশম হইতে পারে।" কেহ কেহ এই পীড়ার জন্য আনারস খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ যাত্রায় আমার সাগর-পীড়া হয় নাই।

২৬শে মাঘ—অদ্য প্রাতে জাহাজের গতি প্রায় দক্ষিণে। মধ্যকার মাস্তলে পা'ল তোলা হইয়াছে। গতকল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাহাজ ২৬৪ মাইল চলিয়াছে। বেলা ৪টার সময় একটা পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। কাপ্তেন সাহেব বলেন, "এ সব সিংহলের পর্ব্বত।" সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অস্পষ্টরূপ কূল দৃষ্ট হইল।

২৭শে মাঘ—অদ্য প্রাতে সিংহলের উপকূল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। কি অপূর্ব্ব শোভা! এই দ্বীপের অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাকে স্বর্ণময়ী লঙ্কা বলিয়া ডাকিতেন। বালুকাময় বেলা-ভূমি একটি পীতবর্ণ রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; তাহার নীচে শুভ্র, তুষারবৎ, সাগরোত্থিত ফেন-মালা। কূলে

[illegible]রাজির মধ্যে কেবল নারিকেল জন্মই [illegible] নয়ন-গোচর হইতেছে; বহুদূরে নারিকেল বনের পশ্চাতে, পর্ব্বতশ্রেণী নীল কাদম্বিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। পর্ব্বত সকলের সানুদেশ মেঘজালে জড়িত। সমুদ্রে ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে; এবং [illegible]গণ (sea-gulls) মৎস্য আহার জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। মহাশিশুমার (dugongs) জলে ক্রীড়া করিতেছে।

"বৈদেহি পশ্যা মলয়াৎ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥"

শরদাকাশের ছায়াপথ সদৃশ ফেনাবলী দেখিলাম; কিন্তু সেতুবন্ধ দেখিতে পাইলাম না। সিংহলের উত্তর দিয়া জাহাজ চলিতে পারে না; চলিতে পারিলে মান্দ্রাজ হইতে কলম্বো এক দিনেই যাওয়া যাইত। জাহাজ প্রথমে সিংহলকে পশ্চিমে রাখিয়া দক্ষিণে মুখে, পরে ঐ দ্বীপকে উত্তরে রাখিয়া পশ্চিম মুখে, পরিশেষে সিংহল পূর্ব্বে রাখিয়া উত্তর-গামী হইয়া কলম্বো নগরে পৌঁছে।

প্রায় ১০ টার সময় আমরা পইণ্ট্ ডিগাল্ ছাড়াইলাম। সিংহলীরা এই নগরকে 'গালী' বলে। আগে গাল্ নগর সিংহলের একটি প্রধান বন্দর ছিল। এক্ষণে তথায় অধিক জাহাজ থামে না। তাহাতে তথাকার বাণিজ্যের হ্রাস হইয়াছে।

গত কল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদ্য দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাহাজ ২৯৬ মাইল চলিয়াছে। গতকল্য পা'ল দেওয়া হইয়াছিল, এ জন্য এত বেগে আসিয়াছে। প্রায় বেলা ৪ টার সময় আমরা কলম্বো নগরের তরঙ্গ-রোধের নিকট পৌঁছিলাম। এই নগরে দুইজন বাঙ্গালি চাউলের কারবার করেন—শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু রঘুপতি চট্টোপাধ্যায়। তাঁহারা আমাকে সাদরে তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন।

২৮ শে মাঘ—সিংহলে নিত্য বসন্ত বা নিত্য গ্রীষ্ম বিরাজমান। কলম্বো বিষুব রেখা হইতে প্রায় ৭ অংশ উত্তরে। সুতরাং এখানে সূর্য্য অতিশয় প্রখর; কিন্তু সাগরোত্থিত শীতল সমীরণে সৌর তেজের এত লাঘব হয় যে সিংহলে বসন্তের নিত্যাধিকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রতি মাসেই বৃষ্টি হয়; যে সময়ে বৃষ্টি হয় না, সে সময়েও নভোমণ্ডলে শ্বেত মেঘ দৃষ্ট হয়। পৌষ মাঘ মাসের রাত্রে এক খানা চাদর গাত্রে দিলেই চলে। বায়ুর

তাপাংশ ফারেনহিটের তাপমানের ৮০ অংশের বড় উপরে উঠে না বা নীচে নামে না। এই কারণে সিংহলে প্রায় প্রতি মাসেই পাকা আম, পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস পাওয়া যায়। আমি মাঘ মাসে এক গাছে, আম্র মুকুল, অপক্ক আম্র, এবং অর্দ্ধপক্ক আম্র দেখিয়াছি। এখানে পনস-ভ্রাতৃকা অনেক জন্মে। এই ফল দেখিতে ঠিক কাঁটালের মত; পাক করিলে ইহার রুটীর ন্যায় স্বাদ; এই জন্য ইংরেজেরা ইহাকে রুটী ফল (bread-fruit) বলেন। লেবু, পেয়ারা, চাঁপাকলা, কাঁচকলা প্রভৃতি আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রকার ফল সিংহলে জন্মে। সজিনাখাড়া ও ফুল বারমাস পাওয়া যায়। গোল মরিচ, জাতিফল, লবঙ্গ, ছোট এলাচি, ও দারুচিনি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এক কালে দারুচিনির আবাদ এখান কার প্রধান আবাদ ছিল। ভল্লাতক বা কাজুফল (cashew-nuts) মেদনীপুর জেলায় ও বাঙ্গালার অন্যত্র হিজ্‌লির বাদাম নামে খ্যাত, উহা সিংহলের সাধারণ ফল। ধান্য উত্তর প্রদেশে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়; অন্যত্র ধান চাস নাই। গোধূম, ছোলা, মটর, গোল আলু, ও সর্ষপ সিংহলে জন্মে না বলিলেই হয়। এই সমস্ত দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আইসে। এখানে সর্ষপ তৈলের ব্যবহার নাই। নারিকেল ও তিল তৈলে পাক হয়। নুয়ারেলিয়া সিংহলের শীত প্রধান স্থান। যত কপি কলম্বোর বাজারে বিক্রীত হয় তাহা ঐ অঞ্চল হইতে আইসে। গ্রীষ্ম সন্তপ্ত ইউরোপীয় প্রবাসীরা শীতল বায়ু সেবনের জন্য ঐ স্থানে কখন কখন গিয়া থাকেন। কলম্বো নগরে যত কেন সৌর তেজ হউক না, এক বার সমুদ্র কূলে, বিশেষত গাল্ ফেস্ ওয়াক্ নামক সুন্দর রাস্তায় দাঁড়াইলে শরীর শীতল হয়।

আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়, নারিকেল; ঔপনিবেশিকদের, কাফি। কাফিগাছের এক প্রকার রোগ হওয়ায় অনেকে চা ও কোকোর আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে চা উত্তম জন্মে।

(ক্রমশ)

তা. প্র. চ.

SOCIAL ORGANISM.

অর্থাৎ

সমাজ-শরীর।

প্রত্যেক শতাব্দীতেই মনুষ্য সময়ক্ষেত্রে দুই চারিটি করিয়া কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই রূপ কীর্ত্তিস্তম্ভের অভাব নাই। বাহ্য জগতে মনুষ্য নিত্য নিত্য নব নব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃতির উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। অন্তর্জগতেও নিত্য নিত্য নব নব চিন্তাপ্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, নব নব তত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতির নব নব বিকাশে মনুষ্য ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। জীবাদির ক্রমবিকাশ ও পুরুষানুক্রমিকতা এবং বিভিন্ন জাতি জীবের উৎপত্তির কারণ, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্বমালা চিরকালই ঊনবিংশ শতাব্দীর জয়স্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে। সম্প্রতি ইয়ুরোপে আর একটি প্রকৃষ্ট দার্শনিক তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা অদ্য ঐ নবাবিষ্কৃত তত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি পদার্থকেই লোকে শরীরী বলিয়া বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে যে মনুষ্য-সমাজও শরীরী পদের বাচ্য। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ব্যক্তি-সমষ্টিকে সমাজ বলা যাইতে পারে না, ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজ উন্নত হয় না; ব্যক্তির বিনাশে সমাজ বিনষ্ট হয় না। যেমন বীজনিহিত শক্তি-প্রভাবেই বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, অবধারিত হইয়াছে যে সেইরূপে সমাজনিহিত শক্তি দ্বারাই সমাজের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে এই তত্বের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলাম। নিম্নে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব। কিন্তু ঐ কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দুই একটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে।

বিখ্যাত দার্শনিক কোম্‌ত প্রথমে এই সমাজ শরীরতত্বের উদ্ভাবন করেন। পরে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ স্পেন্‌সার্ বহুল প্রমাণ সংযোগে এই মতের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখক হ্যারিসন সাহেব তাঁহার বক্তৃতার এক স্থলে বলিয়াছেন—"The great philosophical discovery of this century was the proof of the reality of the organic laws in

man's life and history, and the full maturity of the idea which our great English philosopher had made familiar to us, under the name of social organism. This is.....a clear and triumphant idea." ইয়ুরোপে এখনও এই তত্ত্ব সর্ব্বত্র সাদরে পরিগৃহীত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ইয়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমাজ-শরীর-তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই নিজ অধিকার ও প্রভাব বিস্তার করিবে। ফলত বিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম যেরূপ মহা বিপ্লব উপস্থাপিত করিয়াছে। বোধ হয় সামাজিক সকল শাস্ত্রেই সমাজ-শরীর তত্ত্বও সেইরূপ মহাবিপ্লব উপস্থাপিত করিবে। এই মহাবিপ্লবের পূর্ব্ব-লক্ষণ সমস্ত এক্ষণেই কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। মরিসন নামে একজন সাহেব গিবনের ইতিহাসের সমালোচনা স্থলে বলিতেছেন—"The pervading defect of it (Decline and Fall) all, has been already referred to—an inadequate conception of society as an organism, living and growing like other organisms, according to its own laws."

কোথায় বিশ্ববিখ্যাত গিবন আর কোথায় অজ্ঞাতনামা মরিসন! কিন্তু তথাপি সমাজ-শরীর-তত্ত্ব সাহায্যে মরিসন গিবনকে ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপাদিত করিলেন। কার্লাইল ইতিহাসবেত্তা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু তিনিও যে প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেই প্রণালীকেও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া গণনা করিবে। কার্লাইল Hero-worship নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—"For, as I take it, universal history, is at bottom, the history of the great men who have worked here." যদি সমাজ-শরীর-তত্ত্ব প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ভ্রম-সঙ্কুল কথা আর কি হইতে পারে? এবং যদি সমদর্শী গিবন ও সত্যনিষ্ঠ কার্লাইল ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপাদিত হয়েন, তাহা হইলে মেকলে, জেম্‌স্ মিল, আলিসন, ফ্রুড্ প্রভৃতি আলঙ্কারিক ও একদেশ-দর্শী ঐতিহাসিকগণ যে অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে অনেক দার্শনিক অনেক নীতিবেত্তা অনেক বার্ত্তা-বিৎ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে এই সব মহাত্মাদিগের পুস্তকরাশি একে-

থাকেই, অব্যবহার্য্য হইবে, তাহাও নহে। ইহারা জ্ঞান-জগতে যে-সমস্ত বিশাল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমস্ত হর্ম্ম্যের উপাদান সামগ্রী লইয়া আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর ভিত্তির উপর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর প্রণালীতে নূতন হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া লইবেন। ইহাতে নৈরাশ্য, ক্ষোভ বা বিষাদের কিছুমাত্র কারণ নাই। যেহেতু ঐ সমস্ত নূতন হর্ম্ম্যে বাগ্‌দেবী শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শুভ্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়া শুভ্র সরসিজে শুভ্র চরণদ্বয় বিমণ্ডিত করিয়া সত্যের শুভ্র কিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিবেন। অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইলে জগৎ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইবে। যদি আমরা বঙ্গে ঐ জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র জ্যোতিও আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাউক। কি অর্থে মানব সমাজকে শরীরী বলা যাইতে পারে, কি কি বিষয়ে মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে, কি কি বিষয়েই বা মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সমস্ত প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। মানব সমাজকে শরীরী বলিয়া স্বীকার করিলে, সমাজের কি কি উপকার, বা কি কি অপকার, সঙ্ঘটিত হইবে তাহারও বিচার করা যাউক। এবং সর্ব্বশেষে মানবসমাজকে শরীরী বলিলে অন্য অন্য কি কি পদার্থকেও শরীরী বলিতে হয়, তাহা নিগূঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাউক।

যে যে বিষয়ে মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে অগ্রে তাহাদের উল্লেখ করা যাউক।

ক। বৃদ্ধি।

(ক ১)। শরীরী পদার্থের প্রথম নিয়ম এই যে উহারা প্রথমে অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকিয়া পরে কালসহকারে অতি বৃহৎ আয়তন প্রাপ্ত হয়। সর্ষপ-কণার ন্যায় ক্ষুদ্রাকার বীজ কাল-সহকারে শাখাপ্রশাখাযুক্ত বহুবিস্তৃত বৃক্ষে পরিণত হয়। পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র শুক্রকণা কালসহকারে সার্দ্ধত্রিহস্ত রিমিত বলিষ্ঠ দীর্ঘাকার যুবা শরীরে পরিণত হয়। মানবসমাজও এইরূপে র অবস্থা হইতে অতীব বৃহৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসভ্যসমাজের লোক-

সংখ্যা দশ, পনর, কুড়ি বা চল্লিশ। কিন্তু ঐ অবস্থা সমাজই ক্রমশ বৰ্দ্ধিত হইয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকে পরিপূরিত হয়। অচেতন পদার্থের আয়তন কখনই এইরূপে * "শতকোটি গুণে" বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

(ক ২) সকল শরীরী পদার্থের আয়তন একরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কোন শরীরী বা দীর্ঘকায় হস্তীর ন্যায় অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। কোন শরীরী বা পিপীলিকার ন্যায় চিরকালই ক্ষুদ্রাকার থাকে। মনুষ্য সমাজেও এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। উত্তেন্তা নামক অসভ্য জাতির সমাজ শুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ লইয়া সংগঠিত হয়। ফিউজিয়ানদের সমাজ বার বা কুড়ি জন লইয়া গঠিত হয়। আণ্ডামানবাসীদের সমাজের লোক সংখ্যা কুড়ি বা পঞ্চাশের অধিক হয় না। এইরূপে ক্রমশ ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে দেখা যাইবে যে কোন সমাজ বা দুই শত কোনটি বা দুই সহস্র কোনটি বা দুই লক্ষ, কোনটি বা দুই কোটি লোকদ্বারা সংগঠিত হয়।

(ক ৩) শরীরী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি এরূপ জাতি আছে যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভূত হইয়া পরে একত্র সম্মিলিত হয় এবং ঐ সম্মিলনের দ্বারা আবার নূতন এক শরীরী পদার্থের উৎপত্তি হয়। আর্দ্র প্রাচীরের উপর যে শেওলা পড়ে, ঐ শেওলার কতকগুলি প্রথমে একত্রিত হইয়া ক্ষুদ্র কোন উদ্ভিদের সহিত যুক্ত হয়। তাহার পরে ঐ শেওলা সংযুক্ত ক্ষুদ্র উদ্ভিদটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অন্য উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করে। মনুষ্য সমাজেও এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজের কলেবর বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। মনুর সময়ে আমাদের সমাজের বোধ হয় ঐরূপ গঠন ছিল। দশটি পরিবার এক স্থানে একত্রিত হইয়া একটা সমাজ হইল। অন্য এক স্থানে আর দশটি পরিবার একত্রিত হইয়া আর একটি সমাজ হইল। পরে ঐ দুইটি সমাজ একত্রিত হইয়া আর একটী নূতন সমাজের সৃষ্টি করিল। শরীরী পদার্থের মধ্যে এরূপ সম্মিলন অনেক স্থলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেইরূপে মনুষ্য সমাজেও পূৰ্ব্বোক্তরূপ সম্মিলন অনেক স্থলেই বহুকাল স্থায়ী হয় না।

---

* "তখন তাহারা কজন ছিল,

* * * *

এখন তোরা যে শত কোটি তার"—ভারতসঙ্গীত।

বৃদ্ধি সম্বন্ধে সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। মনুষ্য সমাজের কোন এক ব্যক্তি এক সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য এক সমাজে যোগ দিতে পারে। কিন্তু শরীরী পদার্থের সেরূপ হয় না। এক শরীরীর অংশ অন্য শরীরীর সহিত সংযুক্ত হয় না।

গ। শরীরায়তন অনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি।

গ ১। শরীরী পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির সহিত নব নব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মৃত্তিকা নিহিত বীজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই বলিলেই হয়। অঙ্কুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীজ হইতে অনেক অধিক। পরে যখন অঙ্কুর বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার শাখা প্রশাখা মূল কাণ্ড পুষ্প মুকুল ফল প্রভৃতি নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উদ্গম হইয়া থাকে। শরীরী পদার্থের আয়তন যতই বর্দ্ধিত হয়, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।–মনুষ্য সমাজেও এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসভ্য অবস্থায় যখন সমাজের লোকসংখ্যা কুড়ি বা ত্রিশ, তখন সকল মনুষ্যই সমানভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু যখন উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তখন উহাদের মধ্যে একজনকে প্রধান রাজা বলিয়া গণ্য করিতে হয়। রাজা ঐ সমাজের মস্তকরূপে অবস্থান করেন, অর্থাৎ ঐ সমাজে প্রথম নূতন এক অঙ্গের সৃষ্টি হয়। পরে যখন ঐ সমাজ অন্য সমাজকে পরাজিত করিয়া নিজ সমাজভুক্ত করিয়া লয়, তখন সমাজে আর একটি অঙ্গের সৃষ্টি হয়। তখন সমাজের মধ্যে একদল লোক (জেতৃগণ) শাসনকর্ত্তা বা প্রভু বলিয়া গণ্য হন, আর এক দল লোক (বিজিতেরা) অনুশাসিত বা ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পরে সমাজ মধ্যে যতই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ততই জাতিভেদ বা ব্যবসাভেদ বা অন্যরূপ প্রভেদের দ্বারা সমাজের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন অঙ্গ পুরোহিতরূপে পরিগণিত হয়; কোন অঙ্গ কৃষক বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন অঙ্গ যুদ্ধজীবী কোন অঙ্গ পণ্যজীবী বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সমাজের এইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির ফল মাত্র। ব্রাহ্মণেরা এই সামাজিক নিয়মের প্রতিপোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার স্রষ্টা নহেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, যে ব্রহ্মাই জাতিভেদের স্রষ্টা।

৫২। আরকম বৃদ্ধির সহিত যে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা দেখান একই অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মনুষ্য শিশু প্রথমে মাংসপিণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে। পরে কাল সহকারে ঐ মাংসপিণ্ডের কোন অংশ বা মস্তক, কোন অংশ বা হস্ত, কোন অংশ বা পদ রূপে পরিণত হয়। যে অংশে হস্ত হয়, তাহার কথাই বিবেচনা করা যাউক। ঐ অংশই কালসহকারে ভুজ প্রকোষ্ঠ অঙ্গুলি নখ প্রভৃতি নানাবিধ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হয়।—মনুষ্য সমাজে ঐরূপে অঙ্গ হইতে প্রত্যঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে। যখন প্রথম পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তখন ঐ এক পুরোহিতই মন্ত্রবিৎ, গণক, ওঝা, চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। কালসহকারে ঐ পুরোহিত শ্রেণীর কতকগুলি লোক শুদ্ধ গণকতা করেন, কতকগুলি শুদ্ধ চিকিৎসা করেন, কতকগুলি শুদ্ধ ওঝাগিরি ব্যবসা অবলম্বন করেন। এইরূপে এক অঙ্গ হইতে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়।

৫৩। শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে নানারূপ বৈলক্ষণ্য আছে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত বৈলক্ষণ্যের মধ্যেও কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মূত্রকোষ ও যকৃৎ এ উভয়ের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই রক্তাগম যোগ্য ও রক্তনির্গমোপযোগী শিরা আছে। উভয়ের মধ্যেই অসার পদার্থ নিষ্ক্রামণের উপায় আছে। উভয়ের মধ্যেই এইরূপ নানা সাদৃশ্য লক্ষিত হইতে পারে।—মনুষ্য সমাজেও কোন দুই শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ উভয় জাতিতে অনেক প্রভেদ আছে। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর পারিবারিক ও শ্রেণীগত ব্যাপার সমস্ত যে নিয়মে সম্পাদিত হয়, শূদ্রের পারিবারিক ও শ্রেণীগত ব্যাপার সমস্তও সেই নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যখন কাহাকেও জাতিচ্যুত করিতে হয়, অথবা যখন কাহাকেও কোন ঘৃণিত অপরাধে সমাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, তখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ উভয়ের পারিবারিক ও জাতিগত নিয়মাবলীর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারে। অথবা দুইটি প্রদেশের কথা বিবেচনা করুন। বাণিজ্যপ্রধান কলিকাতার সহিত কৃষিপ্রধান কোন এক পল্লীগ্রামের তুলনা করুন। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রদেশের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, বটে কিন্তু তথাপি এ উভয়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনেক বিষয়ে তুল্য।

খ৪। যে নিয়মে শরীরী পদার্থের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি হয়, সেই নিয়মে সামাজিক যন্ত্র বা অঙ্গেরও উৎপত্তি হয়। প্রথমে শরীরী পদার্থের যকৃৎ নামক যন্ত্রের কথা বিবেচনা করা যাউক। সর্ব্ব প্রথমে জন্তু মধ্যে যকৃৎ নামক যন্ত্র থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুর পাকস্থলীর নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কোষ থাকে। উহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি করিয়া নির্গমদ্বার থাকে। পরে ঐ সমস্ত কোষের প্রত্যেকটিই বহু সংখ্যক কোষে বিভক্ত হয় এবং সর্ব্বশেষে ঐ সমস্ত কোষ একত্রিত হইয়া একটি যন্ত্রের সৃষ্টি করে।—মনুষ্য সমাজেও তন্তুবায় নামক শ্রেণীর বিষয় বিবেচনা করুন। প্রথমে তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন বস্ত্র বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নিজে সম্পাদন করে। পরে তন্তুবায়ের স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলেই ঐ কার্য্যে তাহার সাহায্য করে। সর্ব্ব শেষে ঐরূপে বহুপরিবার একত্রিত হইলে একটি শ্রেণী বা জাতি বা সামাজিক অঙ্গের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশে শূদ্রদের মধ্যে যে নানা প্রকার জাতির সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলেও এই সামাজিক যন্ত্রের উৎপত্তি বিষয় সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গ। প্রক্রিয়া।

গ ১। শরীরী পদার্থের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বনিকৃষ্ট তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। স্পঞ্জ অথবা পুরুভুজের অঙ্গ হইতে অঙ্গ কাটিয়া লইলেও উহাদের জীবনের বা জীবনী ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না।—সেইরূপ অসভ্য সমাজের মধ্যেও মনুষ্যে মনুষ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকে না। অসভ্য সমাজ হইতে কতকগুলি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সমাজের কোন ক্ষতি হয় না। অসভ্য সমাজের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্যই নিজে করিয়া লয়। সুতরাং এক জনকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করিতে হয় না।

কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের সম্বন্ধ এরূপ নিগূঢ়, যে উহাদের কোন এক অঙ্গের বিনাশ হইলেই সমস্ত অঙ্গের বিনাশ একরূপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। পক্ষী বা পশুর মস্তকচ্ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ উহাদের মৃত্যু হয়। হস্ত পদাদির বিচ্ছেদও অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।—সভ্য সমাজের অঙ্গ সমূহের মধ্যেও এইরূপ নৈকট্য ও বাধ্যবাধকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকে পৃথক

করিলে অথবা শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণকে পৃথক করিলে, তৎক্ষণাৎ সমাজের মহা অমঙ্গল সংসাধিত হইবে। এইরূপে কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামকে পৃথক করিলে, কলিকাতা ও পল্লীগ্রাম উভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। বৈদ্যবাটী না থাকিলে কলিকাতার লোকের আহার চলিবে না; আবার কলিকাতা না থাকিলে বৈদ্যবাটীতে এক্ষণে যতগুলি কৃষক প্রতিপালিত হইতেছে, ততগুলির প্রাণরক্ষা হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে।

গ ২। নিকৃষ্ট শ্রেণীর শরীরী পদার্থের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের কার্য্য অক্লেশে সম্পাদিত করিতে পারে। এমন একরূপ জন্তু আছে যে তাহার পৃষ্ঠদেশ অক্লেশে উদরের কার্য্য করিতে পারে এবং তাহার উদর অক্লেশে পৃষ্ঠের কার্য্য করিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে কেবল দুই এক স্থলেই ঐরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়া থাকে। কোন কারণে যকৃতের ক্রিয়া-রোধ হইলে মূত্রকোষ বা ত্বক্ দ্বারা পিত্ত নির্গম ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু যেখানে শরীরী পদার্থ অত্যুচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করে অথবা যেখানে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন আকার ও গঠন ধারণ করে, সেখানে এক অঙ্গের দ্বারা অন্য অঙ্গের কার্য্য চলে না।—মনুষ্য সমাজেও এই সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজে একজন মনুষ্যের কার্য্য অক্লেশে অন্য একজনে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু সভ্য সমাজে এরূপ হয় না। বিচারপতি যাজকের কার্য্য করিতে পারেন না। শ্রমজীবী বিচারপতির কার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এইরূপে এক ব্যবসার লোক অন্য ব্যবসা চালা-ইতে পারেন না।

গ ৩। শরীরী পদার্থের আর এক নিয়ম এই যে, যে শরীরীর আকার গঠন ও প্রক্রিয়া যত পৃথক, যে শরীরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যত পার্থক্য, সে শরীরী সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।—সেইরূপ মনুষ্য সমাজেও যে সমাজের প্রক্রিয়ার যত পার্থক্য অর্থাৎ যে সমাজে যে পরিমাণে জাতিভেদ ও ব্যবসা-ভেদের আধিক্য, সেই সমাজ সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

ঘ।

শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৃক্ষে ফল পুষ্প পত্র প্রভৃতি প্রতি বর্ষে নব নবরূপে উদ্গত হইয়া থাকে। শাখা প্রশাখা ছেদ করিয়া লইলেও তাহা হইতে বৃক্ষের বিনাশ সম্পাদিত

য় না।—এইরূপে মনুষ্য সমাজেও অহরহ নানা ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কখন কখন বা দুই একটি শ্রেণীও বিলুপ্ত হইতেছে, তথাপি ইহাতে সমাজের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে না।

এইরূপ শরীরী পদার্থের সহিত মনুষ্য সমাজের আরও অনেক সাদৃশ্য দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইবে। এজন্য এক্ষণে শরীরী পদার্থের সহিত সমাজের কি কি বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

১। সাধারণত শরীরী পদার্থ আকার বিশিষ্ট। কিন্তু মনুষ্য সমাজ সাধারণ শরীরী পদার্থের ন্যায় স্বতন্ত্র আকারবিশিষ্ট নহে। তবে এক কথা এই যে মনুষ্য সমাজের ন্যায় বহুতর উদ্ভিদ্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জন্তুরও স্বতন্ত্র আকার নাই। কিন্তু তথাপি উহারা শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

২। শরীরী পদার্থের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক স্থলেই সম্বদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিতে পারে। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণশ্রেণীর কতক অংশ পূর্ব্বে, কতক অংশ উত্তরে অবস্থান করে। এই বৈলক্ষণ্য আপাতত অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন অনেক উদ্ভিদ্ ও ক্ষুদ্র জন্তু আছে যে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পরস্পর হইতে অনেক দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে।

৩। শরীরী পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজে নিজে গতিবিধি করিতে পারে না। অর্থাৎ কোন একজন মনুষ্যের হস্তপদাদির স্বতন্ত্র গতিশক্তি নাই। কিন্তু মনুষ্য সমাজের অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্য নিজে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারে। তবে এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে মনুষ্য সামাজিক কোন ঘটনা সম্বন্ধে নিজে যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে না। যদিও বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না।

৪। শরীরী পদার্থের সকল অংশেরই বুদ্ধিশক্তি বা প্রবৃত্তি নাই। অর্থাৎ মনুষ্যের মস্তিষ্কেই ঐ দুইটি ক্ষমতা আছে। কিন্তু হস্তপদাদি অন্য কোন অঙ্গে ঐ দুইটি শক্তির বিদ্যমানতা অনুভব করা যায় না। কিন্তু মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যেরই বুদ্ধিশক্তি, প্রবৃত্তি, বিচার-শক্তি প্রভৃতি আছে।

এইরূপে মনুষ্য সমাজে ও শরীরী পদার্থে এতদ্ভিন্ন অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য সত্বেও শরীরী পদার্থে ও সমাজে বহুবিধ প্রবল সাদৃশ্য আছে। অন্তত ইহা বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে, যে উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি বিষয়ে শরীরী পদার্থ ও সমাজ প্রায়ই এক নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। স্পেন্সর অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা সমাজ-শরীরতত্ত্বের প্রতিপোষণ করিয়াছেন। আমরা দুইটি বর্ত্তমান ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিম্নে ঐ তত্ত্বের সমর্থন করিতেছি।

যখন অষ্ট্রেলিয়াতে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তখন তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন। অর্থাৎ তখনও অষ্ট্রেলিয়াতে সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। পরে যতই অষ্ট্রেলিয়াতে ইংরাজদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তথায় সমাজের আয়তনও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং ঐ আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তথায় ইংরাজদের মধ্যে ঐক্য ও সংযোগ পরিপক্ব হইতে লাগিল। এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়াতে একটি সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে শিখিতেছে, পরস্পর পরস্পরের সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিতেছে এবং সমস্ত সমাজ যেন একটি শরীরী পদার্থের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত উহার বর্ত্তমান ইতিহাসের তুলনা করিয়া অর্ল অব্ কারনারবন বলিতেছেন—"Some few years ago Australian confederation was no popular subject in Australia. I can remember the time when mere allusion to such a contingency would have been considered very infelicitous. Long too, after that time the certain conflict of interests, the opposition of tariffs, and the risk of local jealousies would have made any such proposal absolutely idle. In all these respects we may note a great change ... ... Canadian confederation was no exception to this rule, though at first sight it may seem so... .. But though ultimate and complete union must probably be approached by successive steps, the last few years have contributed some what to this result. As regards Australia itself the rivalries and jealousies of former times are lessened; there has been an insensible growth of common action in matters of postal,

telegraphic, ocean and railway communication, and there has been a larger intercourse social and commercial ; there have been conferences binding one and all to a sense of common interest and action." এই সমস্তের অর্থ এই যে, অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ শরী-রের আয়তন ও প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশের কথাও ভাবিয়া দেখুন। মুসল-মানেরা অস্ত্রবলে হিন্দু সমাজকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিল। হিন্দু-সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত হীনবল ও হততেজা হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে এখানে সেখানে অল্প পরিসর ক্ষেত্রের উপর অল্পপ্রাণ লইয়া কার্য্য করিতেছিল। কিন্তু কালসহকারে ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিবার জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি-লেন। সেই সময় হইতেই হিন্দু সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলে সমবেদনা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। নিত্য নিত্য নব নব কারণে হিন্দুসমাজ পুনর্ব্বার একত্রিত হই-বার চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছে। জাতীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে পথকর প্রভৃতির দ্বারা এই সম্মিলনের সাহায্য করা হইতেছে। অন্য দিকে মুসলমান সমাজ সৃষ্ট হইতেছে। ইংরাজদের আক্রমণে মুসলমান সমাজ চূর্ণীকৃত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অল্পে অল্পে ঐ সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্মিলিত হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সমাজ-সম্মিলনের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতেছে। উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই মান্দ্রাজ, —সর্ব্বত্রই এই শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। যদি শত্রু কর্ত্তৃক আহত না হয়, তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে, যে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ একত্রীকৃত হইয়া এক মহাবল সমাজ শরীরের উদ্ভব সম্পাদন করিবে।

হয়ত সেই প্রকাণ্ড সমাজ-শরীর এক ধর্ম্মে, এক নীতিতে, এক ভাবে, এক প্রবৃত্তিতে, এমন কি এক ভাষায় সংবদ্ধ হইয়া, এক স্বরে এক প্রাণে ভারত মাতার অর্চ্চনা করিয়া, সম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীতে ভারত সমাজ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। এক্ষণে আমাদের সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকৃত অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ঐ অনৈক্য স্বাভাবিক নিয়মের ফল।

উহা দেখিয়া ভীত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। প্রথম সম্মিলনের সময় সকল সমাজেই ঐরূপ অনৈক্য, বিসম্বাদ ও মনান্তর ঘটিয়া থাকে,—এই কথা স্মরণ করিয়া আমাদের সকলেরই এই জাতীয় সম্মিলনের সাহায্য করা উচিত। বাঙ্গালি অসার কাপুরুষ, উড়িষ্যাবাসী নির্ব্বোধ, বেহারবাসী কোপন স্বভাব প্রভৃতি আত্মনিন্দাকর কথার ব্যবহার না করিয়া আমাদের সকলেরই সমাজ-শরীর সংগঠনের চেষ্টা করা উচিত। কারণ, যদিও স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই এই সমাজশরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে সত্য, তথাপি মনুষ্য নিজ নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উহার নানারূপ উন্নতি সংসাধিত করিতে পারে।

হরগৌরী সম্বাদে সর্ষপ মাহাত্ম্য কথন।

মহানগরে মহামেলা। ইংরাজের অসীম ভারতসামাজ্যের অপূর্ব্ব রাজধানীতে অপরিমেয় রাজশক্তির সাহায্যে, অতুল অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব রাজসূয়। ইংরাজ দম্ভ করিয়া বলিতেছে—পৃথিবীতে যে যেখানে আছে সকলকে বলিতেছে—'আইস, কে কোথায় আছ, আইস, যাহার যাহা দেখাইবার আছে, তাহা লইয়া আমার এই অন্তর্জাতিক রাজসূয়ে আইস। কে কেমন শিল্পী, কে কেমন বিজ্ঞানবিৎ, কে কেমন কৃতী, কে কেমন সৌভাগ্যশালী, আমার এই রাজসূয়ে তাহার পরীক্ষা হইবে।' শুনিয়া, সেই অপূর্ব্ব রাজসূয়ে কত দেশ হইতে কত লোক আসিল—ইংলণ্ড হইতে ইংরাজ, ফ্রান্স্ হইতে ফরাসী, জর্ম্মণি হইতে জর্ম্মাণ, ইতালী হইতে ইতালীয়, আমেরিকা হইতে আমেরিক, চীন দেশ হইতে চীন, জাপান হইতে জাপানবাসী, দেনমার্ক হইতে দিনামার, দ্বীপ হইতে দ্বীপবাসী, উপদ্বীপ হইতে উপদ্বীপবাসী—দিগ্‌দিগন্ত হইতে অসংখ্য অগণ্য লোক আসিল। কত সোণা রূপা আসিল; কত মণিমাণিক্য আসিল; কত ঝাড়লণ্ঠন আসিল; কত গাড়ী পাল্কী আসিল; কত চিত্র চিত্রফলক আসিল; কত রকমের কত কি আসিল; সভ্যের সভ্যতা আসিল; অসভ্যের অসভ্যতা আসিল। যুগযুগান্তের গোড়া হইতে যুগযুগান্তের শেষ পর্য্যন্ত মানুষ জ্ঞানবলে, বুদ্ধিকৌশলে, শিল্পে যত সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার সকলই আসিল। ভারতের আধুনিক হস্তিনাপুরে পৃথিবীর অসংখ্য যুগের এবং অসংখ্য জাতির মহা সম্মিলন হইল। মহাস্মৃতির সহিত মহাপ্রত্যক্ষ মিশিয়া

গেল। মহাকালের মহাক্রোড়ে অদৃশ্য হইল। মহাকাল মহামূর্ত্তি ধারণ করিল। সে মূর্ত্তিতে সকলই দেখিলাম, সকলকেই দেখিলাম। কেবল দেখিলাম না— বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষা। ক্ষুদ্র বলিয়া কি বঙ্গের সরিষা মহাকালের মহাশরীরে স্থান পাইল না? ভাবিতে ভাবিতে সেই অপূর্ব্ব পুরাণ কথা মনে পড়িল। মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

দ্বাপর যুগে মাল্যবান নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। চিত্রাণী এবং চিত্ররাণী নামে তাঁহার দুই পত্নী ছিল। একদা মাল্যবান পত্নীদ্বয়কে লইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল একটি বৃক্ষশাখাস্থিত পক্ষীর বাসা হইতে একটি ক্ষুদ্র শাবক মাটীর উপর পড়িয়া গেল। 'আহা! কি হইল, কি হইল!' বলিয়া মাল্যবানের পত্নীদ্বয় দৌড়াইয়া গিয়া শাবকটিকে তুলিয়া লইয়া দেখিল, ছানাটি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! সুশ্রূষা দ্বারা ভাল করিবে বলিয়া, তাহারা শাবকটিকে লইয়া গৃহাভিমুখিনী হইল। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিল, শাবকজননী এক এক বার শূন্য নীড়টি বেড়িয়া বেড়িয়া, এক এক বার তাহাদিগেরই দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সকরুণস্বরে চীৎকার করিতেছে। দেখিয়া তাহারা ফিরিল। ফিরিয়া সেই বৃক্ষতলে একটি ক্ষুদ্র লতামণ্ডপ প্রস্তুত করিল। পতিকে কহিল—'আপনি গৃহে গমন করুন। যতদিন পক্ষীশাবকটি আরাম না হয়, তত দিন আমরা এই লতামণ্ডপে থাকিয়া ইহার সেবা করিব। অতএব প্রার্থনা, যে আপনি তত দিন এ লতামণ্ডপে আসিবেন না, কিন্তু যখন ইচ্ছা হইবে তখনি পরিচারিকা দ্বারা উহার তত্ত্ব লইবেন।' 'তোমাদের পবিত্র কামনা সিদ্ধ হউক,' এই কথা বলিয়া মাল্যবান সহর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সপত্নীদ্বয় পক্ষীশাবকের সুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। উদ্যান হইতে নানাবিধ লতাপাতা আনিয়া সেইগুলির রস শাবকটির গাত্রে লাগাইতে লাগিল। তাহার জন্য অতি কোমল শয্যা প্রস্তুত করিল। রাত্রিকালে হয় চিত্রাণী নয় চিত্ররাণী তাহাকে আপন বক্ষোপরি শোয়াইয়া রাখিতে লাগিল। শাবকের প্রতি এত স্নেহ ও যত্ন দেখিয়া শাবকজননীও লতামণ্ডপে আসিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল যোগাইতে লাগিল। ক্রমে রমণীদ্বয়ের বক্ষোপরি শাবকের পার্শ্বে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। স্নেহের সুশ্রূষায় পক্ষীশাবক অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন পতিকে ডাকাইয়া, তাহার সমক্ষে

সেই ক্ষুদ্র লতামণ্ডপটি শাবক এবং শাবকজননীকে দান করিয়া সপত্নীদ্বয় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গৃহে আসিয়া মুগ্ধ মাল্যবান্ জ্যেষ্ঠা চিত্রাণীকে হীরক নির্ম্মিত একটি নথ এবং কনিষ্ঠা চিত্ররাণীকে নীলাভ মুক্তার মুখে হীরকের টীপ দেওয়া একটি ক্ষুদ্র নোলক—প্রেম সম্ভাষণ সহকারে উপহার দিল। সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কেহ কখন সপত্নীর বিদ্বেষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু আজ মাল্যবানের পাপে—ধর্ম্মচর্য্যার পুরস্কার করার পাপে—বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। চিত্রাণী নথ পাইয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইল, কিন্তু চিত্ররাণী নোলক দেখিয়া রাগে, অভিমানে জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। "ওর অত বড় আর আমার এত ছোট," এই বলিয়া চিত্রারাণী ক্ষুদ্র নোলকটি স্ফাটিক নির্ম্মিত গৃহতলোপরি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিল। নোলকের নীলাভ মুক্তা চূর্ণ হইয়া মুক্তা মুখস্থিত সূর্য্য রশ্মি বিন্দুবৎ তিনটি হীরকের টীপসহ স্ফাটিকোপরি ছড়াইয়া পড়িল। মাল্যবান চিত্রারাণীকে অনেক বলিল, অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল—চিত্রারাণীর রাগ পড়িল না। চিত্রাণীও সপত্নীকে কত বলিল—সপত্নী কিছুতেই বুঝিল না। শেষে নাসিকা হইতে নথ উন্মোচন করিয়া স্নেহ বিগলিত স্বরে—"দিদি তুমিই তবে এই নথ পর,"—বলিয়া জোর করিয়া চিত্রারাণীকে নথ পরাইতে উদ্যত হইল। তখন চিত্রারাণীর রাগ দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। নথ দূরে নিক্ষেপ করিয়া "আমি আমার মার কাছে যাই"—বাষ্প গদগদস্বরে এই কথা বলিয়া, ভগবতী-ভক্ত ভামিনী অভিমান ভরে কৈলাসে গমন করিয়া, কৈলাস বাসিনীর নিকট অভিযোগ করিল। ভক্ত প্রিয়া গৌরী মাল্যবানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া হরের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, মহাদেব দেবর্ষি নারদের সহিত তত্ত্বকথা কহিতেছেন। কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া গৌরী—তত্ত্বকথা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন—"দেব, গন্ধর্ব্ব মাল্যবান আজ তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নী চিত্রাণীকে এক খানি বহুমূল্য বৃহৎ অলঙ্কার দিয়া এবং কনিষ্ঠা পত্নী চিত্রারাণীকে অতি ক্ষুদ্র একটি নোলক মাত্র দিয়া যারপর নাই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। আপনি এই দণ্ডে দুষ্টের প্রতি যথাবিহিত দণ্ড বিধান করুন। এই কথা শুনিয়া ভবানীপতি ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং ভবানীর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে আপনার বামপার্শ্বে বসাইলেন। তিনি বসিলে পর, গন্ধর্ব্বপত্নী চিত্রারাণী ভবানীর পাদমূলে উপবেশন করিল। তখন দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া ভগবান ভবানীপতি এইরূপ কহিতে লাগিলেন;—

'তবে আরো একটি তত্ত্বকথা শ্রবণ কর। বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিয়া গন্ধর্ব কন্যা অভিমান করিয়াছেন। মনে করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র পদার্থ অতি তুচ্ছ; সাধারণ লোকে এই রূপই মনে করিয়া থাকে। যে অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম, লোকে তাহাকে অসার অপদার্থ ভাবিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু তত্ত্বকথা এই,—যে, ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম হইলেই অসার বা অপদার্থ হয় না। পরমব্রহ্ম সূক্ষ্ম, তন্মাত্র সূক্ষ্ম, লিঙ্গশরীর সূক্ষ্ম; কিন্তু পরমব্রহ্ম, তন্মাত্র, লিঙ্গশরীর—সকলই অতি উৎকৃষ্ট; সকলই স্থূল ও শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পরমব্রহ্ম ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ভূতের তন্মাত্র—ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; লিঙ্গশরীর স্থূলশরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব স্থূলের তুলনায় সূক্ষ্ম কোন রকমেই তুচ্ছ নয়। আবার প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ক্ষুদ্র যদি ক্ষমতাশালী হয়, তবে সে বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ। লোকে বৃহতের সহিত ক্ষমতার সংযোগ কল্পনা করিয়া থাকে। সেটি ভ্রম। জীবদেহে যে পদার্থ হইতে শক্তি ও ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ দেহের অবশিষ্টভাগ অপেক্ষা অনেক অল্প। ফলত শক্তিতত্বের মূল কথা এই যে, শক্তি শরীরের ফল নয়, গুণের ফল। গুণের নামই শক্তি। গুণ স্বল্পশরীর বিশিষ্ট বা শরীর শূন্য হইলেও বৃহৎ। অতএব ক্ষুদ্রের যদি গুণ থাকে, তবে ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে সৃষ্টি খণ্ডের একটি রহস্য পূর্ণ উদাহরণের দ্বারা প্রকৃত শক্তিতত্ত্ব বুঝাইতেছি। অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মর্ত্ত্যভূমিতে যত রকম শস্য ও বীজ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম। দেখিলে সর্ষপকে এক জাতীয় পদার্থ বলিয়া মনে হয় না, কেননা সর্ষপের বর্ণ বহুবিধ—এমন কি, স্থির নিরীক্ষণ করিলে দুইটি সর্ষপের এক বর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব দৃশ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুদ্র, এবং জাতীয় লক্ষণ বিবর্জ্জিত। এবং সেই জন্য মর্ত্ত্যভূমে লোকে সর্ষপকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ষপ অতি বৃহৎ, অতি মহৎ পদার্থ। সর্ষপ উচ্চ জমিতে জন্মে, নীচ জমিতে জন্মে না, যেন সে কত উচ্চ, কত মহৎ বংশ হইতে উদ্ভূত। যেখানে, সর্ষপ জন্মে, সেই থানেই দেখিবে, সর্ষপ পৃথিবীর উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। সর্ষপ পৃথিবীর নিম্নতর স্তরে নামিতে পারে না, নামিলে মরিয়া যায়। উচ্চ স্তরে জন্মিয়াও সর্ষপ ক্ষুদ্র বটে—এত ক্ষুদ্র যে লোকমধ্যে সর্ষপই ক্ষুদ্রতার পরিচয় স্থল। কিন্তু ক্ষুদ্রতম হইয়াও সর্ষপ অসম্ভব রকম শক্ত। ক্ষুদ্রতম সর্ষপকে অঙ্গুলি দ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া অমিতবল প্রয়োগ পূর্ব্বক পেষণ করিলেও ভাঙ্গিতে পারা যায়

না। দেবর্ষি! এত ক্ষুদ্র হইয়াও যে, এত শক্ত, এত টন্‌কো, সেইত পদার্থ। যে টন্‌কো, সে ক্ষুদ্র হইলে কি আসিয়া যায়? যে ক্ষুদ্র সে টন্‌কো হইলে যত বড়, যত প্রশংসার বস্তু হয়, যে প্রকৃত পক্ষে বৃহদাকার, সে টন্‌কো হইলে তত বড়, তত প্রশংসার বস্তু হয় না। আবার ক্ষুদ্র সর্ষপের যে সার পদার্থ তৈল, তাহার অপেক্ষা সার পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। যেখানে ব্যথা, যেখানে বেদনা সেই খানেই সর্ষপ তৈলের প্রয়োজন—যেখানে প্রাণবায়ু কুপিত, জ্ঞান-প্রবাহ অস্থির ও অনিশ্চিত, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ষপের তৈল অমৃত বিন্দুবৎ স্নিগ্ধকর ও স্নায়ব-স্থৈর্য্য-সাধক। যেখানে যে কোন যন্ত্র অচল, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ষপের তৈল সেই যন্ত্রের একমাত্র পরিচালক। যন্ত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড তৈল নহিলে চলে না। যন্ত্রের দোষে যেখানে কাজ আটকায়, সেখানে ক্ষুদ্র সর্ষপের তৈল ভিন্ন উপায় নাই। মর্ত্ত্যভূমে তৈল গতির একমাত্র উপায়। সর্ষপ তৈলের এতগুণ। আবার তৈল বাদে সর্ষপের যে খোসা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা মর্ত্ত্যভূমে সমস্ত গো-জাতির জীবন স্বরূপ এবং সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন করিবার প্রধান শক্তি স্বরূপ। দেবর্ষি! ক্ষুদ্র সর্ষপের তেজইবা কত। বজ্র নির্ম্মিত দেহকেও ক্ষুদ্র সরিষা জ্বালাইয়া দিতে পারে, মৃত্যুমুখী জীবকেও ক্ষুদ্র সরিষা মৃত্যুমুখ হইতে টানিয়া আনিতে পারে। এসকলই বিজ্ঞানের কথা—প্রকৃতি-তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানও বুঝাইতে পারে না, ক্ষুদ্র সরিষায় এমন একটি অলৌকিক ও অসাধারণ গুণ আছে। লোক মধ্যে প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, দুরন্ত দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত ক্ষুদ্র সরিষার তেজ সহ্য করিতে অক্ষম। দুই একটা সরিষা দেখিলেই দুর্দ্দান্ত দানবও দশদিক ছাড়িয়া পলায়ন করে, জগতে যত কিছু এবং যে কেহ দুষ্ট আছে, ভীতিবিহ্বল হইয়া সব দূরে লুকাইয়া পড়ে। সরিষার এত শক্তি, এত তেজ বলিয়া, সে যখন প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন তাহার ফুল দেখিলেই লোকে হতজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সেই জন্য হতজ্ঞান হওয়া কাহাকে বলে বুঝাইতে হইলে, লোকে "সরিষা ফুল দেখা" এই বিষম বাক্য প্রয়োগ করে। এসব কথা বিজ্ঞান বুঝা-ইতে পারে না। একথা মন্ত্র তন্ত্রের অন্তর্গত। অতএব বুঝিলে যে, প্রকৃত শক্তি থাকিলে ক্ষুদ্রত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব, যে ক্ষুদ্র সেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বপত্নী চিত্রারাণী ভূতপতি এবং ভবানীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে গন্ধর্ব্বপুরে গমন করিল। তখন জগজ্জননী গৌরী দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—বৎস!

তুমি তত্ত্বজ্ঞ। সর্ষপ-মাহাত্ম্য কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছ। এখন যাও, আমার অভিমত প্রকারে মর্ত্ত্যে সেই কথা প্রচার কর। শুনিয়া নারদ ঋষি ক্ষণমাত্র ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার চিত্ত পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, এবং শুভ্র শ্মশ্রু এবং শুভ্র জটা স্ফীত হইয়া উঠিল। বীণাযন্ত্রে উপর্য্যুপরি বড় বড় ঘা মারিয়া হরগৌরী স্তব গাহিতে গাহিতে দেবর্ষি যেখানে পুণ্যসলিলা সুরধুনী অনন্ত সাগরে মিশিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব সাগরসঙ্গম তীর্থে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং গন্ধর্ব্বপত্নীর ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া সুমধুর ও সুগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন;—

যে দেশ এই সাগরসঙ্গম পুণ্যে পুণ্যবতী, সেই দেশে কোন মহাবংশ হইতে অতি ক্ষুদ্র দেহবিশিষ্ট একটি মানব জাতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে তাহারা ক্ষুদ্র বলিয়া লোকমধ্যে ঘৃণিত হইবে। কিন্তু কালসহকারে ক্ষুদ্র সরিষার ন্যায় অনন্ত গুণে ভূষিত হইবে। তখন জীবমধ্যে তাহারা উচ্চ পথে বিচরণ করিবে। ক্ষুদ্র হইয়াও তাহারা এক একজন এক একটি লৌহ গুটিকার ন্যায় শক্ত হইবে। তাহারা এত কার্য্যক্ষম হইবে যে, যেখানে কার্য্য কঠিন, সেখানে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যসম্পন্ন হইবে না। যেখানে গতির প্রয়োজন, লোক সমাজে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক, সেখানে তাহারাই একমাত্র উপায়। তাহারা এত তত্ত্বদর্শী হইবে যে, অন্যের যাহা গূঢ় তথ্য, তাহাদের নিকট তাহা অতি তুচ্ছ কথা। তাহাদের প্রভাবে বলবান আপনাকে হৃতবল অনুভব করিবে; নির্জ্জীব নিষ্পীড়িত মুমূর্ষু সজীব হইয়া উঠিবে। যাহারা দুষ্ট এবং দুর্দ্দমনীয়, তাহারা সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গাভক্ত জাতির ব্যক্তিমাত্রকে দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিয়া পৃথিবীর অপরিচিত প্রদেশে লুকাইয়া থাকিবে এবং স্বল্পকাল মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইবে।

এই অপূর্ব্ব কাহিনী প্রকাশ করিয়া দেবর্ষি নারদ বেদব্যাসের নিকট বিদায় হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারত ভক্ত বেদব্যাস যথাকালে সেই কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ করিলেন।

পুরাণ কথা কি মিথ্যা হইবে?

বেদব্যাসের বাসনা কি পূর্ণ হইবে না?

বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষা কি মহাকালের মহাশরীরে স্থান পাইবে না?

নবজীবনের গান।

ভোর হইল, জগত জাগিল, চেতনে চাহিল নারী নর,
মধুর তানে, বিভুর গানে, বিহঙ্গমকুল ছাড়ে স্বর।
উদিত গগনে, লোহিত বরণে, তিমির-নাশন দিবাকর,
আলোকে ভাসিছে, পুলকে হাসিছে, নিখিল নাথের চরাচর।
অচল অসাড়, অটল পাহাড়, সমুখে হেরিয়া প্রভাকর,
চমকি চাহিল, থমকি রহিল, ঝক্‌মক্ করে গিরিবর।
মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গোপাল, শ্যামলে ধবল মনোহর,
বেণুর বাদনে, ধেনুর চারণে, শ্রবণ নয়ন তৃপ্তিকর।
লতার উপরে, পাতার ভিতরে, শাদা শাদা ফুল কি সুন্দর,
বায়ুর চালনে, প্রভুর চরণে, প্রণিপাতকরে ভক্তি-ভর।
সরসী শোভিনী, রূপসী নলিনী, পরশি কোমল রবিকর,
ত্যজিল শয়ন, তুলিল বয়ন, ঝরিছে নয়ন ঝর ঝর।
সুগন্ধ লইয়ে, সুমন্দ বহিয়ে, শীতল সমীর সুখকর,
শাখীরে নাড়িল, পাখীরে বলিল, যাও গাও দিক্‌দিগন্তর;
ভাগিল পাখী, জাগিল শাখী, হেরিল লতারে হৃদিপর,
বনের লতা, মনের কথা, বলিছে কাঁপিছে থর২।
ঘাসের ফলায়, গাছের পাতায়, মোতি ছড়াছড়ি অজস্র,
প্রতুল ঐশ্বর্য্য, অতুল আশ্চর্য্য, এ রাজ্যেরই যোগ্য রাজেশ্বর।
অনন্ত কেতন, অচিন্ত্য চেতন, মহান বিশাল বিশ্বধর,
সময় জীবন, প্রলয় ক্রীড়ন, ললিত ভৈরব মহেশ্বর।

কুঞ্জ সরকার।

কুঞ্জ সরকারকে কুঁজো মহাশয়ও বলিত। তিনি বাস্তবিক কুঁজো ছিলেন। কুঁজো মহাশয়ের নামে ও আকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য লইয়া রাঢ় অঞ্চলে একটা বড় গণ্ডগোল ছিল। এক দিন একজন পোড়ো গাছে চড়িয়া আমড়া পাড়িতেছিল, কুঞ্জ সরকার তাহাকে কিছু অতিরিক্ত ভৎসনা করেন; শেষে বলিয়া ফেলেন যে, "ঐরূপ মামড়া-ধরা গাছে চড়িয়াই আমার এ হেন দুর্দ্দশা, তুই আবার ঐরূপ গাছে উঠিলি?"

এই দিন হইতে মহাশয়ের নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া মহা গণ্ড-গোল আরম্ভ হইল। মহাশয় যদি জন্ম ধারণের পর হইতেই কুঁজো নয়, তবে উহার কুঞ্জ নাম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা জনে নানারূপ মীমাংসা করিত। কেহ বলিত, "মহাশয় বড় সেয়ানা, কুঁজো হওয়ার পর হইতেই আপনার গ্রাম বদল ও নাম বদল করিয়াছে। মনে ভাবিয়াছে যে, লোকে ত কুঁজো বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল।" মুরুব্বিরা বলি-তেন, যে "উহার জন্মের পর গণকে গণিয়া বলিয়া দেয় যে, ও কুঁজো হইবে, তাহাতে বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম, কাজেই বাপ মায়ে ককারের নাম দিতে গিয়া আদর করিয়া কুঁজো বলিয়া ডাকিত।" কেহ বলিত না, "উহার মামড়া-ধরা আমড়া গাছ হইতে পড়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা, ওটা পোড়ো শাস-নের ছলনা। অমন মিথ্যা কথা, ও রোজ সাড়ে সতের গণ্ডা কয়।" মীমাং সকেরা বলিতেন, যে "ও বরা বরই একটু কুঁজো ছিল বটে, কিন্তু আমড়া গাছ হইতে পড়িয়া অবধি একেবারে কাঁদিশুদ্ধ কলাগাছ ভাঙ্গার মত হইয়াছে।" এইরূপ নানা জনে নানা কথা কহিত। রাঢ় অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের কুব্জা-কৃতি লইয়া বড়ই একটা গণ্ডগোল ছিল।

একজন গুরু মহাশয়ের নাম লইয়া একটা অঞ্চলের লোক গণ্ডগোল করিত, এ কিরূপ কথা? তাহা যদি না হইবে, তবে তাহার কথা কে লিখিতে যাইত? আরও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, শ্লেট্ ভাঙ্গিয়া কাঠ লইয়া, সেই কাঠ খণ্ড আবার ছাত্রের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিতেছেন, কৈ কাহারও নামে প্রবন্ধ লেখা গেছে কি? না ক্ষণজন্মা লোক না হইলে তাহার স্থান-জন্মের কথা ভাবিবই বা কেন? আর দশের কাছে শাদা কাগজ কালো করিয়া

ছাপিতে যাইবই বা কেন? না কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক প্রদেশের প্রসিদ্ধ লোক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি।

আমড়াগাছের ঘটনা না ঘটিলে, কুঞ্জ সরকারকে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘাকৃতি মানুষ বলা যাইত। এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মানুষ বলাই একরূপ কবিত্ব। তিনি দ্বিপদ হইয়াও প্রায় চতুষ্পদ। কোমরটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে শরীরটা মাটামের মত হইয়াছে, হাত দুখানা আর একটু হইলেই ভূমিতে ঠেকিত। শরীরটা আসল তিন ভাঁজ। প্রথম ভাঁজ অবশ্য পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত; ঠিক খাড়া। তাহার পর কোমর হইতে কণ্ঠা,—দ্বিতীয় ভাঁজ, সমতল; তৃতীয় ভাঁজ মুখখানি, আবার বেশ খাড়া। সেই মুখের উপর দুই চক্ষু;—

সিঁদুর ত সবাই পরে;
সিঁদুর কপাল গুণে ঝলমল করে।

মুখের উপর দুই চক্ষু, অনুমান করি, অন্ধ ও কাণার ছাড়া আর সকলেরই আছে। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সেই দুই চোখ, আর তোমার আমার চোখ? ভাষা সঙ্কীর্ণ; তাই সেই হৃৎপিণ্ড পরীক্ষক লৌহশলাকা-সমষ্টির আধারের নামও চক্ষুঃ, আমার কপালের নীচের এই পীত পিঙ্গল পরকলাও চক্ষুঃ, আর, (কুরুচি বাঁচাইয়া বলিতে গেলে) ঐ ঘুম-মাখান,ঘুম-ভাঙ্গান মন্ত্র মণিদ্বয়ও চক্ষু। বাস্তবিক কিন্তু এসকল এক পদার্থ নহে। কুঞ্জ সরকারের চক্ষুঃ জ্যোতির্ম্ময়, এ কথা যে বলিতে হয়, বলুক, কিন্তু আমরা তাহা বলি না; কেন না, আমরা জানি কুঞ্জ সরকারের ছাত্রদের বোঝা বোঝা শোলা আনিতে হইত, এবং কোন দিন দৈবাৎ পড়োরা শোলা পোড়াইয়া রাত্রির জন্য রাখিয়া না গেলে, পর দিন অন্তত দশ পনের জন কঠোর বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হইত। কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে লোকের চালের লাউ কুমড়া দেখিতেন, তাঁহার চক্ষুতে তেজ থাকিলে অবশ্যই নিত্য লঙ্কাকাণ্ড ঘটিত। না, মহাশয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ও দুটি কেবল নিরাকার লৌহশলাকাময়। সেই শলাকা দ্বারা তিনি লোকের হৃৎপিণ্ড মানসে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মধ্যে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ভণ্ডামি, কতটকু আছে তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই ঘুরিতেছে; দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, নিম্নে সকল দিকেই ঘুরিতেছে, কিন্তু কখন উপর দিকে যাবে না। অনেকে বলিত যে, কুঞ্জ সরকার ঐহিক পারত্রিক কোনরূপ উপরওয়ালা

মানেন না বলিয়াই, তাঁহার দৃষ্টিও কখন উপরের দিকে উঠে না। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সম্বন্ধে ও কথাটা যে বড় ধরা আবশ্যক, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। কেননা তাহার চক্ষুঃ উপর দিকে ঘুরিলেও দৃষ্টি কখনই ভ্রূ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত না। খড়খড়ে-জানালার উপর বাহিরের দিকে দেওয়ালের গায়ে যেমন কাঠের গড়নের টপ থাকে, কুঞ্জ সরকারের খুব কাল, খুব ঘন মোটা চুলের ভ্রূ জোড়াটি সেইরূপ তাঁহার চক্ষুর উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়া ছিল। সেই ভ্রূকে আর দু জোড়া গোঁপ বলিলেও চলে। সঙ্করবাদীরা বলেন, যে, চক্ষুতে কুটি কাটি না পড়িতে পারে, এই জন্য মনুষ্য-ললাটে ভ্রূ দেওয়া হইয়াছে; বাস্তবিক তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুঞ্জ সরকারের বেলায় ধাতার সে সঙ্কল্প যে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়; কুটিকাটা দূরে থাকুক, টিক্‌টিকি আরশোলাও মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িলে, সেই ভ্রূজালে বাধিয়া থাকিত। তাহার পর সেই নাসিকা; সে ত খগ-দর্প-নাশিকা নহে; নগ-দর্প-নাশিকা। অটুট, অনড়, অসাড়, মুখমণ্ডলের মাঝে সিংহল দ্বীপের আদিম শিখরের মত দাঁড়াইয়া আছে; আর বন জঙ্গল কর্দ্দমপিচ্ছিল পরিপূর্ণ দুই গুহা নিম্নে হাঁ হাঁ করিতেছে। আর সেই নাসিকার সেই পাঠশালার আটচালার কলরব ভেদী গর্জ্জন! জড় জগতের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, সেই গর্জ্জনেই ছাত্রগণের সন্ত্রাস, এবং নিকটস্থ বাপীকূলসমাগতযুবতীপ্রৌঢ়াগণের হাস্য পরিহাস! গর্জ্জনের পর বর্ষণ আছে বলিয়াই ছাত্রগণের গর্জ্জনে সন্ত্রাস। আহারের পর কুঞ্জ মহাশয় একখানি পড়ো মাদুরি বিছাইয়া, আটচালার শালের খুঁটিতে একখানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে ঠেসান দিয়া বাম হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভোরপুর গুড়ক সেবা করিতে করিতে একেবারে বিশ্রাম করিতেন। চক্ষুর চঞ্চলতা ক্রমে সম্বরণ করিয়া, স্তম্ভ-লম্বিত বেত্র দণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তখন তদীয় সেই বেত্রনিহিত একদৃষ্টি দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় সার বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার ইহকাল, পরকাল; সকাল, বিকাল;—সকলই সেই বেত্রের ভরসা; বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় একান্ত মনে ভাবিতেছেন,—

ত্বয়া বেত্রদণ্ড করস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

এই নিধিধ্যাসনের পর সমাধির গর্জ্জন; গর্জ্জন যদি হঠাৎ একটু থামিল, তবেই অমনই পার্শ্বস্থিত ছপ্‌টি প্রকৃতির বারি বর্ষণের মত যেখানে সেখানে

পাত্র নির্ব্বিশেষে ছাত্রগণের শরীরে পতিত হইবে। সুতরাং গর্জ্জনের পর বর্ষণ নিশ্চয় জানিয়া ছাত্রেরা গর্জ্জনে বিলক্ষণ সভয় ছিল।

আর, যুবতীর হাস্য পরিহাস; তা পুরুষের অনেক গর্জ্জনেরই ঐরূপ পরিণাম—কৃষ্ণ সরকারের নাসিকার তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য বা দৌর্ভাগ্য নাই। স্ত্রীলোকেরা জানিত, যে, নিম্ন গহ্বরের গর্জ্জন কালে, উচ্চ কোটরের লোহশলাকা সকল নিস্তব্ধ থাকে; তাহাদের সেই লাভ; অভ্যাস বশতঃ গুরু মহাশয় নর নারী পশু পক্ষী এমন কি গাছ পাথর পর্য্যন্ত তাঁহার পড়ো বলিয়া মনে করিতেন; সেই নব বেদান্ত জ্ঞানেই তিনি বাপীকূলাগত রমণীকুলের উপর তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, তাহারা কিন্তু ভাবিত যে কাঁধের কাছে কাপড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বাঁকামল একটু ঢিলা হইয়াছে, কপালের টিকা একটু বাঁকা হইয়াছে, দুষ্ট গুরু মহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। মহাশয়ের সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথা। তা সকল দেশেই হয়; মহাশয়দের সহিত মহাশয়াগণের বিরোধত চির প্রসিদ্ধ। বালিকারা পাঠশালায় আশে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায় মহাশয় তাহা অবশ্য সহ্য করিতে পারিতেন না। কখন একটি আধটিকে পড়ো দিয়া ধরিয়া আনিতেন; তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইত, ছেড়ে দিলেই দূরে গিয়া এক চোক রগড়াইতে রগড়াইতে 'পোড়ারমুখো মহাশয়' বলিত; যুবতীদের সহিত আরও ঘোরতর বিবাদ। কৃষ্ণ public instructor অর্থাৎ সরকারি গুরু মহাশয়। যুবতীরা প্রত্যেকেই private-tutor অর্থাৎ খাসগুরু। অথচ উভয়েরই মনে বিশ্বাস আছে, যে তাঁহারা প্রত্যেকেই জগৎ গুরু। এই প্রথম বিরোধ। তাহার পর কৃষ্ণ মহাশয় কদাকার, কুব্জ, কঠোর; যুবতীরা কান্তিমতী, কমনীয়া ও কোমলা। ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ; মহাশয় বেত্র-বল, মহাশয়াগণ—(বলিতেই হইতেছে) নেত্র-বল; আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, সুতরাং যুবতীগণের সহিত মহাশয়ের নানা দিকেই বিরোধ। আর প্রৌঢ়ারা ত গুরু মহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। সোণার গোপালের যে দুবেলা পিট দাগড়া দাগড়া করিয়া দেয়, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল বলিয়াছেন কি? না এদেশে মাতৃশরীরে শাসনের ভাব কখন দেখা যায় নাই। আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানগণের অল্প বয়সে দুর্দ্দশা, প্রধানত মায়ের আদরে ঠাকুমার প্রশ্রয়ে, পিসিমার গুণেই হইয়া থাকে। মা যে সেই মুখ খানি কাঁদ কাঁদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে কপাল মুছাইয়া দিয়া—বলি-

লেন, " ছোঁক মেনে একটা যেন অকাজই করিয়াছিল, তা এমনই করে কি লাঞ্ছনা করে গা ?—শরীরে কি একটু দয়া নাই ?" সেই দিন হইতেই ছেলের পরকাল খসিতে লাগিল।—তা খসে খসুক,—আমরা কেন আসল কথা হইতে খসিয়া পড়ি ?—প্রৌঢ়ারা গুরু মহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা,—বালক, যুবক, বৃদ্ধ কেহই দেখিতে পারুক আর নাই পারুক, অথবা দেখিয়া হাসুক বা কাসুক, তাহাতে কুঞ্জ সরকারের বড় একটা দৃক্‌পাত ছিল না। আট চালার মধ্যে হইলে, বেত্র পাত ছিল। যুবতীরা মহাশয়ের খাস রাজধানী মধ্যে আসিতেন না,—তাই রক্ষা।

গুরুমহাশয় কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না, কিন্তু দুইটি পদার্থে তাঁহার হৃৎ পাত হইত। বোস্ বাগানের তলার পথ দিয়া যাইতে হইলে, দিনের বেলাতেই তিনি জড় সড় হইতেন, রাত্রি কালে সর্ব্বত্রই তাহার সমান ভূতের ভয় ছিল। ক্রমশঃ।

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী।

ভারতবর্ষে কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না ইহা স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্‌সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি—"প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি।"*

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি এইত আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

---

* Memoires of Cattermob Cruikshank Hutchinson. Vol. V. P. 1058. ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাষ্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গালা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাঁটাগাছের মত বিনা চাসে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্ব্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্ব্বে হয় ত কত পূর্ব্বে ও যদি পরে হয় ত কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়; যথা—

প্রথমত—চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব। বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে আছে—'ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।' চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কি লেখা আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসর মতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কি কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোন কথা নাই। * এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতা বশত ভানুসিংহের কোন উল্লেখ নাই। §

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দ বংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে—কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোন কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না। ¶ যদি কোন দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিন—তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম

---

* See English Translation of Hitopadesha by H. M. Dibdin. Vol. 3. page 551.

§ কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

¶ Vide Pictorial Handbook of Modern Geography. Vol 1. page 139.

পাওয়া যায়—কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ, কোকিল, শ্রীচন্দ্র। এমন কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না। *

বিশ্বগুণাদর্শ দেখ—মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখ, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই। §

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কু র্বেতাল ভট্ট ঘটকর্পূর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্ত।

কই, ইহার মধ্যেওত ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না। P তবে, কোন কোন ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এসন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়!

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন—দোষ কেবল গ্রন্থ গুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানু সিংহের জন্মকাল খৃষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্ব্বে। পরম পণ্ডিত বর সনাতন বাবু বলেন খৃষ্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্ব্বলোক পূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণ বাবু বলেন ১১০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহা মহোপাধ্যায় সরস্বতীর বর পুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃষ্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্ব্বে, না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্খ নির্ব্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে

---

* See Hong-chang-ching. By kong-fu.

§ সাহনামা, দ্বিতীয় সর্গ।

P Peterhoff's Chromkroptologisheder Unterlutungeln.

জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোন বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না, যে একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্ম কাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে। * তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক্, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক্, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজ তরঙ্গিনী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃষ্টাব্দের লোক $। তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। "গমন করিলাম" হইতে "গেলুম" হয়। "ভ্রাতৃজায়া" হইতে "ভাজ" হয়। "খুল্লতাত" হইতে "খুড়ো" হয়। কিন্তু ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ "পিরীতি" শব্দ "প্রীতি" অপেক্ষা "তিখিনী" শব্দ "তীক্ষ্ণ" অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় "তীক্ষ্ণানি সায়কানি।" সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃষ্টের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্ত্তিত হইতে কিছু না হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃষ্ট জন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা খৃষ্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

---

* See the Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language. Conjongation of Verbs. Vol. 3. page 999.

$ History of the Art of Embroidery and Crewel work. Appendix.

ভানুসিংহের আর সমস্তই ত ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্ম ভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এসম্বন্ধেও মত ভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতন বাবু একরূপ বলেন ও পরম ভক্তি ভাজন রূপ নারায়ণ বাবু আর একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্ধৃত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দু মাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখা গুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখক দ্বয়ও গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

সিংহল দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ত্রিন্‌কমলীতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। "হ" টিকে কেহ বা "ক্ষ" বলিতেছেন, কেহ বা "ঞ্চ" বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে "হ" তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার "ভ" টিকে কেহ বা বলেন "র্চ্চ," কেহবা বলেন "ক্লৈ," কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, "ভানুসিংহ" শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিন্‌কমলীতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কি না সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতে সূর্য্যের (ভানু) প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্ত্তিটা পাওয়া গেল না। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংশ হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংশ হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্ত্তি-খোদিত ফলকখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে—স্পষ্টই

দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানুপ্রতিমূর্ত্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার কোন অর্থই থাকেনা। অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্য্যগতিকে নেপাল হইতে পেষোয়ারে যাতায়াত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। এবং স্নান-উপলক্ষে মাঝে কাঝে ত্রিন্‌কমলীর কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে। ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত বুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশ চন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি, যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় বাস করি—কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একটা প্রস্তর ফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিন্‌কমলীর অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়ত বা অন্যান্য মতিমান্ লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীত ভাবে তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতা গুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয় বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক, ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয় রূপে স্থির করা গেল। তবে, এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক্ বা না হউক্ সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা ত স্থির হইয়াগেল।

মদন পূজা।

কি দিয়ে মদন, পূজিব তোমা, অনঙ্গ তুহারি নাম!
বসন্ত সমীর, নিশোআশ্ তোর, কুসুম লাবণ্য ঠাম!
সুবাদ্য-ঝঙ্কার, সঙ্গীত-উচ্ছাস, বচন তুহার মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর, তুহারি পরাণ জানি!

কেমনে মদন, পূজিব তোমায়, তুহারি ধনুর ভয়ে,
নয়ন-দিঠিতে, দিঠি জড়াইয়া, দাঁড়াই অথির হয়ে।
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি, থমকে চমকে চাই,
জাগি দিবা নিশি, তুহারি তরাসে জুড়াতে নাহিক পাই!

পূজিব কিরূপে, তোমার মদন, তুহার পূজার প্রথা,
কেহু না জানিল, কেহু না শিখিল, সে গূঢ় রহস্য কথা!
মুনির ধেয়ানে, জ্ঞানীর জেয়ানে, তুহার আকার-ভেদ,
সুজন প্রেমিক; আঁখিতে কেবলি, প্রকাশ তুহার বেদ!
পূজিব তুহারে, তাহারি বিধানে, না জানি না মানি আন্,
"একমেব" বাণী, বদনে উচারি, তুয়া পদে দিব প্রাণ।
পূজিব তুহারে, বিহানে মধ্যাহ্নে, পূজিব সাঁজের্ ই বেলা,
ইন্দ্রিয়-কাননে, আঁধার ডুবাতে, প্রেমের জোছনা খেলা!

পূজিব তুহারে— চরণে বিথারি, জীবন-জাহ্নবী-জল,
পূজিব তুহারে— মানস ব্রহ্মাণ্ড, করিয়া তীরথ-স্থল।
তুহারি পূজাতে, কুল পদ মান, অবনী উৎসর্গ দিয়া,
দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধরি, হিয়াতে প্রতিমা নিয়া!

সে দেহ-গঠনে, মূরতি গঠিব, সে দুহুঁ নয়নে আঁখি,
তেমতি ফুটানে, ভুরুযুগে টান, দেখিব মানসে আঁকি।
বসন চলন, কটি উরুদেশ, সকলি তেমতি ঠাম,
দিব সাজাইয়া, অনঙ্গ তুহারে, সেহ নামে তুয়া নাম।
চাঁদের আলোক, আরতি করিব, পরাব বাসনা ফুল,
অনঙ্গ তুহারি, বদন হেরিব, নিখিলে নাহিক তুল!
পূজা পাঠাবধি, এই সে তুহার, একহি প্রেমিকে জানে,
নাহি কালাকাল, দেশ পরদেশ তুয়া বেদ এহি মানে।

"কি দিয়ে পূজিব, মদন তোমায়"— আর না আনিব মুখে,
শিখিনু শিখাব, তুয়া পূজাবিধি, কিয়া সুখ কিয়া দুখে!
এ বিধি-বিধানে, যে জানে পূজিতে তুয়া দরশনে তেঁহ,
কঁহু নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ, নিশি, দিবা, বন, গেহ!

চিনেছি এখন, মদন তোমায়— অনঙ্গ কেবলি নাম।
বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোআশ্, কুসুম লাবণ্য ঠাম,
সুবাদ্য ঝঙ্কার, সঙ্গীত উছাস্, বচন তুহারি মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর তুহারি পরাণ জানি;—
অবহি পূজিব, অনঙ্গ তুহারে, তুহু সে পরম প্রাণী

নবজীবন।

১ম ভাগ। } ভাদ্র। ১২৯১। {২য় সংখ্যা।

সমাজ-শরীর।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

১।

এক্ষণে অন্তত তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, যে সমাজকে শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে সমাজ শরীরী পদার্থের ন্যায় নিজ নিয়মে পরিচালিত, উৎপন্ন, বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইতেছে। স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক, যে যদিও মনুষ্যই সমাজ-শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব বটে, তথাপি সমাজকে মনুষ্য সমষ্টি বলা যায় না। স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, শরীরী পদার্থ যে সমস্ত নিয়মে পরিচালিত হয়, মনুষ্য সমাজও প্রায় সেইরূপ নিয়মেই পরিচালিত হইয়া থাকে। যদি মনুষ্য মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত স্বীকার্য্যমালা অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সংসারের কিরূপ ইষ্টানিষ্ট সম্ভাবিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে শ্রেণীগত বিদ্বেষ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সাধারণ প্রজারা উচ্চবংশীয়দের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। নির্ধনেরা ধনীর ধন-লুণ্ঠনের প্রয়াস পাইতেছে। প্রজারা ভূম্যধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। শ্রমজীবীরা বেতনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ইউরোপীয় সমাজে আশঙ্কা, ভীতি, বিদ্বেষ, কলহ, কোলাহল, প্রভৃতি নিত্যই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বন্দুক, ডাইন্যামাইট, ছোরা, ছুরি প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীতে সাম্যসংস্থাপন করিবার আয়োজন করা হইতেছে। রুসিয়ায় Nihilists, ফ্রান্সে Communists, জর্ম্মনিতে Social Democrat, স্পেনে Black Hand, ইটালিতে Internationalist, আয়র্লণ্ডে Fenian ও Avenger, ইংলণ্ডে Land League প্রভৃতি বিপ্লবকারীগণ লোমহর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড

যারা পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে। আমেরিকা এই দস্যুদিগকে স্থলবিশেষে প্রোৎসাহিত করিতেছে। এই নৃশংস দস্যুদিগের একজন নেতা আমেরিকায় বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছেন—"আর তিন বৎসরের মধ্যে আমরা আয়র্লণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। আমি এই কথা বলিতেছি বলিয়া হয়ত আমাকে অনেকে নির্ব্বোধ ও পাগল বলিয়া তিরস্কার করিবে। আমি নির্ব্বোধ নহি, কিন্তু আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি পাগল। এক্ষণে সকল আয়র্লণ্ড-বাসীকেই পাগল হইতে হইবে। ইংলণ্ডে আমাদের স্বদেশীয়েরা (আইরিশেরা) ডাইন্যামাইট ব্যবহার করিতেছে। আমি ঐ ব্যবহারের অনুমোদন করি। আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয়দিগকে অর্থদ্বারা সাহায্য করি, তাহা হইলে তিন বৎসরের মধ্যে লণ্ডন নগরী ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। আইস আমরা সকলে মিলিয়া ইংলণ্ডের নগরীমালাকে চূর্ণীকৃত করি, সকলে মিলিয়া ইংরেজ-দিগকে হত করি। এক্ষণে প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় আসিয়াছে। এক্ষণে হত্যা করিলে, লুণ্ঠন করিলে, আমাদের কোনরূপ পাপ হইবে না। কি মনুষ্য, কি ঈশ্বর কেহই আমাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত করিতে পারিবে না।" এই নৃশংস রাক্ষসদিগের আর একজন নেতা ইংলণ্ডে বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছেন —"বাইবেলে লিখিত আছে—'যে পরিশ্রম না করিবে সে খাইতে পাইবে না।' ইহাই ঈশ্বর-নিয়ম। কিন্তু এই যে সৌধমালা চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে ইহাতে কাহারা বাস করে? ইহাতে কি শ্রমজীবীরা বাস করে? না। যাহারা পরিশ্রম করে না তাহারাই ইহাতে বাস করে। যাহাতে এই বিসদৃশ প্রথার উন্মূলন হয়, আমাদের সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।" এইরূপে নানা স্থলে প্রকাশ্যভাবে নৃশংসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। বোধ হয়, এমন এক দিন আসিবে যখন ইউরোপে এই রাক্ষসেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবে।

সেই দুর্দ্দিনে কে এই সংসারকে ইহাদের করালকবল হইতে রক্ষা করিবে? যখন এই দুর্দ্দান্ত দস্যুরা সমগ্র সংসার উপপ্লবের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইবে, তখন কে উহাদিগকে নিবারিত করিবে? পূর্ব্বে ঈশ্বরভয়ে, পরকাল-ভয়ে, নরকভয়ে এই সমস্ত নৃশংসতা নিবারিত হইত। কিন্তু য়ুরোপ হইতে পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সকল দিন দিন তিরোহিত হইতেছে। তবে এক্ষণে সংসার রক্ষার উপায় কি? আমাদের বোধহয় যে,সমাজ-শরীরতত্ত্ব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে, এবং চতুর্দ্দিকে সমাজ-শরীরতত্ত্বের প্রচার করিলে পূর্ব্বোক্ত নৃশংসতার স্বপ্নমাত্রও সংসারে থাকিবে না। যদি বলা যায়, যে সকল মনুষ্যই সুখভোগে

সমান অধিকারী, যদি বলাবায় যে সুখান্বেষণই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর পিশাচের ন্যায় কার্য্য করিবে এবং ঐরূপ কার্য্য দ্বারা তাহারা সংসার বিনষ্ট করিবে ও আপনারাও বিনষ্ট হইবে। কিন্তু যদি সমাজ-শরীরতত্ত্ব প্রকৃত হয়, তাহা হইবে মনুষ্যের অধিকার ও মনুষ্যের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ের নূতনরূপ অর্থ করিতে হয়। শরীরী পদার্থ স্বাভাবিক নিয়মবলে নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভাজিত হইয়া থাকে। কোন অঙ্গ মস্তক হয় এবং মস্তকের যে কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাই করে, কোন অঙ্গ বা উদর নামে কথিত হইয়া উদরের কার্য্য করে, কোন অঙ্গ বা হস্তাকারে পরিণত হইয়া হস্তের উচিত কার্য্য করে। এক্ষণে যদি মস্তক মস্তকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হস্ত পদাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহা হইলে শরীরী পদার্থের উচ্ছেদ শীঘ্রই সম্পাদিত হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য্য করে তাহা হইলে সমস্ত অঙ্গের ও তজ্জন্য সমস্ত শরীরের পুষ্টি ও কান্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সমাজ-শরীরের কোন অঙ্গ মস্তকরূপে, কোন অঙ্গ উদর রূপে, কোন অঙ্গ হস্তপদাদিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। যদি সম-সম্পত্তি-বাদীগণ সমাজকে বিধ্বস্ত করে, তাহা হইলেও আবার ঐ স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই পুনরায় সমাজ-শরীর মস্তক, উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গে পুনরায় বিভাজিত হইবে। তবে এক্ষণে কি করা উচিত? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উচিত যে তাহারা আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে। "We have no rights; we have duties." এটি বুঝা চাই, যে আমাদের কিছুতেই কোনরূপ স্বত্ব নাই, কিন্তু সকল বিষয়েই আমাদের একটা না একটা কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা সমাজের মস্তক স্বরূপ তাহারা চক্ষুকর্ণের সদ্ব্যবহারে মস্তিষ্কের পরিমিত সঞ্চালন করিতে থাকুন। যাঁহারা সমাজের চরণ স্বরূপ তাঁহারাও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করুন। যিনি মস্তক তিনি মস্তকের কার্য্য করিলে তাঁহার জীবন সার্থক হইবে। যিনি চরণ তিনি চরণের কার্য্য করুন, তাঁহার জীবন তাহাতেই সার্থকতা লাভ করিবে। এইরূপে বিদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে, ধরণী শান্তিময়ী হইবে; এবং সমগ্র মানবমণ্ডলী পরমসুখে সংসার যাত্রা সংসাধিত করিবেন।

কেহ হয়ত বলিবেন, যে "যিনি হর্ম্ম্যতলে উপবেশন করিয়া সদ্বস্তার ভোজন করেন, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যায় শয়ন করেন, দাস দাসীতে যাঁহার গৃহ কল-কলায়মান, তিনি ঐশ্বর্য্যের মনোরম দোলায় দোদুল্যমান হইয়া ঐ ব্যবস্থা

করিতে পারেন। কিন্তু যে কৃষক অহোরাত্র গর্দ্দভের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া পরিবারের জন্য দুইবার চারিটি অন্ন যোগাইতে পারে না, সে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবে কেন? আমি নিজে এ কথার কোন উত্তর দিতে চাহি না। কিন্তু ইংলণ্ডের এক জন শ্রমজীবীর কথা আমি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। "There was never a time, when men engaged in the assertion of their rights, were in so much danger of neglecting their duties. The partisan cries of the rights of capital, the rights of labour, the rights of land-holders, the rights of those who have no land, are for ever ringing in our ears, but of duties we are told little or nothing...... We see in men the dangers which beset the tendency to make more interest in rights than duties and its brutalising results." অনেকে মনে করেন যে যাহাকে কায়িক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার ন্যায় নীচকর্ম্মা এবং অসুখী মানব, বোধ হয়, আর কেহই নাই। কিন্তু এই ইংলণ্ডের শ্রমজীবী এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়। "It is only by culture that men and women can be brought to realise the full GLORY and HONOUR of manual labour." যে শিক্ষাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও পার্থিব সুখমাত্র বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যে শিক্ষাপ্রভাবে শূদ্র দাসানুদাস হইয়াও কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি অভক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই। এক্ষণে সমাজ রক্ষার জন্য সেই ধর্ম্মশিক্ষার, সেই নীতিশিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের বোধ হয়, যে সমাজ-শরীর-তত্ত্ব সেই ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রধান সহায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কিন্তু বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলেই যে সমাজের সম্পূর্ণতা হইবে তাহাও নহে। সমাজস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগণকে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যতই আমাদের সভ্যতা বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা পরস্পরকে বিদ্বেষ না করিয়া পরস্পর পরস্পরের উন্নতি কামনা করিব। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে ধনী ধনগৌরবে অন্ধ হইয়া দরিদ্রের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিবেন না এবং দরিদ্রও ধনীর ঐশ্বর্য্যের প্রতিহিংসা করিবেন না। সমাজের অসভ্য অবস্থায় অনৈক্য, অশান্তি ও কলহ থাকিতে পারে। কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ সমাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঐক্য ও সখ্য সংস্থাপিত হইবে।

কিন্তু এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে যদি ঐক্যই আয়তন বৃদ্ধির ফল হয়, তবে এক্ষণে বৃহৎ বৃহৎ সমাজে অনৈক্য এবং অপ্রীতি দেখা

যায় কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে চাই, যে যেমন শরীরী পদার্থ মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি মনুষ্য সমাজও মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ফরাসিস্ রাজবিদ্রোহের সময় সমাজ মধ্যে যে ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছিল, আজিও সে ব্যাধির উপশম হয় নাই। ঐ সময়ে সাম্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি যে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও ভ্রমসঙ্কুল মত প্রচলিত হইয়াছিল, যে সমস্ত উন্মাদক দ্রব্য সেবনে মনুষ্যসমাজ তৎকালে উন্মাদিত ও পশুভাবাপন্ন হইয়াছিল, আজিও সে সমস্ত মতের উৎপাটন হয় নাই, আজিও মনুষ্যের সেই উন্মত্ততা বিদূরিত হয় নাই। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে, অর্থাৎ সদ্‌যুক্তি, সন্নীতি ও সুধর্ম্ম প্রচারে মনুষ্যসমাজ পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু যদি এই উৎকট ব্যাধির সময় মনুষ্য-সমাজ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, যদি ভাবি ইষ্টানিষ্ট না বুঝিয়া মনুষ্যসমাজ বর্ত্তমান সুখের জন্য কোনরূপ অহিতাচার করে, তাহা হইলে ইহা অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমান সময়ে সমাজ-শরীরে যে ঘোর ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে সমাজ-শরীর-তত্ত্বজ্ঞানই সে ব্যাধির পরম ঔষধ।

২।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে যদি মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইলে মনুষ্য নিজ ইচ্ছায় তাহার পরিবর্ত্তন কিরূপে করিতে পারে? যদি সমাজকে শরীরী বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের স্বাধীনচেষ্টা বা স্বাধীনইচ্ছা অথবা স্বাধীনকার্য্যের স্থল থাকে না।

মনুষ্য-সমাজকে শরীরী পদার্থ বলিলে মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার বা কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন শরীরী পদার্থের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন গুণে মণ্ডিত। বৃক্ষের অঙ্গে যেসমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয়, প্রাণীর অঙ্গে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে। মনুষ্য-সমাজ নামক শরীরী পদার্থের অঙ্গে (অর্থাৎ মনুষ্যে) স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে। তাহাতে সমাজের শরীরীভাবের কোনরূপ ব্যাঘাত হইতেছে না। কিন্তু মনুষ্য স্বাভাবিক নিয়মের বা কার্য্যের বিরুদ্ধে কতদূর ও কি পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে, ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রশ্ন। মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিক নিয়মবলে এক দিকে প্রধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নিজ চেষ্টায় ঐ গতির প্রতিরোধ বা বৈপরীত্য সঙ্ঘটন করিতে পারে কি না? মনুষ্য যে

স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা আমরা প্রত্যহই নিজের ও অন্যের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি। যাহার সঙ্গীতশক্তি নাই, সে স্বাভাবিক নিয়মবলে গান করিতে অক্ষম। কিন্তু সে যে উৎকৃষ্টরূপে গান করিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি। যে স্বভাবত ক্রোধী, সে অক্রোধ হইবার ইচ্ছা করিতে পারে। যে স্বভাবত লোভী সে নির্লোভ হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে। আর শুদ্ধ ইচ্ছাই বা কেন বলি? সে চেষ্টাও করিতে পারে। লোভী লোভসংবরণের চেষ্টা করিতে পারে, ক্রোধী ক্রোধসংবরণের চেষ্টা করিতে পারে। তবে এক্ষণে দেখিতে হইবে যে এরূপ ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কোন ফল হয় কি না? মহা-বলবান্ প্রকাণ্ড, অচিন্তনীয়, অনমুমেয় স্বভাবশক্তির বিরুদ্ধে, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ মনুষ্যশক্তি কতক্ষণ বা কি পরিমাণে যুদ্ধ করিতে পারে?

আমাদের বোধহয় যে মনুষ্য স্বাভাবিকশক্তি ও স্বভাবনিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাদের উপর আপন ইচ্ছায় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। স্বভাব নানাবিধ নিয়মে, নানাবিধ শক্তির পরিচালনে কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটার সাহায্য অবলম্বন করিয়া অন্যটিকে পরাজয় করিতে পারে। রসিচন্দ্র রায় তাঁহার একটি সঙ্গীতের এক স্থলে গাহিয়াছেন—

"বারে বারে রণে তুমি দৈত্য জয়ী, একবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী,
রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে, জিনিব তোমাকে।"

রসিকচন্দ্র ভবানীকে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক সেইরূপ প্রকৃতি দেবীকে সম্ভাষণ করেন। বৈজ্ঞানিক বলেন "হে মাতঃ! আমি পিপীলিকা হইতেও অধম। কিন্তু আমি তোমার সাহায্যেই তোমাকে পরাজিত করিতে পারি। তোমার এই বিশ্বমন্দিরে নানা নিয়ম নানা দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ইহাদের একটির সাহায্যে অন্যটিকে পরাজিত করি। যখন স্বাভাবিক নিয়ম বলে তোমার প্রবল সমুদ্রে তোমার প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয় তখন আমি ঐ সমুদ্রোপরি তোমার তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঐ ঝটিকার শান্তি করি। আমি অনেক বিষয়ে এখনও তোমার সাহায্য অবলম্বন করিতে শিখি নাই। কিন্তু আশা আছে যে আমি তোমার সাহায্যে তোমার গতি নিয়মিত করিয়া আমার নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া তোমার কামনা পূর্ণ করিব।" ফলত যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে

যে আমরা অনেক স্থলেই স্বভাবের সাহায্যে স্বভাবকে পরাজিত করিয়া থাকি। স্বভাবস্থ ঔষধ লইয়া স্বভাবজাত রোগের নিবারণ করি। স্বভাবজাত বৃক্ষপত্র বা লতা পাতাদি লইয়া স্বভাবজাত শীতাতপাদির নিবারণ করি। মহামতি কোম্‌ত এতৎ সম্বন্ধে যে নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে নিয়ম সকলের বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তিনি বলেন, যে নিয়মগুলি অমিশ্র (Simple) সেগুলির আমরা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিলে চারি হয়, ইহা স্বাভাবিক অমিশ্র নিয়ম। ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফল অন্য বাহু হইতে বৃহৎ ইহাও স্বাভাবিক অমিশ্র নিয়ম। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত অমিশ্র নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্য ইচ্ছা করিলে দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ করিতে পারে না। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ত্রিভুজের দুই বাহুর যোগফলকে অন্য বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্র করিতে পারে না। কিন্তু স্বভাবের যে নিয়ম গুলি মিশ্র (Complex) অর্থাৎ যেসমস্ত স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দুই বা ততোধিক নিয়ম কার্য্য করে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে সেগুলির পরিবর্ত্তন করিতে পারে। পিতা মাতার যেরূপ আকার ও স্বভাব, পুত্রের আকার ও স্বভাব সেইরূপই হইবে, ইহা একটি স্বাভাবিক মিশ্র নিয়ম। কারণ এই স্বাভাবিক নিয়মের সহিত অন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম মুখ্য বা গৌণভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। পুত্রের স্বভাব পিতা মাতার স্বভাবের ন্যায় হইবে, জাতীয় স্বভাবের অনুরূপ হইবে, দেশের জলবায়ু অনুসারে ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টান্তের দ্বারা ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার গুণে ঐ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, সময়ের গতি অনুসারে (যুগধর্ম্ম অনুসারে) ঐ স্বভাবের ব্যত্যয় হইবে,—এইরূপ নানাবিধ স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য দ্বারা পুত্রের চরিত্র সংঘটিত হইবে। এক্ষণে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে কতকগুলির বলাধান ও অন্য কতকগুলির বলহানি করিয়া মনুষ্য ইচ্ছাবলে ও চেষ্টা দ্বারা পুত্রের স্বভাবের নানাবিধ বৈচিত্র সম্পাদন করিতে পারে। এইরূপে যে স্থলে যত মিশ্র স্বাভাবিক নিয়ম কার্য্য করে, অর্থাৎ যে স্থলে যত অধিক স্বাভাবিক নিয়ম কার্য্য করিবে, সেস্থলে মনুষ্য তত অধিক পরিমাণে নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টার সাফল্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই স্বাভাবিক নিয়ম বিমিশ্রভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ সামাজিক প্রত্যেক ব্যাপারেই অনেকগুলি করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম

একত্র কার্য্য করে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে মনুষ্য সামাজিক ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বারা নানাবিধ পরিবর্ত্তন সম্পাদিত করিতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যখন কোন এক সমাজ অন্য সমাজ দ্বারা বিজিত হয়, তখন স্বাভাবিক নিয়মবলে জেতারা সমাজের প্রধান অঙ্গ ও বিজিতেরা নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। স্পার্টানদের মধ্যে হেলট্, মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদাস, রোমানদের মধ্যে ক্লায়েণ্ট, ইংলণ্ডীয়দের মধ্যে সর্ফ, হিন্দুদের মধ্যে শূদ্র, প্রভৃতি বহুতর দৃষ্টান্ত ঐ স্বাভাবিক নিয়মের সাক্ষ্য দান করিতেছে। কাল-সহকারে সমাজের ঐ দুই অঙ্গ পূর্ণাবয়বতা প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়। প্রধানেরা ঘৃণা, গর্ব্ব, জাত্যভিমান প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজস্থ নবোদ্গত অঙ্গের বিনাশ চেষ্টাকরে। নবোদ্ভূত নিকৃষ্ট অঙ্গও নব বলে বলীয়ান্ হইয়া পূর্ব্ব প্রভুর গৌরব হানির যথাসাধ্য চেষ্টা করে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও আয়োজন হয়। কিন্তু মনুষ্য, অন্ধ মনুষ্য স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্য না বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষণিক সুখভোগের অভিলাষে সমাজ-শরীরে প্রবল কুঠারাঘাত করে। যে সমাজে বুদ্ধিমান পরিচালক থাকেন, সে সমাজে প্রধান ও নিকৃষ্ট এ উভয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে সখ্য সংস্থাপিত হইয়া সমাজ শরীরের পুষ্টিসম্পাদন হয়। রোমে প্রধান ব্যক্তিরা অল্পে অল্পে নিকৃষ্টের সহিত একীকৃত হইয়া সমাজ-শরীরের অতীব বলাধান করিয়াছিল। স্পার্টা-তেও হেলটেরা স্পার্টানদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে সর্ফগণ ভূম্যধিকারীর দলে উত্থিত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু যে সমাজে নির্ব্বোধ বা স্বার্থপর পরিচালক থাকে সে সমাজে এইরূপ সম্মিলন হয় না। আথেন্সে পেরিক্লিস্ অন্যদেশের অর্থ স্বদেশের কার্য্যে ব্যয়িত করিয়া আথেন্সের ভাবি সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ-লুই প্রধানদিগের সম্মাননা ও নিকৃষ্টদিগের অবমাননা করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত করিলেন। এই সমস্ত এবং অন্য অন্য দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে প্রত্যেক সমাজেই কাল সহকারে প্রধান ও নিকৃষ্ট এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এবং ইহাও দেখা যাইবে যে যেখানেই প্রধান ও নিকৃষ্ট ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে পারিয়াছে, সেখানে সমাজের গৌরব, বল ও শ্রী বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যাইবে যে, যেখানেই প্রধান নিকৃষ্টকে

পদদলিত করিয়াছে, সেইখানেই হয় কিয়ৎকাল পরে নিকৃষ্ট প্রধানের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে, নয় নিকৃষ্ট প্রধানের সহিত সমস্ত সমাজ একেবারেই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মবলে ইংরাজেরা এদেশে প্রকৃষ্ট শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। যদি এই সমস্ত প্রকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরাজেরা নিকৃষ্টদের সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মবলে প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এক সমাজভুক্ত হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয় সমাজ অভূতপূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইবে। কিন্তু যদি এতদ্দেশীয় ইংরাজেরা নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ ভারতবাসীদিগকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐ স্বাভাবিক নিয়ম বলেই হয় নিকৃষ্টেরা তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে, নয় নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট উভয়েই অন্য সমাজ দ্বারা পরাজিত হইয়া কাল-কবলে নিপতিত হইবেন। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে চারিটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। যথা—

১ম। স্বাভাবিক নিয়মবলে সমাজমধ্যে নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট—এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

২য়। স্বাভাবিক নিয়মবলে ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে সখ্যভাব সংস্থাপিত হইবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইয়া থাকে।

৩য়। মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া এই স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ বা সঙ্কোচন করিতে পারেন।

৪র্থ। যেখানে স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ না হয়, সেখানে প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কিয়ৎকাল সংগ্রাম করিয়া উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যেখানে পরিপোষণ ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পায়, সেখানে সমাজও নিত্য নিত্য নব নব ভাবে বিকশিত হইতে থাকে। অচিরেই ঐ সমাজ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া নিজের ও অন্যের প্রভূত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে।

সামাজিক ব্যাপারে মনুষ্য কিরূপে নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারে, এবং কিরূপে ঐ ইচ্ছা ও ক্ষমতার দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা বোধ হয় এক্ষণে কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে।

৩।

শরীরী পদার্থমাত্রই বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যদি সমাজ শরীরী পদার্থ হয়, তাহা হইলে সমাজও বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সমাজের উন্নতির

জন্য বৃথা চেষ্টা করার প্রয়োজন কি? যাহার অবনতি ও মৃত্যু অবধারিত, তাহার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করায় লাভ কি?

অতি সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। মনুষ্যের জরা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু অবধারিত। অথাপি মনুষ্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়াস করে কেন? তথাপি মনুষ্য শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য লালায়িত হয় কেন? সেই-রূপ যদিও মনুষ্য-সমাজের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত,তথাপি মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধেও সকলেই উহার উন্নতির কামনা করিয়া থাকে। নিজ জীবন রক্ষাকরা প্রাণি-মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেইরূপে নিজ সমাজ রক্ষা করাও মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তদ্ভিন্ন সমাজ নামক শরীরী পদার্থেরও নিজ শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

৪।

সমাজ ও সমাজান্তর্গত মনুষ্য—এ উভয়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার করা যাউক। স্পেনসরের মতে সমাজের উচিত, যে সমাজ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু সমাজ নামক স্বতন্ত্র শরীরী পদার্থ কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত নাই। সমাজ শরীরী পদার্থের ন্যায় কতকগুলি শারীর নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং সমাজ কিরূপে এ চেষ্টা করিবে? বরং অন্যদিকে ব্যক্তিমাত্রেরই সমাজপুষ্টির চেষ্টা করা উচিত। ব্যক্তিমাত্রেরই মনে আত্মহিতকরী ও সমাজহিতকরী উভয় প্রকার প্রবৃত্তিই বিদ্যমান আছে। সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিবলে মনুষ্য স্বতই আত্মহিতকর কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার ঐ প্রবৃত্তি স্বভাবতই প্রবলা। ঐ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় না দিয়া যাহাতে সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পরিপোষণ হয়, শিক্ষক মাত্রেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। সমস্ত সমাজের উন্নতি হইলে কাজেকাজেই ব্যক্তিমাত্রেরও উন্নতি হইবে। এইরূপ বিচার করিলে মনুষ্যের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্বন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১ম। তোমার সমাজমধ্যে তোমার স্থল কোথায় এবং তুমি কোন্ শ্রেণী-ভুক্ত, অগ্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মাভিমানশূন্য হইয়া তাহার নির্দ্ধারণ কর।

২য়। তোমার শ্রেণীর ও তোমার পদের লোকের নিকট সমাজ কি কি বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা ধীরভাবে বুঝিয়া দেখ।

৩য়। পরে যথাসাধ্য সমাজের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে চেষ্টা কর।

যদি মনুষ্যমাত্রেই "আমার স্বত্ব" "আমার অধিকার" প্রভৃতি স্বার্থপর বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে মনুষ্যে মনুষ্যে কলহ না হইয়া উহাদের মধ্যে আন্তরিক হৃদ্যতা জন্মিবে। লোকে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমকে ঘৃণা না করিয়া পরিশ্রমকে মহত্বের প্রধান পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করিবে। যে ব্যক্তি সমাজ জন্য যত কার্য্য করিবে, যত পরিশ্রম করিবে, লোকে তাহাকে সেই পরিমাণে শ্রদ্ধা করিবে। যিনি ধনী, তিনি আলস্যপরায়ণতাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করিবেন। যিনি দরিদ্র তিনি পরিশ্রমের গৌরবে সম্মানিত হইয়া নিজের নিকট ও অন্যের নিকট শ্রদ্ধেয় হইবেন।

কি মনোহর দৃশ্য! এই দুঃখদিগ্ধ জগৎ সেই সুদিনে পবিত্র অমরাবতীর ন্যায় শোভান্বিত হইবে। মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছে, কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে না। জাতি জাতির প্রতি লোভ-কটাক্ষ করিতেছে না। চতুর্দ্দিকে শান্তি, পরিশ্রম, সুখ, সচ্ছন্দতা। হে মনুষ্য! জগতে যাহাতে এই শুভদিন আসিতে পারে সেই চেষ্টা কর। কবিবর টেনিসন ভবিষ্যতের জন্য যে সমস্ত আশা করিয়াছেন, আইস আমরাও প্রকৃতি দেবীর নিকট সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি।

"ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা, প্রাচীনে বিদায় দেও।
বাজে সুখ-হোরা, আনি আত্মঝারা, নূতনে ডাকিয়ে নেও॥
গত আয়ু-প্রায়, গত-বর্ষ যায়, যাক্—দেও গত হতে।
হৃদয়-মন্দিরে, অসতে নিবারি, শিখহ পূজিতে সতে॥
হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন, কলহ করহ দূর।
ধরণীর শেল, দৌরাত্ম্য আচার, ভাঙ্গিয়ে করহ চুর॥
ধরণীর বিষ, পরহিংসা দ্বেষ, পর দুঃখে কর খেদ।
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা ঘুচারে অবনী-ক্লেদ॥
সহস্র বৎসর, উৎকট বিগ্রহ, উত্তাপে ধরণী জরা।
সহস্র বৎসর, শান্তির সলিলে, শীতল হউক ধরা॥"

(বঙ্গদর্শন।)

মনুষ্য-সমাজের ন্যায় অন্য অন্য কি কি পদার্থকে শরীরী বলা যায়, তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মনুষ্যত্ব।

প্রথম কথা।

গুরু। কেমন, হিন্দুধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা শুনিতে প্রস্তুত আছ?

শিষ্য। না। ধর্ম্মের ব্যাখ্যাই এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। আপনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহাত প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের প্রতি খাটিতেছে না। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য পারকালিক মঙ্গল, কিন্তু পরকালের সঙ্গে ত আপনার এ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ দেখি না।

গুরু। বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। এ আপত্তি তোমার সহজে খণ্ডন করিতে পারিব। আর আর আপত্তি যাহা হইতে পারে, তাহাও খণ্ডন করিব। কিন্তু তাহার আগে এই ব্যাখ্যাটি ভাল করিয়া বোঝ। সে দিন যাহা বলিয়াছি, তাহা মোটকথা মাত্র। মোটকথা এই যে, ধর্ম্ম সুখের উপায়। সুখ, মানুষের বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি বা পরিণতি, ও পরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্তি কথাটা আপাতত ছাড়িয়া দিতে পারি। কেন না, সম্যক্ পরিতৃপ্তি সম্যক্ পরিণতির ফল। যাহার পিপাসা নাই, সে জল পানের সুখ জানে না। যে শিশুর দাঁত উঠে নাই, সে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য খাদ্যের আস্বাদনে অক্ষম। বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আগে—চরিতার্থতা পরে। এই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কি তাই আগে বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। মনুষ্যের বৃত্তিগুলি লইয়াই মনুষ্য মনুষ্য। অতএব যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলুন না কেন? ধর্ম্ম বলা অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না।

গুরু। সে অবস্থাকে আমি ধর্ম্ম বলিতেছি না। ধর্ম্ম যাহা বুঝাইয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। সুখের উপায় ধর্ম্ম। সুখের দুই ভাগ, প্রথম বৃত্তির পরিণতাবস্থা; দ্বিতীয় সে সকলের চরিতার্থতা। ঐ প্রথমটিকে তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলিতেছ। ভাল তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন যে উহা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম যাহার উপায়, তাহারই একটি উপাদান মাত্র। কিন্তু উহাই প্রধান উপাদান। কেন না বৃত্তি গুলি পরিণত হইলে চরিতার্থতা অনায়াস-লভ্য হয়। যেমন কতকগুলি বৃত্তির স্ফুরণে আমরা সুখ

ভোগে সক্ষম হই, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তির স্ফূরণে সেই সুখের অর্জ্জনে ক্ষমবান হই। যেব্যক্তি দয়াদি বৃত্তির পরিণতি জন্য দানকর্ম্মে সুখী হইতে সক্ষম হইয়াছে, সে অন্যান্য বৃত্তির পরিণতি জন্য দেয় বস্তর উপার্জ্জনেও সক্ষম হইয়াছে। মূর্খ দান করিয়াও সুখী হয় না, দিবার জন্য ধন উপার্জ্জন করিতেও পারে না। অতএব এই মনুষ্যত্বই সুখের প্রধান উপাদান। এই মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বট গাছ দেখিতেছ—দুইটিই কি এক জাতীয়?

শিষ্য। হাঁ এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ?

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এসব আছে, ঘাসের এসব নাই।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি স্ফূরিত এবং মার্জ্জিত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, হটেণ্টট বা চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না তাহা হইলেই বুঝিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে?

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা, ও পল্লব আছে কিন্তু কৈ? উহার ফুল ফল হয় না; উহার সার্ব্বাঙ্গীন পরিণতি নাই; উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে, এক একবার বাঁশের ফুল হয়। ফুল হইয়া, ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়।

হরি। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

আচার্য্য। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল, লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্ত্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন, যে বৃক্ষ, আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁটাল, নারিকেল, প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব।

আচার্য্য। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে? জান না, যে ধানও তৃণজাতীয়? ঐ যে ভাঁটুই দেখিতেছি, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস। ধানের পাট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণে, ধান্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্র তীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই। এইজন্য ইংরেজিতে উভয়েরই এক নাম, CULTURE! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে "The Substance of Religion is Culture. "মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"

দ্বিতীয় কথা।

শিষ্য। কাল যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয় ত একটি অতি ক্ষুদ্র প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষিরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষ শরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতি বিশেষে মাটি সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর; বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে, সর্ব্ব গুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব্বরূপ, সর্ব্বগুণযুক্ত,—কি সকল মনুষ্য হইতে পারে?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কিনা, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার,। তবে ইহা স্বীকার করিব, যে এপর্য্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে, যে লোকে সর্ব্ব গুণ অর্জ্জনের যত্নে বহুগুণ সম্পন্ন হইতে পারিবে; সর্ব্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখলাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ; এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যথা,—হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবন-সঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎ পিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এসকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্দ্ধিত, ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহারও দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ পোষণ ও অভ্যাস। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে, দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে, তাহা হইলে, ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয় ত অবশ, নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্তত হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। উর্দ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত?

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণত বয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল, ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি, তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ, যে এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি "ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে, না ভাবিয়া না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্যসমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অভ্যাস বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অভ্যাস-ফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই 'অভ্যাস' শব্দ লিখিতে গেলে,—প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ভ, ই, আ, স। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে, যে তাহাতে বুঝাইবে যে তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছে না। অথচ অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী।

অনুশীলন-জনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেমন পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাটা জমীতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্ত রূপে চালিত অর্থাৎ অনু-শীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই বাহু কিয়দংশে অপরিণত; সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারী-রিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না ভগ্নাংশ গুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পুরা টাকাটাতেই কম্‌তি হয়।

যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেক গুলি প্রত্যঙ্গ আছে সে গুলিকে বৃত্তি বলে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জ্জন ও বিচার। কেহ কেহ এই গুলিকে বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়াছেন। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। কেহ কেহ ইহাদিগকে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলেন। আর কতকগুলির কাজ জগতের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। পাশ্চাত্যেরা এগুলিকে প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় Æsthetic faculties গুলি Intellectual faculties মধ্যে গণ্য। এই ত্রিবিধ বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা, এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন

পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কিনা, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্য জাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়,সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণ বর্ণনা যেস্থলে সাধারণ, সেস্থলে, ইহাই অনুমেয় যে এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে, আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। এই জন্য ঈশ্বরোপসনার প্রয়োজন। ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে, ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেননা যিনি নির্গুণ তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের একমেবাদ্বিতীয় চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বর্ট স্পেনসর "Inscrutable Power in Nature" বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্ম পুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, কেন না তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া, চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদিগের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার গুণের মত গুণ, তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন,যে তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়,ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝাই, এসব বানরামির কারণ। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়া ছিলেন, এমন আর কোন জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনা পদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে। যখন তোমাকে হিন্দুর উপাসনা-তত্ত্ব বুঝাইব, তখন এসব কথা জানিতে পারিবে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, সম্প্রসারণেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত

তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউটেষ্টেমেণ্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট, খৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর, শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুক হস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর, হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র; যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্য ভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সেকি? কৃষ্ণ!

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন - তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পিছনে, ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে তাহার কিছুই জান না। * তাঁহার শারী-

* কৃষ্ণচরিত্রে যে সকল দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। সে বিষয়ে লোকের কিছু কিছু ভ্রম আছে। এমন কি স্বয়ং ভাগবত কর্ত্তাও ভ্রমশূন্য নহেন। সময়ান্তরে সকল কথার আলোচনা করা যাইবে।

রিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্যে এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং আন্ত-রিক বৃত্তি সকলের তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন*, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদ প্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে" —তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্ব-গুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র-প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে।

তুমিও বল, নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শিষ্য। নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গুরু। তোমার আজ নবজীবন হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* কৃষ্ণ ভগবদ্গীতার প্রণেতা নহেন, কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রণেতা বটেন। তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

সিংহল যাত্রা।

১২৯০ সাল। ২৯ শে মাঘ—সিংহলের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে বহু-যোজন-বিস্তৃত নারিকেল-বন। এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার পাণ্ডুবর্ণ নারিকেল আছে, তাহাকে রাজ-নারিকেল (King-cocoanut) বলে। তাহার জল মিস্রির পানার ন্যায় সুমিষ্ট। নারিকেল পাড়ার সময় এক গাছ হইতে অপর গাছে রশ্মি বাঁধিয়া দেয়; তাহা অবলম্বন করিয়া সমস্ত বাগান বিচরণ করা যায়; মাটিতে পা দিতে হয় না। নারিকেল তৈল ও নারিকেলের দড়ি ও কাছি প্রস্তুত করার জন্য এখানে অনেক কল আছে। এ দেশে তৃষিত হইয়া অনেকে জলপান না করিয়া নারিকেলোদক পান করে। দরিদ্র সিংহলীরা নারিকেল পাতায় ঘর ছাইয়া থাকে। উলু খড় নাই, এবং বিচালী অতি দুষ্প্রাপ্য। প্রায় সকলেই নারিকেল তৈলে পাক করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নারিকেলই আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়; এই বাক্যে কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই।

কাফির চাস প্রায় অভ্যাগত ইংরাজেরাই করিয়া থাকেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ বংশোদ্ভব ঔপনিবেশিকগণ বর্গার (Burghers) নামে খ্যাত; তাঁহাদের বহুপুরুষানুক্রমিক জন্মভূমি সিংহলদ্বীপ; তাঁহারা অনেকেই ওকালতি, চাকুরি, নারিকেল আবাদ ও সামান্য ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের এবং আদিম সিংহলীদের কাফির চাস অল্প; কারণ অধিক মূলধন না থাকিলে কাফির চাসে বড় সুবিধা নাই। আরব হাজিগণ আপনাদের দেশ হইতে কাফির বীজ আনিয়া কাফির চাসের সূত্রপাত করেন;* কিন্তু প্রথমত অনেকে কাফির ব্যবহার জানিত না; কেবল ঐ গাছের পত্র পুষ্প দ্বারা বুদ্ধ-মন্দির সুশোভিত করিত। ইংরেজেরা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কাফির আবাদ আরম্ভ করেন; ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আবাদের তাদৃশ বিস্তার হয়

---

* সিরেন্দিব (সিংহলদ্বীপ) মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মানবজাতির আদিপুরুষ আদম বেহেস্ত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহলের প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আদমগিরির অধিত্যকায় বসতি করিতেন। আমরা যাহাকে রামের সেতু বলি, মুসলমান ও ইয়ুরোপীয়গণ তাহাকে আদমের সেতু বলেন। আরবদের মধ্যে এই শ্রুতি আছে যে ঐ সেতুদ্বারা আদম সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।

নাই। এই আবাদের প্রধান ফলভোগী ইংলণ্ডের মূলধনীগণ। তাঁহাদের পদধূলি সিংহলের কোথাও পড়ে নাই; কিন্তু তাঁহারা ৫৫ বৎসরে নয় কোটী টাকা নগদ, খরচ খরচা বাদ, লাভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ৩ কোটী টাকার বাগান বিক্রয় করিয়াছেন। ইউরোপীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা ও তামিল কুলিরা কতক টাকা বেতন ও ভৃতি স্বরূপ পাইয়াছে বটে এবং সিংহলের গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি শুল্ক বলিয়া কিঞ্চিৎ রাজস্বও পাইয়াছেন; কিন্তু অবশিষ্ট অর্থের শ্রাদ্ধ ইংলণ্ডেই হইয়া থাকে। মিষ্টর জন্ ফর্গুসন্ লিখিয়াছেন "যদি এই টাকা সিংহলে থাকিত, সিংহলের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত! কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের কত বিস্তার হইত! কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল তেলা মাথায় তেল পড়িল, ঐশ্বর্য্যশালী ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল।" * কি সিংহলে, কি ভারতবর্ষে, সর্ব্বত্র একপ্রকার রোদন। দেশের টাকা দেশে না থাকিয়া পরদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিল।

কাফির আবাদে যত কুলি নিযুক্ত আছে, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ বাসী। সিংহলীরা কাফির আবাদে সূত্রধর ও স্থপতির কার্য্য করে, এবং গো শকট চালায়; কিন্তু কদাচ কুলির কার্য্য করে না। হত-ভাগ্য ভারতবর্ষ! সিংহল, মরিস্‌স্, ট্রিনিডড্, জ্যামেকা, গাইএনা, যেখানে কুলির প্রয়োজন, সেখানেই তোমার দরিদ্র সন্তানগণ দৌড়ায়। যে কার্য্য কাফ্রিরাও করিতে চাহে না, সে কার্য্য ভারতবর্ষীয়েরা করিতে প্রস্তুত।

১লা ফাল্গুন—সিংহলের মুক্তা ভুবন বিখ্যাত। অন্যান্য রত্নের মধ্যে পদ্মরাগ মণি, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও প্রবাল প্রসিদ্ধ; মরকত বড় ভাল

---

* Ceylon in fact is a sort of incubator to which capitalists send their eggs to be hatched, and whence they receive from time to time an abundant brood leaving us but the shells for our local portion. Money has been sent here to fell our forests and plant them with coffee and it has been returned in the shape of copious harvests to the home capitalist, leaving us in many cases the bare hill-sides from whence the harvests were drawn. Had the profits from our abundant coffee-crops in the past been located here and invested in the country and its soil, what a fund of local wealth would not exist, what manufactures might now have been flourishing! ... ... Most likely the lands now waste would have been flourishing farms. Where is now the fruit of these wasted lands? Are they not, we may ask, absorbed in the splendid mansions and still more magnificent institutions of the mother country swelling the plethora of its wealth and luxury?

Ceylon in 1883 *by John Ferguson.* PP. 77—79.

পাওয়া যায় না। আগে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সিংহলের উত্তর পশ্চিমে আরিপো নামক জনপদের নিকট সমুদ্রে মুক্তাফলদ কস্তুরী তোলা হইত। গবর্ণমেণ্টের ১২। ১৪ লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। অনেক ছোট কস্তুরী নষ্ট হওয়ায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক বৎসর কস্তুরী ধরা বন্ধ ছিল। এক্ষণে ৪ বৎসর অন্তর মুক্তান্বেষণ হইয়া থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মুক্তান্বেষণ হইবার কথা আছে; কেহ বলেন এই বৎসরেই হইবে। সাত বৎসরের কস্তুরীতে ভাল মুক্তা পাওয়া যায়; অষ্টম বৎসরে কস্তুীর প্রায় মরিয়া যায়, মুক্তাও নষ্ট হয়।

সমুদ্রে যে পুঁটী, ট্যাঙ্গরা, ও মৌরলা মাছ পাওয়া যায়, আমি আগে তাহা জানিতাম না। কলম্বোর তরঙ্গরোধ মধ্যে এই তিন জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায়; তন্মধ্যে মৌরলাগুলি পুষ্করিণীর মৌরলা অপেক্ষা অনেক বড়, আর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক একটা কর্কট কচ্ছপের সমান। আমি সিংহলে যত প্রকার সাগর-জাত মৎস্য খাইয়াছি, তন্মধ্যে আরেকোলা মৎস্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু। ইলিসগুলি গঙ্গার গোদা ইলিসের ন্যায়; তবে ঋতু ভেদে স্বাদের ভেদ হইতে পারে। সিংহলের পার্শ্বস্থ সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ হিংস্র জলচর আছে। কলম্বোর চিত্রশালিকায় একটি ১৪ হাত দীর্ঘ তরবারি মীন আছে, এবং মরাতুয়া নামক জনপদের নিকট ধৃত একটি ২৩ ফুট হাঙ্গর আছে। ইহার উদর একটা বৃহৎ মহিষের উদর অপেক্ষা স্থূল। সিংহলীরা তরবারি মৎস্যও (Sword-fish) খায়। সিংহলের বনে যত প্রকার কাষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে আবলুষ ও সাটীন কাষ্ঠই প্রসিদ্ধ। সিংহলে আবলুষ কাঠের উপর কচ্ছপের খোলার কাজ করা অতি সুন্দর বাক্স নির্ম্মিত হয়।

২রা ফাল্গুন—অধিবাসী সিংহলীদের বর্ণ বাঙ্গালীদের বর্ণের ন্যায়; তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা বলবান তাহাও বোধ হয় না। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই দীর্ঘকেশী। পুরুষে চিরুণী মাথায় দেয়; স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ প্রায়ই এক প্রকার। পুরুষে কাছা দেয় না; গোঁপ দাড়ী না থাকিলে স্ত্রী হইতে পুরুষ চেনা কঠিন। স্ত্রীলোকে পীরাণ গায়ে দেয়, মাথায় কাপড় দেয় না; কিন্তু চিরুণী না পরিয়া মাথায় কাঁটা পরে। সিংহলীরা বৌদ্ধ। তাহারা যে ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আসিয়া সিংহলে বসতি করিতেছে, তাহা তাহাদের ভাষাতে প্রকাশ।

সিংহলী শব্দ			বাঙ্গালা অর্থ ;—
মম	...	...	আমি
উম্ব, তমুসে, তমুন্নান্‌সে		...	তুই, তুমি, আপনি,
ও, উন্নেহে	...	...	ও, উনি, তিনি,
অশ্বয়	...	...	অশ্ব,
আত	...	...	হাত,
গেদার, গে,	...	...	গৃহ, গেহ,
গম	...	...	গ্রাম,
নুবর	...	...	নগর,
পিয়া	...	...	পিতা,
অম্মা, মা	...	...	অম্বা, মা,
হিমুল গাহা	...	...	শীমুল গাছ
তাম্বুলি গাহা	...	...	তাম্বুল গাছ,
মহত্ময়া	...	...	মহাত্মা, মহাশয়,
পোতা	...	...	পুতি, পুস্তক,
পয়	...	...	পা,
হাল	...	...	চাউল,
বেলাল্লী	...	...	বিড়ালী,
নম	...	...	নাম,
দোর	...	...	দোর, দ্বার,
বাত	...	...	ভাত,
কিরি	...	...	ক্ষীর, দুগ্ধ,
অদ	...	...	অদ্য,
কম	...	...	কাম, কর্ম্ম,
স্ত্রী	...	...	স্ত্রী।

বস্তুত যাহারা আদিম সিংহলী বলিয়া খ্যাত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তাহাদের মধ্যে কতক সিংহল-জেতা বিজয়বাহুর সহচর বর্গের বংশোদ্ভব ; কতক মগধ, কোশল, কুশী-নগর, জেতবন, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের নির্বাসিত বৌদ্ধদিগের সন্তান।

সিংহলবাসী তামিলরা শৈব। তাহারা আদিম সিংহলীদের অপেক্ষা কৃষ্ণ-বর্ণ ও বলবান্। প্রায় ২১০০ বৎসর হইল ইল্বল নামে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের এক রাজা সিংহলের উত্তর অংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেক তামিল গিয়া উত্তর সিংহলে বসতি করিয়াছিল। এক্ষণে উত্তর সিংহলের অধিকাংশে তামিলদের বাস। প্রায় ১০০০বৎসর কাল ভারতবাসী তামিলেরা উত্তর সিংহলে বারম্বার উপদ্রব করিয়াছিল। উত্তর সিংহলের তামিল নাম য়ল্‌পনম্‌পট্টনম্, ইংরেজী নাম জাফ্‌না। উত্তর সিংহলে ধান ও তামাকুর চাস ও শিবের মন্দির দেখিয়া তাহা ভারতবর্ষের অংশ বলিয়াই বোধ হয়। কলম্বো নগরে সী-ষ্ট্রিট নামক রাস্তা আছে, তাহার ধারে অনেক তামিল শেঠীর বসতি। সেখানে দুইটি শিবের মন্দির আছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শেঠীরা প্রাতঃকালে শিব মন্দির হইতে বিভূতি মাখিয়া আসিয়া মুখে হর হর বলিতেছেন, এবং গ্রাম্য কুক্কুটের দর করিতেছেন। * সী-ষ্ট্রীটে শশীবাবুর চাউলের কুঠি। সেখানে অনেক শেঠী আসিয়া থাকেন। শশী বাবু ও রঘুপতি বাবু মৎস্য খান, অথচ মুর্গী খান না, ইহা শুনিয়া অনেক শেঠী বিস্ময়াপন্ন হন। তাঁহারা বলেন "আমাদের ব্রাহ্মণেরা মৎস্য কি কোন প্রকার মাংস খান না; তাঁহারা যে মুর্গী খান না, আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু আপনারা মৎস্য খান, মুর্গী খান না কেন?" আমি মান্দ্রাজে এক জন ব্রাহ্মণের বাটীতে খাইয়াছিলাম। তিনি খিচুড়ী পাক করিয়া পিণ্ড পাকাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিক্রয় করার সময় যদি কোন শূদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে তিনি রাগ করেন এমন বোধ হয় না; কিন্তু মৎস্য মাংসের নাম করিলে তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। যাহা হউক মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং সিংহলে ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ সম্মান। ব্রাহ্মণেরা কটকি পেড়ে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া খড়ম পায় দিয়া উড়িয়া ব্রাহ্মণদের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া সী-ষ্ট্রীট দিয়া চলিতেছেন, সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছে; কেহ কেহ 'স্বামীজি, স্বামীজি' বলিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতেছে। এবার শিবরাত্রি কবে হইবে তাহা

---

* রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক নবতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে ভরদ্বাজঋষি ভরতের সৈনিকদিগকে ছাগ, মৃগ, বরাহ, ও কুক্কুট মাংস দিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। বন্য কুক্কুটের মাংস নিষিদ্ধ নহে। গ্রাম্য কুক্কুট, ছত্রক, গৃঞ্জন, ও পলাণ্ডু ভোজনে একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত।

জানিবার জন্য কয়জন ব্রাহ্মণ রঘুপতি বাবুর নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার পঞ্জিকার উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহারা নাগপট্টনম্ (Negapatam) ও মদুরায় টেলিগ্রাফ করিলেন। তাহাতে স্থির হইল যে বাঙ্গালা পঞ্জিকাকারেরা যে দিন ধার্য্য করিয়াছেন, তাহার পর দিনে শিবরাত্রি হইবে।

যে সকল তামিল সিংহলে হাজার বৎসরের অধিক কাল বসতি করিয়াছেন, তাঁহারাও সিংহলী বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা শৈব বলিয়া মনে করেন যে ভারতবর্ষই তাঁহাদের প্রকৃত দেশ। বাঙ্গালীর পক্ষে এ কথা বড় বিস্ময়জনক হইবে না; কারণ বাঙ্গালার মুসলমানদের অধিকাংশই বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন। মৈথিলী ও কনোজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও রজপুত, যাঁহারা দশ পুরুষ বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিলে তাঁহারা খড়্গ হস্ত হন। ভারতবাসীদের প্রকৃত স্বদেশানুরাগ জন্মিবার অনেক বিঘ্ন আছে। সিংহলে তদ্রূপ বিঘ্ন কতকটা আছে। আদিম সিংহলীদের ভাষার কতক শব্দ বুঝিতে পারা যায়। তামিলদের ভাষার এক বর্ণও বুঝা যায় না। আমি কলম্বোর বাজারে পাকা আম কিনিতে গিয়া দুইটি তামিল কথা শিখিয়াছি। 'মাং কাই,'—কাঁচা আম; 'মাং পাড়ম্,'—পাকা আম। ইংরেজী 'Mango' শব্দ, তামিল 'ম্যাঙ্গ' শব্দের বিকৃতি মাত্র।

৩রা ফাল্গুন—বিধাতা যে কি অপূর্ব্ব রঙ্গে সিংহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? সিংহলে দুর্ভিক্ষ নাই। দারুণ দারিদ্র্যও নাই। যে তামিলরা এদেশে কুলীর কার্য্য করে, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে অভ্যাগত তামিল। অধিবাসী তামিলরা আদিম সিংহলীদের ন্যায় সম্পন্ন। সর এডোয়ার্ড ক্রিসী লিখিয়াছেন, "লণ্ডন নগরে শীতঋতুতে আমি এক দিনে যত মানবের দুঃখ দেখিয়াছি, সিংহলে নয় বৎসরে তেমন দেখি নাই" *। তবে শীতপ্রধান দেশের দারিদ্র্য ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দারিদ্রে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত দেশে যৎসামান্য বস্ত্রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, মৃদঙ্গারের প্রয়োজন নাই; দরিদ্রের কুটীর না থাকিলে সে বৃক্ষতলে বর্ষা ব্যতীত সকল ঋতুতে থাকিতে পারে। আমি কলম্বো নগরে যত ভিক্ষুক দেখিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশই ভারতের দাক্ষিণাত্য বাসী তামিল। যে ৫১৭ জন অধিবাসী ভিক্ষুক আছে, তাহারা মদ্যপায়ী হইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

---

* "I have seen more human misery in a single winter's day in London, than I have seen during my nine year's stay in Ceylon."
Sir Edward Creasy, History of England.

সিংহল বঙ্গাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী; কিন্তু বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় যেমন বাণিজ্য, সিংহলের রাজধানী কলম্বো নগরে তেমন বাণিজ্য নাই; তবে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, সিংহপুর, চীন, যাবা, যাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ও নিউজিলণ্ড গমনার্থী সমস্ত পোত কলম্বো নগরে লাগায়; ইহাতে কলম্বোকে মান্দ্রাজ অপেক্ষা বড় বন্দর বলিয়া বোধ হয়। কলম্বোর কোন অংশ, আমাদের সৌধমালামণ্ডিত চৌরঙ্গীর ন্যায় নহে; গবর্ণর সাহেবের বাটী আমাদের সেক্রেটেরী সাহেবের বাটী অপেক্ষা ভাল নহে। বলিতে কি কলম্বো নগরে চিত্রশালিকা বাটী ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর হর্ম্ম্য নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কলম্বোর দক্ষিণ পূর্ব্ব মহল্লার বৃক্ষবাটিকাগুলি * অতি সুন্দর; বহুবিধ বৃক্ষলতায় ভূষিত; যেন এক একটি ক্ষুদ্রায়তন বেল ঘরিয়ার উদ্যান-বাটী। ক্রমশ।

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

পূর্ব্বসংখ্যার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, "অন্যের কথা দূরে থাকুক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি না।" স্বয়ং বৌদ্ধদেব বা চৈতন্য প্রভু ধর্ম্মের ধারণা করিতে যখন অসমর্থ, তখন আমরা ধর্ম্মের ভাব কতদূর বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমরাও সূচনায় সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। "ধর্ম্মের বিশ্বোদর ভাব যে আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া আমরা আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।" বুঝিবার বুঝাইবার আশা আছে বলিয়াই, আজি বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমেই বলিয়া দেওয়া ভাল, পাঠক যেন একটা দিগ্‌গজ গবেষণার, উদ্ভট উদ্ভাবনার প্রত্যাশা করিয়া আপনা আপনি প্রতারিত না হন।

---

* কোষকারেরা বলেন "গণিকা" "অমাত্য" প্রভৃতি বৃক্ষবাটিকার অঙ্গ। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিনিয়সের জীবনবৃত্তে 'বৃক্ষবাটিকা' শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্ম বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। বিশেষ এই চসমা-চক্ষু,চপল চিত্ত, চটুলবৃত্ত যুবক দলের রাজত্ব কালে। এই কোপ্তা, কোর্ম্মা, করি, কটলেট প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্ম্মে মাংসাহার নিষেধ করে, বিলাতী ব্যাণ্ডের বেণু বীণা বাদনের বদলে, যে ধর্ম্মের উপাসকেরা খোল করতালে বিষম খচমচ করিয়া তুলে, কণ্ঠে ত্রিভাজ কলরের স্থানে যে ধর্ম্মযাজকেরা তুলসীর ত্রিকণ্ঠী ধারণ করে,—সে ধর্ম্ম যে এখনকার দিনে বিষম বিড়ম্বনা, তাহাও কি আর বুঝাইতে হইবে? যাত্রাতে যাহার আশ্রয়, ভিক্ষাতে যাহার প্রশ্রয়,—মধুর রসেই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্গ, "কুরুচি" যাহার চিরসঙ্গ—গুপ্তপ্রণয়িণী গোপিনী যে ধর্ম্মের আলম্বন এবং শঠ লম্পট কপট শ্রীকৃষ্ণ যাহার অবলম্বন,—সে ধর্ম্ম যে বঙ্গের বিড়ম্বনা, তাহাও কি আবার বলিতে হয়? না,—সাহেবে যাহা সাহেবিআনায় বুঝাইয়াছেন, তাহা আর বাঙ্গালিকে বুঝাইতে নাই; তবে এই অধম জাতির ঐ অপকৃষ্ট ধর্ম্ম, যদি এই অধমদিগের বুদ্ধিবলেই কিছু বুঝা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?

ধর্ম্মের নানা ভাব, ধর্ম্মের নানা মূর্ত্তি। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সমগ্র ধর্ম্মের বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণা করিতে পারেন না। এই জন্য ধর্ম্ম বিষয়ে, নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভয়; ঈশ্বর ভয়, পরকাল ভয়, বা কর্ম্মফল ভয়, যাহার হৃদয়ে জীবন্ত নহে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভক্তি। ভগবান ভক্তের; ভক্তিতেই ভগবান মিলেন। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—কর্ম্ম। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফল পায়—কঠোর কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম যাজন। কেহ কেহ এই মতের বিপরীত বাদী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মে বিরতিই—প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চা। তবেই ধর্ম্মের প্রধান সাধন কিরূপ, এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যই বা কি,—ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

ধর্ম্মের উপজীব্য—ভগবানের সেই জন্য নানা মূর্ত্তি হইয়াছে। উপনিষৎ একবার বলিতেছে—তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' আর একবার বলিতেছে, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।' তন্ত্র এক মুখে একই নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, 'করালবদনাং' অথচ 'স্মিতাননাং।' কোথাও শুনিবে,—তাঁহার দ্বিভুজ-মুরলীধর সুবঙ্কিম নটবর বেশ,—কোথাও শুনিবে তিনি শর-কার্ম্মুক-ধারী বীরশ্রেষ্ঠ বীরাসনে উপবিষ্ট। বাইবলে বলে, তিনি কঠোর ন্যায়পর, অথচ

দয়ার অগাধ সাগর। যীশুখ্রীষ্ট বলেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর; তন্ত্র বলেন, তিনি করুণাময়ী জগদম্বা। যাঁহারা বালক গোপালের সেবক, তাঁহারা ভগবানকে অপত্যভাবে ধুয়াইয়া পুঁছাইয়া দুগ্ধদানে সেবা করিতেছে, আবার বামাচারী শক্তিভক্ত, নরকপালে মহামাংস মদ্য দিয়া ভগবতীর মহাভোগের আয়োজন করিতেছে। সম্প্রদায় বিশেষের পূজার পদ্ধতির কথা শুনিলে সন্ত্রাসে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃৎপদ্ম কাঁপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয়;—আবার আর এক সম্প্রদায়ের পূজা পীঠের নিকটে গেলে, স্বচ্ছন্দ আয়োজন দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ জুড়ায়, এবং সুগন্ধে অন্ধীভূত হইতে হয়।

সনাতন ধর্ম্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি—ধ্যান, ধারণা—আলম্বন, বিভাবন—পৃথক হইলেও সকল শ্রেণীর ঐশ্বরিক সাধনাই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে—ধর্ম্মের তারতম্য হয় মাত্র। কোন ধর্ম্মের হিংসা করিতে নাই, কোন ধর্ম্মযাজককে ঘৃণা করিতে নাই। যে, যে পথে পার, ধর্ম্মের উজ্জ্বল, বিমল, বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এইসকল সনাতন ধর্ম্মের সার কথা।

নগণ্য বাঙ্গালির সামান্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে, যাঁহারা ঘৃণা করিতে এখনও অভ্যস্ত হন নাই, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে জঘন্য ভিক্ষুকবৃত্তি (nasty Beggarism) বা পাশব বিলাসের প্রস্থান (system of carnality) বলিয়া নাসিকার আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে যাঁহারা এখনও শিক্ষিত হন নাই, তাঁহাদেরই সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাব ভঙ্গি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেম-ভক্তি। বৈষ্ণবের মতে ভগবানে প্রেমভক্তিই সদ্গতির প্রধান উপায়। কেহ বলেন, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মহিমার বিষয় নিরন্তর স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া, সাধকে ক্রমেই আপনার ক্ষুদ্রত্ব, অণুত্ব উপলব্ধি করিবেন; এই উপলব্ধি হইলেই তাঁহার প্রকৃত বিনয় হইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুঝিতে পারিবেন। সেই বিনয়ই ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব। কেহ বলেন, ঈশ্বরের দণ্ডপ্রণেতৃত্ব ভাব হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিলেই, প্রকৃত ধর্ম্মভাবের উপলব্ধি হয়; ঈশ্বরের ভীতিই ধর্ম্মের মূল। অপরেরা বলেন, যে ভয় ত বালকের পক্ষেই কর্ম্মের নিবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তক; পরম জ্ঞানী সাধক—তিনি ভীতি-তাড়িত থাকিবেন কেন? ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হইবে। আর এক পক্ষ বলেন, যে পিতাকে যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাহারও অন্তরে অন্তরে ভয় আছে; ঈশ্বরে

ভয়ের লেশ মাত্র থাকা উচিত নহে। ঈশ্বরকে মাতৃ জ্ঞানে ভক্তি করিতে হইবে। "কু পুত্র যদ্যপি হয়, কু মাতা কখনও নয়।" আমরা অকৃতি, অকৃতজ্ঞ সন্তান, তিনি করুণাময়ী। তাঁহার স্নেহময় উৎসঙ্গে লইয়া তিনি সকলকেই তাঁহার অজস্র ক্ষীর ধারায় পালন করিতেছেন। বৈষ্ণব বলেন, যে যেমন বুঝেন, তাঁহার সেই ভাবেই সাধনা করা উচিত; কিন্তু আমি বুঝি, ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নায়ক। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী; তাঁহার কাছে সাধকের কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নাই। বিশ্রব্ধা নায়িকার প্রেমভক্তিই আমার অবলম্বনীয় সাধন। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই সদ্গতির প্রধান সাধন। এটি বড় বিষম কথা। নায়ক-নায়িকা—এই দুইটি কথা মনে আসিলেই রঙ্গরসের কথা মনে আসে, কিশোর বয়সের লীলা খেলার কথা মনে পড়ে, সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, সেই আবেশের বিহ্বলতা, সেই বিলাসের মত্ততা, সেই আত্মতৃপ্তির স্বার্থপরতা —সকলই মনে পড়ে। যে প্রেম-ভক্তির এই সকল উপাদান, সেই প্রেম-ভক্তিই কি অনন্তজ্ঞান, অপরিমেয়-শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান সাধন?—ক্রমে বড় বিষম কথা হইল! বাস্তবিক কিন্তু কথাটা তত কঠিন নয়; অথচ এখনকার দিনে উহা বিষম হইতে বিষম হইয়াছে—তাহার আর ভুল নাই। নহিলে এই সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে লোকের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইবে কেন?

স্বত পরত এখন আমরা দুই প্রকার নায়িকা সচরাচর দেখিয়া থাকি। এক ঘরাও নায়িকা, আর এক কেতাবী নায়িকা। শিক্ষার জোরেই হউক, আর অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমরা আজিকালি ঘরের নায়িকাকে হয় দাসীর দাসী, না হয়, পুতুলের পুতুল বানাইয়াছি। কাজেই অনেক সময় তাঁহারাও হয় আমাদিগকে মনিবের মনিব বলিয়া মনে করেন, না হয় পুতুলের সাজওয়ালা ভাবিয়া চির দিন অলঙ্কারের দাবি দাওয়া করেন। বৈদেশিক কাব্য নাটকে কেবল সাম্যের কঠোর প্রকৃতির ছায়া সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল, আশ্রয় আশ্রয়ী ভাবের কোমল মূর্ত্তি প্রায় কোথাও স্ফূর্ত্তি পায় না,—কাজেই প্রেমময়ী নায়িকার যে প্রখরা অথচ কোমলা, উজ্জ্বলা অথচ স্নিগ্ধকারিণী প্রেম ভক্তি, বৈষ্ণব মতে ঈশ্বরোপাসনার প্রধান সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ অস্পষ্ট ছবিও দেখি না, অপকৃষ্ট আদর্শও পাই না—সুতরাং ও সকল কিছু বুঝিতেও পারি না—আমি যাহা বুঝি না—তাহাই ত humbug, তাহাই ত বিড়ম্বনা। অতএব বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্ম্ম—এক বৃহৎ বিড়ম্বনা, a huge humbug.

বৈষ্ণব বলেন—কৈশোরের রঙ্গরস, বয়সের লীলা খেলা,—শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, আবেশের বিহ্বলতা, বিলাসের ভোগ সুখ, আনন্দের উচ্ছ্বাস, উৎসাহের উল্লাস, তৃপ্তির স্বার্থপরতা,—ভাই! এ সকল তোমার পক্ষে হেয়, বা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া তুমি মনে করিও না। সাধক যদি সৎসাধনায় ঐ সকল প্রয়োগ করিতে পারেন,—তবে তাহাতেই তাঁহার সদ্গতি।

এই শোভাময়ী প্রকৃতির অঙ্কে লালিত হইয়া, এই সৌন্দর্য্যময় জগতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া—তোমাকে যে কেবল কঠোরতার অভ্যাসে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে—এ কথা ভাই! তোমাকে কে বলিল? যৌবনে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মের জন্য অকালে বৃদ্ধত্ব অবলম্বন করিতে হইবে—এ কথা তুমি কোথায় শুনিয়াছ? চিত্তবৃত্তি সকল যখন স্ফূর্ত্তি লাভ করে, ইন্দ্রিয়াদি যখন পূর্ণ পরিস্ফুট হয়, শরীরে সামর্থ, মনে একাগ্রতা, হৃদয়ে আগ্রহ যখন প্রবল থাকে, সেই যৌবন কাল, যদি কেহ বলিয়া থাকেন,—কেবল অনর্থের সময়—তবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট যৌবনকালের কথা বলিয়াছেন, আর যৌবনের উচ্ছ্বাসে অধর্ম্ম হয়,এ শিক্ষা যদি কেহ তোমায় দিয়া থাকেন,—নিশ্চয়ই তিনি কক্ষভ্রষ্ট কুগ্রহের কথা বলিয়াছেন। প্রতি মনুষ্যের পূর্ণ বিকাশ কখনই অনর্থপাতের হেতুভূত হইতে পারে না—স্বভাবে বিড়ম্বনা আছে বটে, কিন্তু এরূপ বিশ্বব্যাপী বিড়ম্বনা কোথাও নাই; যৌবন সুলভ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও স্ফূর্ত্তি মানবের বিড়ম্বনা নহে। ঈশ্বর প্রেমে সেইরূপ শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত কর, সেই প্রেমময়ের ভাবে সেইরূপ বিভোর হও, অনন্ত আনন্দের বিলাসে সেইরূপ বিহ্বল হও, যৌবনের সেই উচ্ছ্বাস, সেই উল্লাস, তৃপ্তির সেই স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে নায়িকার মত ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরোপাসনার উৎকৃষ্ট সাধন, সোৎসাহ মাধুর্য্য রসই সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং বৈষ্ণবের ধর্ম্ম—সাধকের চরিত্র দোষে এখন যতই বিড়ম্বিত হউক না কেন,—প্রেম-ভক্তির ধর্ম্ম উপেক্ষা বা ঘৃণার বিষয় নহে, বুঝিবার ও শিখিবার সামগ্রী; নায়িকার প্রখরা অথচ কোমলা, উজ্জ্বলা অথচ স্নিগ্ধকারিণী প্রেমভক্তির অস্পষ্ট ছবিও আজিকালি আমরা দেখি না বটে, অসম্পূর্ণ আদর্শও পাই না বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের পদাবলীতে, বৈষ্ণবের গ্রন্থাবলীতে সেই আদর্শের পৌনঃপুনিক উল্লেখ আছে। সনক, সনাতন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ,—নন্দ, যশোদা,—শ্রীদাম, সুবল,—সকলেই সাধকের আদর্শ—কিন্তু প্রেম-ভক্তির পূর্ণ আদর্শ—শ্রীমতী প্রেমময়ী রাধিকা।

বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ক্রমেই বিষম হইতে বিষমতর হইতেছে; বৃন্দাবনবিলাসিনী, কুলকলঙ্কিনী, বৃষভানু-নন্দিনী সাধকশ্রেষ্ঠ—বড়ই বিষম কথা হইল!

আবার একটু পিছু হটিয়া যাইতে হইতেছে; বেশ করিয়া বুঝা চাই, যে নায়িকার প্রেম-ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলি কেন? ভাল ঈশ্বর-ভয় যেন বালকের ভাব হইল; ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধা, যেন একটু ভয়-জড়িত ভাব বলিলাম, সাধকের দাস্যভাবও যেন সেইরূপ ধরিলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে মাতার মত ভক্তি করিতে পারিলে ক্ষতি কি? তাহা শিক্ষা না করিয়া, নায়কে নায়িকার প্রেম-ভক্তিই আমাদের অনুকরণীয় হইল কিরূপে? বৈষ্ণব বলেন, মাতৃভক্তিতে যে, ঈশ্বর-সাধনা হয় না, তাহা বলি না, কিন্তু আমরা যেরূপ বুঝিয়া এই পন্থা অবলম্বন করি, তাহা বলিতেছি।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তিনেতেই একটি পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব আছে। অথচ বিনিময়ের ভাব নাই। বিনিময় যাহার লক্ষ্য—তাহার নাম ব্যবসাদারি। শ্রদ্ধা ভক্তিতে স্নেহ মিলে, প্রেমে প্রেম পাওয়া যায়, ইহারই নাম পাল্‌টি-প্রকৃতি-ভাব। পাল্‌টী প্রকৃতিভাব থাকিলেই, সাম্যভাব আসিয়া পড়ে; সাম্যের স্ফূর্ত্তিতে ঐ ভাবের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয়; এই সাম্যভাব পিতাপুত্রে যত টুকু আছে; মাতাপুত্রে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে; নায়ক-নায়িকা মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে। পিতার কাছে সঙ্কোচ আছে, মাতার কাছেও কতকটা আছে, নায়ক-নায়িকা মধ্যে সৎকার্য্যের কোন কথারই আর সঙ্কোচ নাই। ইহাই প্রকৃত বৈকুণ্ঠভাব। সুতরাং নায়ক নায়িকার উপজীব্য অসঙ্কোচ প্রেম-ভাবই বৈষ্ণবের অবলম্বনীয়।

এখন বুঝিতে হইবে, যে নায়ক-ভাব ও নায়িকা-ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটি সাধক আপনাতে আনয়ন করিয়া ভগবানের সাধনা করিবেন? বাঙ্গালির নায়ক-নায়িকা-ভাব বুঝিলে ঐ প্রশ্নের একই উত্তর সম্ভব। নায়িকার মত প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরে প্রযুজ্য। আমাদের দেশে নায়ক-নায়িকা মধ্যে ঠিক সাম্যের পাল্‌টি-প্রকৃতি ভাব নাই। অগাধ প্রেমের সহিত সম্পূর্ণ অসঙ্কোচ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, একটি অপূর্ব্ব আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব আছে। যতই উদারতায় স্ত্রীপুরুষের সাম্যভাব প্রচার কর, যতই উচ্চ কণ্ঠে স্ত্রীস্বাধীনতার 'সংবাদ' বিঘোষিত কর, যতই অবারিত-বন্ধ মুক্ত-দ্বারে নারীকে রক্ষা কর, এবং অসঙ্কোচে তাঁহাকে বিচরণ করিতে দাও—তবু বাঙ্গালির কুলরমণী

সেই তমালে তরুলতা, সহকারে মাধবী। এবং পুরুষ—প্রণয়িনীর আশ্রয় ও অবলম্বন। বৈদেশিক নাটক নবেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যভাব, আমাদের দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক নায়িকায় নাই।

প্রেমে ভক্তি,—সাম্যে বৈষম্য, প্রতিগ্রহে বিনিময়,—দাসীত্বে বন্ধুতা—এইরূপ দুই দুই বিপরীত ভাব—কেবল হিন্দু নায়িকাতেই আছে। হিন্দু নায়িকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির সেবিকা; সাম্যে সহধর্ম্মিণী, বৈষম্যে দাসী; রসে ইয়ার অথচ শিক্ষায় ছাত্রী। প্রেম-ভক্তির এই-রূপ রাসায়নিক সংযোগ বৈষ্ণবী সাধনার প্রধান উপকরণ। যে সাধক, সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ ভাবিবে। বৈষ্ণবও তাহাই ভাবেন, তবে তাঁহার অবলম্বনের সমীপে, তাঁহার আশ্রয়ের নিকটে, তাঁহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের মানুষ, অকপটে সচ্ছন্দে মনের কথা তাঁহাকে বলেন; ভক্তির চক্ষুতে দেখেন—তিনি বিশ্ব-বিধাতা বিশ্ব-নিয়ন্তা, সাধক-শরণ এবং অনাথের অবলম্বন। প্রেম-ভক্তির এরূপ রাসায়নিক সংযোগ আর কোন ধর্ম্মে নাই। এই প্রেম-ভক্তি হয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। উভয়ত্রই সেইরূপ প্রেমভক্তি—কর্ত্তব্যতার অনুসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাস্ত্রে শিক্ষা দিলেন, সমাজ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইল, পিতা মাতা শৈশব হইতে বলিয়া দিলেন, সখী কাণে কাণে জপমন্ত্র দিল, যে স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতে হয়, দেবতার মত ভক্তি করিতে হয়। সাধ্বী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল, আজীবন সেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য ভুলিল না; কর্ত্তব্য-পন্থা হইতে কেশমাত্র বিচলিত হইল না; প্রেম-ভক্তি-ভরে চিরদিন স্বামি-সেবা ব্রত পালন করিতে লাগিল। অথবা শাস্ত্র শুনে নাই, সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখে নাই, পিতা মাতা তাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু জ্ঞান হইলে বুদ্ধিমতী সতী দেখিল, যে স্বামী হইতেই ভরণপোষণ, স্বামী হইতেই মান সম্ভ্রম, স্বামী হইতেই সুখ সম্ভোগ; সুতরাং কৃতজ্ঞতা ভরে স্থির করিল, যে স্বামি-সেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি; স্বামীই নারীর পরম দেবতা।—এই সিদ্ধান্ত মত তিনি চিরদিনই প্রেমভক্তি সহকারে স্বামি-সেবা করিতে লাগিলেন,—তাঁহার কর্ত্তব্য-পন্থা হইতে কেশ মাত্র বিচলিত হইলেন না। অতএব প্রেম-ভক্তি কখন উপদেশে হয়, কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। সকল রূপ প্রেমভক্তিই স্বর্গীয় সামগ্রী।

কিন্তু বৈকুণ্ঠের নহে। স্বর্গ পবিত্র-পুরী, বৈকুণ্ঠ আনন্দ-ধাম। যে প্রেম-ভক্তি কর্ত্তব্যতার সহচরী, তাহা বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে। যাহা উপদেশে উঠে বা কৃতজ্ঞতায় জন্মায় তাহাও বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি সৌন্দর্য্য-বোধের সহচরী, উপদেশে উহা উদ্ভূত হয় না, কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দায়িত্ব ইহাতে নাই, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে। অনন্ত সুন্দরের শোভায় তাঁহার প্রতি চিত্তের যে একাগ্র গতি,—তাহাই প্রকৃত প্রেমভক্তি। আর যে রসে হৃদয় উথ্‌লে উঠে, তাহাই প্রকৃত মাধুর্য্য রস। ঐ মাধুর্য্য রসে, ঐ প্রেম-ভক্তি-ভরে বৈষ্ণব জগদীশ্বরকে দেখিল,—রাসরসিক রসেশ্বর।

অতএব আদর্শ-সাধিকার, প্রেমময়ী রাধিকার, প্রেমভক্তি—গুরু-পদেশের ফলও নহে, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সহচরীও নহে। তিনি ব্রজ-সুন্দরের সৌন্দর্য্যে, আনন্দময়ের আনন্দে, রসিক-শেখরের রস-লোভে কুলত্যাগিনী। যে কুলকামিনী শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বা সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া, গুরুজনের উপদেশ মত, পতিপরায়ণা, পতিরতা, পতিব্রতা; স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া জানেন,—তিনি নারী-চরিত্রের আদর্শ, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, স্বর্গের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী। তিনি সীতা, তিনি সাবিত্রী, তিনি ধরিত্রীর পাবিত্রকারিণী। কিন্তু তাঁহার পতিভক্তি, বৈষ্ণবের অনুকরণীয়া নহে। যে ভাবে যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, যদি পিতা মাতা পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমায় পাইবে, সেই ভাবে রাধিকা সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণে পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব বলেন, যিনি শাস্ত্রের শাসনে পতিপরায়ণা, তিনি পূজনীয়া হইয়াও বালিকা; যিনি সমাজের দৃষ্টান্তে পতিরতা, তিনি মাননীয়া হইলেও গড্ডলিকা; যিনি উপকারের প্রত্যুপকার-চ্ছলে পতিসেবায় নিযুক্তা, তিনি বেণেনী; যিনি কঠোর কর্ত্তব্য-সাধনে পতিপ্রাণা, তিনি ব্রতধারিণী দেবী; কিন্তু যে প্রেমের বলে, কুল মানিল না, মান দেখিল না, লজ্জা-ভয় পাইল না, শাস্ত্র ভাবিল না, কিছুই গণনা করিল না, সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী হইয়া কলঙ্কিনী হইল, তিনিই যথার্থ প্রেমময়ী। তুমি ধর্ম্মধ্বজী, ইহাতে শিহরিয়া উঠিলে; তুমি হিতবাদী, শনৈঃ শনৈঃ মস্তক সঞ্চালন করিতেছ; তুমি নীতিবিৎ, তোমার মস্তক আজি বজ্রাহত হইল; তুমি সতীত্বের গৌরবাকাঙ্ক্ষী—হতাশ হইতেছ। না,

তোমরা কেহই হতাশ হইও না—প্রকৃত প্রেম-ভক্তির সহিত শাস্ত্রের দ্বন্দ্ব নাই, সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্ত্তব্য পালনের শক্রতা নাই। রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে।

রাধিকা ক্লীবে বিবাহিতা, সুতরাং শাস্ত্রমতে অনূঢ়া। পরকীয়া হইয়া পরস্ত্রী নহেন; কুলটা হইয়াও স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নহেন। এই খানেই বাঙ্গালি বৈষ্ণবগণের আদর্শ-সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল! যিনি মহৎ হইতে মহৎ, তিনি ক্ষুদ্রকে বিস্মৃত হন না। বৈকুণ্ঠের প্রেমভক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নীতি—বিস্মৃত হন নাই। প্রেমময়ী শাস্ত্রে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নীতির দিকে নয়ন না হেলাইয়া প্রেমময়ের দিকে একাকিনী অভিসারিণী হইয়াছেন, শাস্ত্র—ধীর পদে দূরে থাকিয়া, তাঁহার দেহ-রক্ষার্থ তদীয় অনুসরণ করিতে-ছেন, নীতি—পরিচারিকা ভাবে চামর লইয়া পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব চিত্রিত এই অপূর্ব্ব ছবি বড়ই সুন্দর, সরস এবং সারময়।

প্রেমভক্তির উৎপত্তি ঐরূপ; ঐ ভক্তির বিকাশ এবং স্থিতি আরও বিস্ময়কর। কঠোর কর্ত্তব্যের সহিত প্রেমভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যেই উহার উৎপত্তি; এবং সেই জন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী। আর প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভোগী অথবা লম্পট!

শ্রীমতীর মত শ্রীকৃষ্ণের যদি একগতি, একমতি তুমি দেখিতে চাও, তবে তুমি আবার সেই পালটি-প্রকৃতি খুঁজিতেছ, বিনিময় চাহিতেছ, প্রেমের বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর সাধনায় সেরূপ বাণিজ্যের বাসনা, অসম্ভবের আব্দার। এই অসংখ্য সূর্য্য চন্দ্র পরিব্যাপ্ত বিশ্বমণ্ডল, যাঁহার আনন্দের উপাদান, তুমি—ধ্রুব হও, প্রহ্লাদ হও,—সনক হও, সনাতন হও, যীশু হও,—মহম্মদ হও,—শ্রীদাম হও, শ্রীমতী হও,—তিনি যে তোমাতেই তাঁহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমার কেমন আব্দার? তবে হৃদয়ে যদি বাস্তবিকই ভক্তি থাকে, এতটুকু আব্দার করিতে পারি বটে, যে তুমি অনন্ত হইয়াও সর্ব্বদৃক্, আমি ক্ষুদ্র হইয়াও যেন তোমার চরণে শরণ পাই।

এই জন্যই শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন—

ভুল না, ভুল না, নাথ!
মিনতি করি আমি হে!
অন্যেরও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

তোমারও অনেকও আছে,
আমার কেবল তুমি হে!

ঐ সমান্য কয়টি কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কেমন সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়!

"অন্যেরও অনেকও আছে,"—কত লোক, কত বিষয়ের উপাসনা করিতেছে, কত বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কেহ ধন-জন-মান লইয়া ব্যস্ত, কেহ রূপ-গুণ-কুল লইয়া মত্ত, কেহ রাজ সভার ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট, কেহ বা সমর-সজ্জায় মোহিত। সাধকের কিন্তু—তিনি এই মায়া-মোহ-ময়, লীলা-খেলা-পূর্ণ, অথচ বিপজ্জাল-জড়িত সংসারেই থাকুন, আর ঘন-বিরল-বিটপি-বিন্যস্ত, স্বভাবের শস্পশোভা-শোভিত হিমালয়ের নিরালয় সানুদেশেই থাকুন,—সাধকের জগদীশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, জগদীশ্বরই তাঁহার অবলম্বন, এবং জীবনের জীবন। "অন্যেরও অনেকও আছে, আমার কেবল তুমি হে!" আমায় ভুলিও না। আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অণু হইতে অণু, এই অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত সহস্র কোটি সৌর মণ্ডলের মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চন, তুমি সর্ব্বময় সর্ব্বাধার, "তোমারও অনেক আছে" ভুল তোমাতে সম্ভব হইলে, তুমি ভুলিলে ভুলিতে পার, কিন্তু নাথ! তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? আমার যে কেবল তুমি হে! অতএব মিনতি করি, নাথ! তুমি আমায় ভুলিও না। ভক্তির কি মনোরম উচ্ছাস, হৃদয়ের কি সুন্দর বিকাশ। তোমার অনেক আছে, থাকিবারই কথা। তুমি রাজ-রাজেশ্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার প্রজা, তুমি রসিক-শেখর যোড়শ সহস্র গোপিনী তোমার সেবিকা, কিন্তু আমার এই আব্দার, তুমি তা বলিয়া আমাকে যেন ভুলিও না, ভুলিলে আমার গতি কি হইবে? "আমার যে কেবল তুমি হে!" অতএব মিনতি করি, তুমি আমায় ভুলিও না। প্রেম-ভক্তিময়ী সাধিকা, ভক্ত প্রধানা সাধিকার সরল প্রাণের ঐ একমাত্র কামনা। বৈষ্ণব শক্তি-সেবকের মত ধনং দেহি, মানং দেহি, বলেন না, বলিতে জানেন না; বৈষ্ণব কৃপাময়ের কৃপাকণা কখন যাজ্ঞা করেন না,—কোন দেশে এমন মূর্খ নায়িকা নাই যে 'নাথ। আমাকে কৃপা কর' বলিয়াছেন। প্রবাস-গমন-প্রয়াসী নায়কের নিকটে বাস্প-ভর-স্পন্দিত নয়নে নায়িকা আসিয়া যেমন ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন, "দেখ, মনে রেখ, যেন ভুল না," বৈষ্ণব চিরদিনই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সেইরূপ বলিয়া থাকেন 'ভুলনা,

ভুলনা, নাথ। মিনতি করি আমি হে।' বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির ঐ এক মাত্র প্রার্থনা।

বৃন্দাবন-পরিক্রমে প্রায়ই পথ ভুল হইয়া থাকে; আমরা প্রেম-ভক্তির পরিণাম-কুঞ্জে আসিয়াছি, পথে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আবার সেই কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রেম-ভক্তির মহাযাত্রায় চন্দ্রাবলীর পালা ছাড়িতে পারা যায় না। প্রেম বৈকুণ্ঠ হইতে অবতারিত। প্রেমে কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্তু পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে; অভিমান— নায়িকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী।

সীতা যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সস্ত্রীক হইয়া সেই যজ্ঞ করিতে হয়, তখন অভিমানের উৎকণ্ঠায় বলিলেন, 'কি বলিলে? কি বলিলে?' বর্ণনকারিণী বলিতে লাগিলেন, 'তিনি স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া বামে রাখিয়াছেন'; তখন অভিমান সেই পূর্ণ প্রীতিকে পথ ছাড়িয়া দিল; প্রীতির উচ্ছ্বাস নয়নে আসিল; সীতা ন.নাঞ্চলে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বলিলেন, "সেই ধর্ম্মব্রত মহারাজের জয় হউক।" যখন পতি-ভক্তির পূর্ণ-প্রতিমা সীতাতেই এইরূপ প্রেমাভিমান, তখন অন্য পরে কা কথা। কিন্তু নায়িকার পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে বলিয়া, সাধকের ঈশ্বর-প্রেমেও কি অভিমান আছে? আছে। আব্দারের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না থাকিলে, প্রেম কখন বিকশিত হয় না। এই অভিমান ছিল বলিয়াই সাধক-প্রধান রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন,—"মায়ের এমনি বিচার বটে।" ভক্তিতে অভিমান ছিল বলিয়াই মহাত্মা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন—

কোথায় আনিলে?
পথ ভুলালে।

শ্রীমতীর সেই অভিমানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, চন্দ্রাবলীর পালায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধক-সাধিকার একমাত্র কামনা, 'নাথ। আমায় ভুলিও না।' যদি একবার মনে হয়, যে 'আমার কেবল তিনিই,' ইহা জানিয়াও তিনি আমায় ভুলিয়াছেন, তবে সাধকের আর অভিমানের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু সেই অভিমানে ভক্তি শিথিল হয় না, দৃঢ় হয়। সরল ভক্তিতে অভিমানের গ্রন্থি ভক্তি আরও সুদৃঢ় করে। এই অভিমান-গ্রন্থি সকল ভক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। জোবে আছে, দাযুদে আছে, সাদীতে আছে, মহম্মদে আছে, ধ্রুবে আছে, প্রহ্লাদে আছে। প্রেম-ভক্তির আদর্শ-প্রতিমা শ্রীরাধার প্রেম-বিকাশের এই অভি-

মানই প্রধান উপকরণ। এই অভিমান প্রেমসাগরের মাণরজ্জু। যেখানে প্রেম যত গভীর, সেখানে মাণরজ্জু ততই বিস্তৃত। কিন্তু সাগর যেখানে অগাধ, সেখানে মাণরজ্জু হারাইয়া যায়। প্রেম অগাধ হইলে, অভিমান প্রেমে লীন হয়। তখন নায়িকা বলেন;—

'প্রণয় মোর সাগরতুল, সে কি অনাদরে শুখাবার,
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার।
সখি কত দূরে ভানু রয়, নাগর তাহে কাতর নয়,
পসারি তার অগাধ হৃদয় তবু তার পানে ধায়।

প্রভাস খণ্ডে শ্রীমতীর প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশ, তখন অভিমান অতলের অতলে গিয়াছে। তখন বৃন্দাবনের সেই বিলাসিনী কেবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের জন্য উন্মাদিনী। তখন আর রুক্মিণী বা সত্যভামার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বোধ নাই।

বৈষ্ণবের প্রেমভক্তির পরমোৎকৃষ্ট আদর্শের আমরা এতক্ষণে ঐহিক চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের সেই কূল-ভঙ্গকর স্রোতে তরঙ্গ আর নাই, এখন আশ্বিনের একটানা পড়িয়াছে; আপনার বেগে মন্দাকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন; বর্ষার সেই ঘোর ঘটার বজ্র বিদ্যুৎ চলিয়া গিয়াছে, এখন শরদের মাধুর্য্যে জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। প্রভাসের রাধিকা শরদের সেই মন্দাকিনী; বিমল উজ্জ্বল পূর্ণ চন্দ্রের সুন্দর ছবি প্রশস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তখন কুল-কুলস্বরে অনন্ত প্রেমের অনন্ত সাগরে মিলিতেছেন। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির এই চরম আদর্শ!

বোধ হয়, এতক্ষণে আমরা কতক কতক বুঝিয়াছি, যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-স্বামী, সকলের উপাস্য বলিয়াই তিনি গোপাঙ্গনাগণের নায়ক বলিয়া বর্ণিত; এবং প্রেমভক্তি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, বা শাস্ত্রের অনুসরণ নয় বলিয়াই রাধিকা কুলত্যাগিনী।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় বুঝিলাম, যে বৈষ্ণবের মতে যৌবনের উৎসাহময় **মাধুর্য্য রসই** সাধকের চিত্ত-বৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা; ঈশ্বরে ঐকান্তিকী **প্রেম-ভক্তিই** তাঁহার সহজ সাধনা; বৃন্দাবনের বিলাসিনী, প্রভাসের তপস্বিনী প্রেমময়ী **শ্রীমতী রাধিকাই** প্রধানা সাধিকা ও ভক্তের আদর্শ, এবং অনন্ত সুন্দর, রসশেখর **শ্রীকৃষ্ণই** অনন্ত অসংখ্য সাধকের একমাত্র আনন্দ-কেন্দ্র।

ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন ঐতিহাসিক আদর্শ আছেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালি প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা বারান্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা।

ইংরাজের কাছে, হিন্দু নানা দোষে দোষী। ইউরোপের কাছে, এসিয়া ঘোর অপরাধে অপরাধী। এসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ আপনাকে কষ্ট-সহিষ্ণু এবং উন্নতি-শীল বলিয়া প্রশংসা করে এবং এসিয়াকে বিলাস-প্রিয় এবং অবনতি-প্রবণ বলিয়া নিন্দা করে। ভারতের ইংরাজ যে ভারতের হিন্দুকে অশেষ দোষে দোষী বলিবেন, সে কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বিদ্বান, বিচক্ষণ, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ইউরোপও যে হিন্দুর সেইরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করেন, ইহা একটু বিস্ময়কর। The ease-loving Oriental—এই নিন্দাবাদ. শুধু ইংরেজের মুখে নয়, ফরাসী, জর্ম্মাণ, প্রভৃতি সকল ইউরোপবাসীর মুখে শুনা যায়। তবে ইংরেজের মুখে যতটা, অপর ইউরোপবাসীর মুখে ততটা শুনা যায় না। এই নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূলক এমন কথা বলি না। ইউরোপ যাহাকে কর্ম্ম-শীলতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা বলে এসিয়ায় তাহা অধিক পরিমাণে নাই। অবিশ্রান্তভাবে পৃথিবীর দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান, শীত গ্রীষ্ম তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ বা অগ্নিময় মরুভূমে ভ্রমণ, এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন এবং এক কথায় দূরদেশ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, পাহাড় কাটিয়া রেল-পথ সম্প্রসারণ, বালি কাটিয়া বরুণের রাজ্য বিস্তীর্ণ করণ—এ রকম চঞ্চলতা-সংযুক্ত শ্রমশীলতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা এসিয়ায় বড় একটা দেখা যায় না। তাই ইংরেজ এবং অপরাপর ইউরোপবাসী এসিয়া-বাসীকে ease loving Oriental বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু এসিয়াবাসী কি যথার্থই ease loving, আরাম-প্রিয় বা বিলাস-প্রিয়? সমস্ত এসিয়াবাসীর সম্বন্ধে এ

প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হিন্দুজাতি প্রকৃত পক্ষে আরাম-লোলুপ বা বিলাস-প্রিয় কি না, হিন্দুজাতি প্রকৃত পক্ষে শ্রমশীল এবং কষ্টসহিষ্ণু কি না, আমি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এবং এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত প্রাচীন হিন্দুদিগের কথা বলিব। তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না, কারণ ইউরোপবাসী প্রাচীন হিন্দুকেও বিলাস-প্রিয় জাতি বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। সাহেবের বিবেচনায় যোগোপবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মুদিতাক্ষ মহাযোগী ও স্বস্তি-প্রিয় ভারত-বাসী। আব এক কথা। এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিব। তাহার প্রথম কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুর কার্য্যকলাপ ফুরাইয়া গিয়াছে, এমন কি সে কার্য্যকলাপের মধ্যে অধিকাংশের চিহ্নমাত্র নাই, স্নতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও সাহিত্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না সাহিত্যে শুধু কার্য্যকলাপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধা এবং আসক্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ, ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকলই অঙ্কিত থাকে। জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় ধাত্‌ বাঁধা থাকে, কেন না জাতীয় ধাত্‌ না বাঁধিলে জাতীয় সাহিত্য জন্মে না।

এ দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক বৃদ্ধ, বিদ্বান মূর্খ, ধনী নির্ধন, ছোট বড়, সকলেই কিছু কিছু ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা অবগত আছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির স্থূল স্থূল কথা সকলেই জানে। অতএব কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, যে এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র দুঃখের কাহিনীতে, কষ্টের কথায়, ত্যাগ-স্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ। রামের বনবাস, পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস, অর্জ্জুনের নির্ব্বাসন, নলদময়ন্তীব কথা, শ্রীবৎসচিন্তার কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা, সাবিত্রীসত্যবানের কথা, জিমূতবাহনের কথা, দাতাকর্ণের কথা—এইরূপ অসংখ্য অগণ্য শোক, দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণার কথায় হিন্দুশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বোধ হয় এত শোক এত দুঃখ এত ক্লেশ এত যন্ত্রণার কথা পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে নাই। আবার যিনি সেই সকল কথা মন দিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন কি অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া, বনবাসী বনবাসিনী সেই বনবাস যন্ত্রণা, পতিহারা পতিব্রতা সেই পতি-বিচ্ছেদ দুঃখ, সেই পতি-বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন—তিনিই জানেন, যে মহাপুরুষগণ সেই সকল শোকের দুঃখের যন্ত্রণার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সেই কথায় কত উন্মত্ত,

কত বিহ্বল, কত মুগ্ধ; যেন শোক দুঃখ যন্ত্রণাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ—মানুষের পরম ভোগবিলাসের সামগ্রী। গ্রীক্ সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও অনেক দুঃখের কাহিনী আছে। সফক্লিস, ইস্কিলস এবং সেক্ষপীয়রের মতন দুঃখ যন্ত্রণার কথা ইউরোপে অতি অল্প কবিই লিখিয়াছেন। কিন্তু সে দুঃখ যন্ত্রণা হয়, ক্ষণমাত্র স্থায়ী—যেমন গ্রীক্ নাটকে; নয়, ক্রোধ হিংসা এবং অধৈর্য্য মিশ্রিত—যেমন সেক্ষপীয়রের নাটকে। নাটক অভিনয় করিতে যে চারি পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে, গ্রীক নাটক বর্ণিত ঘটনাবলিও সেই স্বল্প কালব্যাপী। অতএব গ্রীক্ নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণা—ঈদিপস্, আন্তাইগনি বা ফিলক্তিতিসের যন্ত্রণা—তীক্ষ্ণতম হইলেও দণ্ড-মাত্র-স্থায়ী। ইংরাজী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। কিন্তু ইংরাজী নাটকের নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণা—হ্যাম্লেটের বা লীয়রের যন্ত্রণা—অধীর অস্থির অসহিষ্ণু লোকের যন্ত্রণা। সেক্ষপীয়র, সফক্লিস, ইস্কিলস্ সকলেই দুঃখ যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু কেহই দুঃখ যন্ত্রণার জীবন চিত্রিত করেন নাই। পল পল করিয়া দণ্ড, দণ্ড দণ্ড করিয়া দিন, দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া জীবন—এমন একটা দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবন—কেহ চিত্রিত করেন নাই। ইউরোপীয় নাটকে যন্ত্রণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাড়িয়া ফেলিতেছে, কেহ আপনার সন্তানসন্ততিকে আপনি উৎকট অভিসম্পাত করিতেছে, কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য—যেন বিদ্যুতাগ্নিতে সহসা দশ দিক জ্বলিয়া উঠিতেছে—কিন্তু তখনি আবার সব ঘোর অন্ধকার। কেবল চকিত হইতেছি মাত্র—দেখিতেছি অতি অল্প, বুঝিতেছি অতি অল্প। অবাক হইয়া আছি।* যে যন্ত্রণা কাটিয়া কাটিয়া লুণ দেওয়ার মতন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, বাড়িয়া বাড়িয়া একটা জীবনকাল বা জীবনকালের একটা সুদীর্ঘ অংশ ব্যাপিয়া উঠে, অথচ যন্ত্রণাভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় না—কেবল প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্যে দেখা যায়।—বালিকা রাজবধূ ইচ্ছা করিয়া বনে গমন করিতেছেন। রাজভোগ, রাজসম্পদ, রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ, বন্যজন্তু সমাকীর্ণ

---

* ইউরোপীয় নাটক পাঠে মোহিত হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভ বড় বেশী হয় না।

বনপথে উপবাসে অল্পাহারে বৃক্ষমূল সার করিয়া চলিতেছেন—দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া কত কালই চলিতেছেন। এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার পতিপ্রাণার পতি-বিচ্ছেদ—যে পতির জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেই পতিকে ছাড়িয়া শত্রুপুরীতে বাস। শত্রু প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিপ্রহর, প্রতিদিন শাসাইতেছে, তাড়না করিতেছে, অপমান করিতেছে, জ্বালার উপর জ্বালা দিতেছে। এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল। তার পর যদি শত্রুর হাত ছাড়াইলেন, আবার পতির হাতে পড়িয়া অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি-পরীক্ষা দিয়াও নিষ্কৃতি নাই। রাজ্যে গিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া আবার সেই বনবাস। বনবাসের পর আবার সেই নিদারুণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়া অনন্তকালের জন্য অন্তর্ধান। যেন কষ্ট দিতে, কষ্ট সহিতে হিন্দুর কত সুখ, কত চেষ্টা। আবার দেখ,—রাজা হরিশচন্দ্রকে দুঃখ দিতে হইবে—দুঃখ দিতে হইলে দুঃখে জর্জ্জরিত না করিলে দুঃখ দেওয়াই হয় না। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন যে এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান করিবেন। এক মাসের দুঃখে মানুষ জর্জ্জরিত হয় না। তাই ভয়ানক হিন্দুকবি একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখাইয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রকে যুগ ব্যাপী যন্ত্রণাভোগ করাইলেন! তাই বলি, যন্ত্রণা ভোগ কাহাকে বলে, প্রকৃত কষ্ট-সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে, যদি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুঝিলে চলিবে না। শোকের, দুঃখের, কষ্টের-যন্ত্রণার তুষানল কাহাকে বলে, হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহ জানে না।

রাজা ঔশীনর যজ্ঞ করিতেছেন। কপোতরূপী অগ্নি শ্যেনরূপী ইন্দ্র কর্তৃক তাড়িত হইয়া প্রাণ-ভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা কপোতকে শ্যেনের ভক্ষ্য-বস্তু করিয়াছেন—ক্ষুধার্থ শ্যেন রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে রাজা অস্বীকৃত হইলেন; তিনি বলিলেন—'গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এইক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে

প্রদান করিব না।' শ্যেন কহিল 'যদি এই কপোত-পরিমাণ মাংস নিজদেহ হইতে কাটিয়া দিতে পার, তবেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া কপোতের কামনা পরিত্যাগ করিব।' 'তাহাই করিব' বলিয়া রাজা ঔশীনর তুলা যন্ত্রের একদিকে কপোতকে বসাইয়া অন্যদিকে আপন হস্তে আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া রাখিলেন। কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে আর এক খণ্ড মাংস কাটিয়া মাংসের উপর রাখিলেন। তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে এক এক খণ্ড করিয়া অসংখ্য মাংস-খণ্ড কাটিলেন—তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন সেই কঙ্কাল-মাত্র দেহ লইয়া রাজা ঔশীনর স্বয়ং তুলা-যন্ত্রে আরোহণ করিলেন। দেখিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্র ইন্দ্ররূপ ধারণ করিলেন—কপোতরূপী অগ্নি অগ্নিরূপ ধারণ করিলেন, এবং রাজার অক্ষয় যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজা ও ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গমর্ত্ত্য উজ্জ্বল করত দেদীপ্যমান কলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন। কালে এই কথা ইউরোপে গমন করিল—এই রকমের অনেক কথাই ইউরোপে গমন করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপে গিয়া এ কথার এ আকারও রহিল না, এ প্রকারও রহিল না। ইউরোপ আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দিতে পারিল না—তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা কি সওয়া যায়? ইউরোপ ঔশীনরের আপনার দেহের মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! আর ভাবিল—এমন কি পরোপকার, যে তজ্জন্য এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহিতে হইবে আর আপনার মাংস কাটিয়া দিয়া প্রাণটাকে নষ্ট করিতে হইবে? ইউরোপ ঔশীনরের কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিল। মাংস কাটিয়া প্রাণ নষ্ট করিবার ভয়ে আইনের একটা কূটতর্ক তুলিয়া মাংস কাটিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, আর পাছে সেই ভীরুতা এবং আত্মপ্রিয়তার জন্য লোকে নিন্দা করে, সেইজন্য আপনার কলঙ্কের ডালিটা একটা নির্ব্বিরোধী ইহুদীর মাথায় চাপাইয়া দিল! আর সেই গল্প লিখিয়া * স্বয়ং সেক্ষপীয়র সেই কলঙ্কের ডালি আপনার পবিত্র মাথায় চাপাইলেন! আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, যে কুসীদজীবী শাইলক যে নৃশংস নির্ম্মম প্রণালীতে টাকা ধার দিয়াছিল, তদনুসারে কার্য্য হওয়া উচিত নয়, সে প্রণালী ব্যর্থ হওয়াই ভাল। এও কি কথা? যেখানে মানুষকে

---

* Merchant of Venice.

নীতির এবং ধর্ম্মের আদর্শ দিতে হইবে, সেখানে কি আদর্শশ্রেষ্ঠ বিশ্বাদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে না? সেই বিশ্বাদর্শ কি? বিশ্বনাথের নিয়মে জীব কি দলিত, নিষ্পীড়িত, ক্ষতবিক্ষত, বিচূর্ণিত, বিঘূর্ণিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভস্মীভূত হইতেছে না! তা বলিয়া কি বিশ্বনাথের নিয়মকে ব্যর্থ বলিতে হইবে? ইউরোপ তাই করেন, হিন্দু তা করেন না। হিন্দুর দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনীর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের এক কাহিনী আছে। সে কাহিনী অপূর্ব্ব কৌশলে কথিত। রাজা হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণা দান করিতে প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুত কার্য্য হিন্দু সর্ব্বদাই ধৈর্য্য সহকারে সম্পন্ন করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত কার্য্য করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকে আকুল, যন্ত্রণায় বিহ্বল। সে শোক, সে যন্ত্রণা দেখিলে দর্শকের হৃদয়ও শোকে তেমনি আকুল, যন্ত্রণায় তেমনি বিহ্বল হইয়া উঠে। এ রকম চিত্র কেন? কেন তাহা এই কথায় বুঝ। এ চিত্র দেখিলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয়, মনে হয় বিশ্বামিত্রের মতন পাষণ্ড আর নাই। কবিও তাই বলিতে চাহেন। শৈব্যা আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষিণাদানের প্রস্তাব করিলেন। পতিব্রতা পত্নীকে বিক্রয় করিতে হইবে মনে করিয়া রাজা শোকে বিহ্বল প্রায়। এমন সময় বিশ্বামিত্র আসিয়া বলিয়া গেলেন—আজ যদি দক্ষিণা না দিস্, তাহা হইলে সূর্য্যাস্ত হইলেই তোকে অভিশপ্ত করিব। তখন

————————রাজা চাসীদ্ ভয়াতুরঃ।

কান্দিগ্‌ভূতোঽধমোনিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দ্দিতঃ॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

রাজা নৃশংস ধনী কর্ত্তৃক পীড়িত, ভয়াতুর, দিশাহারা, অধম এবং নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন।

কবি বিশ্বামিত্রকে নৃশংস বলিয়া গালি দিলেন। আবার যখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রীপুত্র বিক্রয়লব্ধ ধন লইয়া বিশ্বামিত্র দক্ষিণার অবশিষ্টাংশের নিমিত্ত রাজাকে শাসাইয়া চলিয়া গেলেন তখন কবি বলিতেছেন;—

ত্বমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুরং নির্ঘৃণং বচঃ।

তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

কৌশিক রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে এই নিষ্ঠুর, নির্ঘৃণ বাক্য বলিয়া সেই ধন গ্রহণ পূর্ব্বক কোপভরে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

কবি বিশ্বামিত্রের ব্যবহারকে নিষ্ঠুর ও নির্ঘৃণ বলিয়া নিন্দা করিলেন—বিশ্বামিত্রের উপর কবির কত রাগ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ রাগ ন্যায়-

সঙ্গত; কেন না বিশ্বামিত্রের পণ যথার্থই নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠুর এবং নির্ম্মম ভাবে দেখাইবেন বলিয়াই হিন্দু কবি তাঁহার চিরন্তন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে কাঁদাইলেন। হরিশ্চন্দ্রকে না কাঁদাইলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয় কৈ? কিন্তু এত রাগ করিয়াও কবি বিশ্বামিত্রের কার্য্যে ত বাধা দিলেন না—পাষণ্ডের পণ ত পণ্ড করিলেন না। করিবেন কেন? তিনি যে বিশ্বাদর্শের অনুগামী। জীব যন্ত্রণা পায় বলিয়া কি বিশ্বের নিয়ম ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিষ্ঠুর হউন না, বিশ্বামিত্র পুরুষ, বিশ্বামিত্র মানুষ—পণ ছাড়িবেন কেন? হরিশ্চন্দ্র যতই কেন কাঁদুন না—তিনিও মানুষ, সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে সত্য পালন করিতেই হইবে। হিন্দু ভিন্ন কেহ বিশ্বের শোক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানে না। ইউরোপ যদি শোক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যে শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, সেক্ষপীয়র কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিতেন না। হিন্দু শোক দুঃখ এবং যন্ত্রণার প্রকৃত আস্বাদ জানে বলিয়া শোক দুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য চিরকাল লালায়িত। যে শ্রমের মর্ম্ম বুঝে, সেই বিশ্রামের প্রার্থনা করে—সেই যথার্থ বিশ্রাম-প্রয়াসী হয়। হিন্দুর মুক্তি-কামনার তাৎপর্য্য বড় গভীর। স্বস্তি প্রয়াসী প্রাচীন জাতি বলিয়া হিন্দু মুক্তি-কামনা করেন না। যাঁহারা সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে হিন্দু শোক দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যত লালায়িত জগতে আর কেহ তত লালায়িত নয়। কিন্তু সেই মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু যত কঠোর তপস্যা, কঠিন ব্রহ্মচর্য্য, নিদারুণ আত্মত্যাগ, অলৌকিক গৃহসন্ন্যাস করিয়া থাকেন, জগতে আর কেহ তত পারে না। যে এত শোক দুঃখ ভোগ করে, লোকে তাহাকে কেমন করিয়া আলস্য-লোলুপ লোক বলে বুঝিতে পারি না। অথবা বুঝি নাই বা কেন, বুঝি। ইউরোপ যাহাকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করা বলে, হিন্দু তাহা করে না। ইউরোপ নিজে যাহা করে না, ইউরোপ তাহা বুঝিতেও পারে না। ইউরোপের এই একটি মহৎ রোগ।

ইউরোপবাসী এবং হিন্দু উভয়েই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। কিন্তু উভয়ের সমান উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ বাহ্যসম্পদের নিমিত্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে, হিন্দু ধর্ম্মের নিমিত্ত, কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট

আত্মার জন্য। ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য। দুই প্রকার কষ্টের দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সে উন্নতি দুই রকমের। একটি বাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি। হিন্দুর বাহ্য উন্নতি বড় বেশী হয় নাই, ইউরোপের আধ্যাত্মিক উন্নতিও বড় বেশী হয় নাই। ইউরোপের সামান্য লোককে এখানকার পল্লিগ্রামের বড় বড় জমিদারের অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হয়, এখানকর সামান্য লোকও ধর্ম্মজ্ঞানে এবং ধর্ম্মচর্য্যায় ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকের সমকক্ষ। কোন্ উন্নতিটি উৎকৃষ্ট, পাঠক বিচার করিবেন। তবে একটা কথা আছে। কেহ কেহ বলিবেন যে হিন্দুর উন্নতি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার ফল মৃত্যু—উদাহরণ, ইউরোপ কর্ত্তৃক এসিয়ার বাণিজ্য হরণ এবং ইংরাজ রাজ্যে হিন্দুর দারিদ্র। একথা সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে ইউরোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু নয়? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুর উন্নতির ফল যেমন দেহের মৃত্যু, ইউরোপের উন্নতির ফল তেমনি আত্মার মৃত্যু। আবার পাঠককে বলি, কোন্ মৃত্যুটা ভাল বিচার করিবেন। আমরা একটা সার কথা বুঝি এই যে, কি এ দেশীয় শাস্ত্র, কি বিদেশীয় শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বলে ধর্ম্মযুদ্ধে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ হয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, লোক ধর্ম্ম প্রধান হইলে যে তাহাদিগকে মরিতেই হইবে, এমন কি লেখাপড়া আছে? হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রধান বলিয়া পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে যখন হিন্দুস্থান লইয়া যুদ্ধ হয় তখন হিন্দুর সামরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। এমন হইতে পারে যে তাহার স্বদেশানুরাগ বা patriotism ছিল না, কিন্তু রাজস্থানে যে রাজভক্তিকে স্বদেশানুরাগের কার্য্য করিতে দেখা গিয়াছে,সে রাজভক্তি ত প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল? অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে ধর্ম্মপ্রধান না হইয়াও এবং স্বদেশানুরাগী হইয়াও গ্রীক্ যে কারণে পরাধীন হইয়াছিল,হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হয়—দেশ অনেক গুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া। আর এক কথা। ধর্ম্মপ্রধান হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম্ম অতি মন্দ জিনিস। কিন্তু সে অর্থ কি কেহ গ্রহণ করিবেন? বোধ হয় না। তবে এমন কি লেখাপড়া আছে, যে ধর্ম্মপ্রধান হইলে আমাদিগকে মরিতে হইবে? তুমি ইউরোপকে দেখাইয়া বলিবে যে আত্মসুখান্বেষী না হইলে ইউরোপের ন্যায় চঞ্চল (active), শ্রমশীল,অসমসাহসিক (বা adventurous) ইত্যাদি হওয়া যায় না। আমি জিজ্ঞাসা

করি, তোমাকে এ কথা কে বলিল? মানুষের ইতিহাস পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, যে আদিম অবস্থায় মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এবং আপনার প্রয়োজন লইয়া থাকিত, তখন মানুষ পশুর ন্যায় অতি অলস এবং অসহিষ্ণু ছিল। এবং যখন মানুষের পাঁচ জন হইল—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী হইল—তখনই সে চেষ্টাশীল, শ্রমশীল, কর্ম্মশীল হইতে লাগিল। অতএব ধর্ম্মই কর্ম্মের প্রকৃত মূল। তবে মানুষের এমন একটা সময় হয়, যখন সে ধর্ম্মের জন্য নয়, শুধু সম্পদের জন্য সম্পদ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মানুষ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ পায়, তখন তাহার ধনলোভ বা সম্পদ-লালসা জন্মে এবং তখনই মানুষের সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউরোপ পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তুমি বোধ হয় তর্ক করিবে, যে আপনার সুখসাধন করিতে মানুষের স্বভাবত যত প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয়, অন্যের সুখসাধন করিতে তত হয় না। এ কথার উত্তর এই যে আপনার সুখ অপেক্ষা অন্যের সুখ বেশী প্রার্থনীয় বলিয়া, যে বুঝিতে শিখিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এমন কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে, যে আপনার সুখাপেক্ষা সে অন্যের সুখের নিমিত্ত স্বভাবতই বেশী উদ্যমশীল হইবে। হিন্দু সাহিত্যের ধাত্ বুঝিয়া দেখিলে অনুমিত হয়, যে প্রাচীন কালে হিন্দু ধনের নিমিত্ত নয় ধর্ম্মের নিমিত্ত, আজিকার ইউরোপের ন্যায়, আজিকার ইউরোপের প্রাণালীতে, কর্ম্ম করিতে পারিতেন। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভেদ করিয়া বেড়াইত, যজ্ঞের অশ্বের অন্বেষণে সগর সন্তানেরা পৃথিবীকে খনন করিয়া সাগরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল, (লেসেপস্ খানিকটা বালি কাটিয়া একটা সরু খাল কাটিয়াছেন বৈত নয়), এবং সেই ষাটি সহস্র সগর সন্তানের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কত দুর্গম স্থানে গিয়াছিলেন এবং কত দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বলা যাইতে পারে, যে প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষা হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে তিনি স্বার্থকে অধীন করিয়া পরার্থকে প্রধান করিয়া আজিকার ইউরোপের প্রণালীতে বাহ্যোন্নতির নিমিত্ত চেষ্টাশীল এবং উদ্যমশীল হইতে পারিবেন। এবং তাহা হইলে একমাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম-মূলক এবং ধর্ম্মাত্মক হইবে। কিন্তু হিন্দুর যে প্রাচীন প্রকৃতি এবং প্রাচীন শিক্ষার কথা বলিতেছি, আজিও কি তাহার কিছু আছে? বোধ হয় কিছু আছে। কেন না আজিও গৃহস্থ হিন্দু

যত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটিয়া থাকেন, গৃহস্থ ইংরাজ তত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটেন না। অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে ধর্ম্মচর্য্যায় প্রাচীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যম, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার ক্ষমতা ছিল, আজিকার হিন্দুরও যেন তাহা থাকে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে হিন্দুর মধ্যে সে ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং যাঁহারা ইংরাজি শিখিতেছেন তাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু দেখিয়াছি যে কষ্ট সহিষ্ণুতাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দু-মহত্ব, হিন্দুর ইউরোপের উপর প্রাধান্য। সে কষ্টসহিষ্ণুতা হারাইলে আমরা সব হারাইব—আমাদের বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন,আমাদের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে।

আর একটি কথা। কষ্টেই মানুষের উন্নতি। দেখিলাম হিন্দুর যত কষ্ট-ভোগ ক্ষমতা আছে, আর কাহারো তত নাই। অতএব আমাদের ইতিহাসের এই কথাটিই আমাদের সমস্ত আশা ভরসার মূল। যদি আবার তেমনি কষ্টভোগ করিতে পারি, তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহৎ হইব। হিন্দু আজ বুক ভরিয়া এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। সেই আশায় সেই আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহিত হইয়া,আমরা এখন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, যত্ন করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি। কোন্ পথে চলিলে সে চেষ্টা, সে যত্ন, সে পরিশ্রম সফল হইবে, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিয়া রাখা চাই। প্রথম হইতে পথ ঠিক করা সকল কার্য্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি এবং এরূপ গুরুতর কার্য্যে তাহা নিতান্ত আবশ্যক। সকল কার্য্যই কষ্টসাধ্য। কিন্তু কষ্ট দুই রকমের। বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক রকম কষ্ট; ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরিশ্রম করা আর এক রকম কষ্ট। আমরা দেখিয়াছি যে স্থির হইয়া ঘরে বসিয়া হিন্দু অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন। বহু প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ কবিয়াছেন। অতএব এমন অনুমান করা যাইতে পারে, যে এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করা তাঁহার প্রকৃতিসঙ্গত এবং এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করিলেই যে উদ্দেশে কষ্টভোগ, তাহাতে তিনি বেশী সফলতা লাভ করিবেন। আমি এমন কথা বলি না, যে চিরকাল ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছেন বলিয়া হিন্দু আজ ঘরের বাহির হইয়া জ্ঞানসঞ্চয়ার্থ পৃথিবীর সকল স্থান এবং সকল পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবেন না। জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ আজি হইতে তাঁহাকে সেই প্রণালীতে কষ্টভোগ শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া পুরাতন

প্রকৃতিসঙ্গত প্রণালীটি যেন একেবারে উপেক্ষিত না হয়। দুইটি প্রণালীর মধ্যে সেই পুরাতন প্রণালীটিই উৎকৃষ্ট। যে হাটবাজার হইতে মাছ মাংস তরকারি প্রভৃতি আনিয়া দেয়, সে অনেকটা কাজ করে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে রন্ধনশালায় বসিয়া বসিয়া চুল্লীর উত্তাপে দগ্ধ হইয়া গাঢ় ধূমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া আহরিত দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহার শ্রমের মূল্য নাই, তাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ। সামান্য লোকের দ্বারা হাটবাজার হয়; প্রকৃত ওস্তাদ নহিলে রন্ধনকার্য্য হয় না। হিন্দু! যে ক্ষমতা থাকিলে মানুষ রন্ধনকার্য্যে কৃতকার্য্য হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে। আজিকার নূতন প্রণালীতে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা কর। তাহা না করিলে আজিকার দিনে চলিবে না। কিন্তু তোমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার যে অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, মনে থাকে যেন সে রকম চিত্র আর কাহারো ইতিহাস-পটে অঙ্কিত নাই। মনে রাখিয়া, এই চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রন্ধন-শালায় প্রধান রাঁধুনীর পদ তোমারই হয়—যেন অপর সমস্ত জাতি জগতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়া দেয়। তোমার ইতিহাস বলিতেছে, যে ইহাই তোমার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত—লক্ষ্যান্তর অনুসরণ করিলে বোধ হয় তুমি দিশাহারার ন্যায় সকল দিক হারাইবে! সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে অতীত যুগে তুমি যেমন পৃথিবীর আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ভবিষ্যযুগেও তেমনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কথায় প্রত্যয় না হয়, একটা প্রমাণ গ্রহণ কর। এত অধম, এত অবনত, এত অবসন্ন হইয়াও যে আজিকার নরবীর ইংরাজকে বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজয় করিয়া পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজাইতে পারিতেছ, সে কেবল তোমার পবিত্র পিতৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং অসাধারণ কষ্টভোগ শক্তির কণামাত্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া। লোকে আজ তোমার যে শক্তি দেখিয়া তোমাকে উপহাস করিতেছে, সে শক্তি না থাকিলে উন্নতি হয় না এবং সে শক্তি বাড়াইতে পারিলে লোকে একদিন অবশ্যই তোমাকে পৃথিবীর আর্য্য বলিয়া আবার পূজা করিবে।

নবজীবন।

(অশোকাষ্টমী নিশি—নদীতীরে—পিতৃ মাতৃ
শ্মশানস্থ শিবালয় সম্মুখে।)

১

জুড়াইল—
এত দিনে জুড়াইল হৃদয় আমার!
যে দারুণ পিপাসায়,
অৰ্দ্ধেক জীবন হায়,
দহিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার;
মধ্যম জীবনে প্রাণে,
বিধূমিত সে শ্মশানে,
আজি শান্তি বারি আহা হইল সঞ্চার,
জুড়াইল এত দিনে জীবন আমার!

২

বেড়াইনু কত তীর্থে—পিপাসা আকুল!
বঙ্গ সাগরের তীরে,
"চন্দ্র শেখরের" শিরে
স্বভাবের অভ্র-ভেদী সে বেদী অতুল!
ভূতলে হৃদয় রাখি,
দেখিছি, অচল আঁখি,
স্বভাবের শান্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমূল;
দেখিয়াছি শান্তিময় নীলাম্বু অকূল।

৩

নীলাম্বুর অন্য তীরে
যথা সুদর্শন শিরে
শোভিছে মন্দিরে—বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ—
বিকট মূরতিময়,
বিশ্বকর্ম্মা গুণত্রয়,
এক "ক্ষেত্রে" সমাবেশ—বিষ্ণু ভগবান!
দেখিয়াছি জগন্নাথ ত্রিনীতি নিদান।

৪

দেখেছি "ভুবনেশ্বরে" ভুবন ঈশ্বর;
মহাশক্তি ক্রীড়ান্বিতা,
সৃজয়িত্রী সৃজয়িতা
সৃজন সঙ্গমে রত, সৃষ্টি—চরাচর!
প্রকৃতি ও পুরুষের
অবিশ্রান্ত সঙ্গমের
মহামূর্ত্তি শিলাখণ্ড! গভীর কেমন,
অশ্রান্ত সে ক্রীড়া, আর অশ্রান্ত সৃজন।

৫

'বিরজার ক্ষেত্রে' সত্ত্ব, 'অর্ক ক্ষেত্রে' রজ,
তম মূর্ত্তি "যম ক্ষেত্রে,"
দেখিয়াছি জ্ঞান নেত্রে;
'শিব ক্ষেত্রে' সৃষ্টি—সত্ত্ব রজের সঙ্গমে;
"বিষ্ণু ক্ষেত্রে" স্থিতি তত্ত্ব,
তিনের মিলনে নিত্য
রহিয়াছে প্রকটিত; কি তত্ত্ব মহান্!
উৎকলের পঞ্চ ক্ষেত্রে আছে মূর্ত্তিমান!

জাতীয় জীবন বাহী জাহ্নবীর তীরে
দেখিয়াছি বারাণসী,
শরতের অর্দ্ধ শশী
ভাসমান ভাগিরথী বক্ষে মনোহর।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর
দেখিয়াছি কি সুন্দর,
সৃজন পালন মূর্ত্তি—কাশী পুণ্য ধাম!
কিন্তু কই, তাহে নাহি যুড়াইল প্রাণ।

৭

বসি বিন্ধ্যাচল শিরে,
গঙ্গার নির্ম্মল নীরে,
দেখেছি নির্ম্মলতার মূরতি সুন্দর।
প্রয়াগে সঙ্গম স্থলে,
শারদ গগন তলে,
দেখিয়াছি প্রকৃতির নিষ্কাম মিলন।
কি মাহাত্ম্য একতার করিছে কীর্ত্তন!

৮

অমর—অমৃত—নাই কে বলে ধরায়?
মথুরায় বৃন্দাবনে
দেখেছি অতৃপ্ত মনে,
অমর মানব রূপ—নর নারায়ণ!
পদ পরশনে যার,
যমুনা অমৃতাসার
বহিছে অনন্ত কাল; হয়েছে কেমন
অমৃত মণ্ডিত ক্ষুদ্র গিরি গোবর্দ্ধন।

৯

"রাজগৃহে" পঞ্চ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি,
কি গম্ভীরে যুগশত,
ঘোষিতেছে অবিরত—
"অমর মানব!" যার পুণ্য পদধূলি,
অর্দ্ধাধিক নরজাতি,
লভেছে মস্তক পাতি,
যাহার অমৃতময় মহাসাম্য গীত,
সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত।

১০

গঙ্গা সাগরের সেই অতুল সঙ্গম!
মহাসিন্ধু মহাকাল!
কি মূরতি সুবিশাল!
পবিত্রা জাহ্নবী—আর্য্য জাতীয় জীবন—
করিতেছে সিন্ধু সহ,
কত ক্রীড়া অহরহ,—
কি উচ্ছ্বাস, কি নিশ্বাস,
কি তরঙ্গ, অট্টহাস,
কি উত্থান, কি পতন, কি শান্তি, কি ঝড়!
আর্য্য অদৃষ্টের কিবা চিত্র ভয়ঙ্কর!

১১

এই ক্ষুদ্র নদী তীরে, এ ত্রিপাদ ভূমে,
পাতিয়া তাপিত বুক,
পাইলাম যেই সুখ,
যেই শান্তি, যেই প্রীতি, তৃপ্তি পিপাসার—
জুড়াইল এতদিনে হৃদয় আমার!

১২

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার!
এত দিনে বুঝিলাম,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ধরাধাম,
হইল না কেন ত্রিপাদের পরিমাণ।
তিন পদ কোন্ ছার,
একটি ধূলি ইহার,
ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন—
স্নেহের উপমা নাই, স্নেহ অতুলন!

১৩

এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার!
জনক জননী মম,—
জাহ্নবী যমুনা সম,
এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন,
এখানে অনন্ত সহ হইল মিলন।

১৪

হায় মাত বসুন্ধরে! খুলিয়া হৃদয়,
দেখাও যুগল মুখ,
সেই স্নেহ ভরা বুক,
সেই সরলতা, পর-দুঃখ কাতরতা,
সেই চির কোমলতা,
সেই চিত্ত মধুরতা,
সেই চিরপ্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার,
সেই দেব, সেই দেবী, উপাস্য আমার!

১৫

পাপী আমি! হায় মাতঃ দুরদৃষ্ট বশে
ছিলাম বিদেশে পড়ি
দুরাকাঙ্ক্ষা ভর করি
আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন।
বারেক জীবন তরে,
দেখিনি নয়ন ভ'রে
সেই মুখ; সেই বুকে—স্নেহের দর্পণ—
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন।
সে অভাব হৃদে সহি,
সে পিপাসা হৃদে বহি,
কত তীর্থ তীর্থান্তরে করিনু ভ্রমণ;
কই সে পিপাসা মম হলো না পূরণ!

১৬

উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা, উঠ একবার!
বলিত যে এ সংসার,—
"স্নেহে তুমি মা আমার,"
উঠ সেই স্নেহমুখ দেখি একবার!
ষোড়শ বৎসর পরে,
ভ্রমি দেশ দেশান্তরে,
আসিয়াছি গৃহে মুখ দেখিতে তোমার
ত্যজ নিদ্রা, উঠ বাবা, উঠ মা আমার!

১৭

'রোপিয়াছি আশালতা' বলিতে মায়েরে
দেখিলে না একবার
তব সে আশা লতার,
ফলিয়াছে কোন্ ফল? বিফল সকল,
একটিও পাইল না তব পদতল।

১৮

এই পরিতাপে হায় তাহার জীবন
হইয়াছে বিষময় ;
আহা ! প্রাণে নাহি সয়,—
একটি তণ্ডুল নাহি করিনু অর্পণ,
তোমাদের পদতলে,
পরিতাপে প্রাণ জ্বলে ;
কার তরে এ দাসত্ব করিনু বহন,
সহিলাম এত ঝড়, এত নির্যাতন ?

১৯

একে একে ভেসে গেল স্নেহের পুতুল।
দূর শূর নদী তীরে,
নিদ্রা যায় একটি রে !
দ্বিতীয় আমার চির-দুঃখ নিবারণ—
নিদ্রা যায় স্বর্গ দ্বারে,
অনন্ত জলধি পারে ;
সেই তীরজাত ক্ষুদ্র নীরেন্দ্র প্রসূন,
পদ্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র কুসুম।

২০

উঠ বাবা, স্নেহময়ী উঠ মা আমার,
বুলায়ে কোমল কর,
আমার হৃদয় পর,
জুড়াও জ্বলন্ত এই স্নেহের শ্মশান,
সংসারের শত অস্ত্রে ক্ষত এই প্রাণ।

২১

না ; না—এই ভূমি খণ্ড, ক্ষুদ্র পরিস
সে অনন্ত দয়া, সেই প্রশস্ত হৃদয়
কভু কি ধরিতে পারে ?
শুক্তি ধরে পারাবারে ?
অনন্তে অনন্ত আহা ! হয়েছে বিলীন
অশোক অষ্টমী নিশি,
হাসিতেছে দশ দিশি,
বাসন্তী চন্দ্রিকা করে ; হাসিছে সুন্দর
বাসন্তী চন্দ্রিকা স্নাত অনন্ত অম্বর।

২২

অনন্ত অম্বর পটে শত চন্দ্রোজ্জ্বল,
কিবা হর গৌরী রূপ,
শোভিতেছে অপরূপ,
জনক জননী মম একাঙ্গ সুন্দর !
কিবা সুপ্রসন্ন হাসি,
কি অনন্ত স্নেহরাশি,
ভাসিছে অধরে নেত্রে ! কি স্বর্গ সঞ্চার
করিতেছে ওই দৃষ্টি হৃদয়ে আমার !

২৩

শোভিতেছে অঙ্কে পঞ্চ প্রতিমা সুন্দর
কি সুখে সে স্বর্গোপর,
বিরাজিছে বাঁছা মোর,
গলায় গলায় সেই যুগ্ম প্রতিমার
ক্ষুদ্র পুষ্প সে বদন
চুম্বিছেন দুইজন

় আদরে অঙ্কস্থিত পুত্র কন্যাগণ
় আদরে সেই ফুল করিছে চুম্বন!

২৪

তোমাদের স্নেহ-সাধ মিটেনি ভূতলে।
তাই এই ফুলগুলি,
একে একে নিলে তুলি;
ন্য করি অপবিত্র অঙ্ক আমাদের
নিলে ওই ফুল মোর—
বড় ভাগ্য বাছা তোর,
যই স্নেহামৃত তুই করিস্ রে পান,
তার পিপাসায় দহে আমাদের প্রাণ।

২৫

আর কাঁদিব না। যেই অনন্তের সনে
মিশিয়াছ, সেই মহা অনন্ত স্বরূপ,—
অশোক অষ্টমী আজি,
ভক্তির তরঙ্গ রাজি
করিয়াছে মুহূর্ত্তেক অশোক অন্তর—
স্থাপিলাম সেই মূর্ত্তি শ্মশান উপর।

২৬

াপিলাম "গোপীশ্বর"—প্রকৃতি ঈশ্বর।
কাংস্য ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি,
কি পবিত্র স্রোতস্বিনী
বহে হুলুধ্বনি সহ রহিয়া রহিয়া!
কিবা ধ্যান সুধাময়,
সমীরণ পৃষ্ঠে বয়,
অগুরু চন্দন গন্ধে মাখিয়া শরীর,
—অনন্তের কিবা মূর্ত্তি, কি চিন্তা গভীর!

(ধ্যান)

"নমোহনন্ত স্বরূপাখ্যং নিষ্কলং
গুণগুম্ফিতম্।
"বিদ্যুৎপুঞ্জ সহস্রার্কং দ্বিভুজং
কান্তবিগ্রহম্।
"আদ্যন্ত মধ্য রহিতং ব্যাঘ্রাজিনাবৃত
কটিম্।
"কুপ্যদ্ভুজঙ্গ কোটীশং বরদাভয়
পাণিকম্।
"সাধকাভীষ্ট দাতারং কোটি
ব্রহ্মাদিভিস্তুতম্।
"নানারূপ ধরঞ্চোগ্রং ধ্যায়েচ্ছঙ্কর-
মব্যয়ম্।"

২৭

অনন্ত—স্বরূপ, আখ্যা, উভয় তোমার।
কলহীন গুণান্বিত;—
যদি হয় অলক্ষিত
জ্ঞানের নয়নে, তবে দেখাও তোমার
বিদ্যুৎপুঞ্জ ঝলসিত,
সহস্রার্ক প্রজ্বলিত,
সে ভীষণরূপ; তাহে ত্রাসিলে অন্তর,
দেখাও কৌমুদী মাখা মূরতি সুন্দর।

২৮

সৌন্দর্য্যে মোহিত যদি,দেখাও তখন—
আদি নাই, অন্ত নাই,
মধ্য কোথা নাহি পাই,

কি মহা বিরাট মূর্ত্তি নর জ্ঞানাতীত!
ভাবি তুমি বিশ্বপতি;
ব্যাঘ্রজিনাবৃত কটি
নিষ্কাম উদাসরূপ দেখাও তখন।
যাই যদি পাপ পথে,
দেখি আকাশের পটে
কুপিত-ভুজঙ্গ-কোটি-ঈশ্বর নির্দ্দয়;
পুণ্য পথে—দুই ভুজ বরদ অভয়!

২৯

ব্রহ্মাদি-দেবতা-কোটি-পূজিত দেখিয়া,
যদি ক্ষুদ্র নর ভ্রমে,
দূরলভ্য ভাবি মনে,
দেখি তুমি ইষ্টদাতা সর্ব্ব সাধকের;
তাহে হ'লে অহঙ্কার,
ধর নানা উগ্রাকার—
রোগ, শোক ঝড়, বজ্র; হইলে কাতর,
দেখি পূর্ণ শিবরূপ, অব্যয় শঙ্কর!

৩০

জুড়াইল—
এই ধ্যানে, পিতৃদেব, পূজিয়া তোমায়
কি যে শান্তি লভিলাম,
কি জীবন পাইলাম,
কি অমৃতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয়!
হৃদয়ের ক্ষত যত,
শান্ত তারাগণ মত;
হৃদয় তেমতি ওই সুনীল গগন—
শান্ত, স্থির, লভিলাম কি নবজীবন!

৩১

গাইছে জগত নবজীবনের গান।
জীমূতের পৃষ্ঠে চড়ি,
বিদ্যুৎ সাপটি ধরি,
ছুটেছে অনন্ত গর্ভে, গতি অবিশ্রাম;
হৃদয়েতে কি উচ্ছ্বাস,
কি ঝটিকা পূর্ব্ব-শ্বাস,
দুই পার্শ্বে দুই সখী—দর্শন বিজ্ঞান-
গাইছে পুরিয়া শূন্যে কি গভীর গান

৩২

গাইছে ভারত নবজীবনের গান।
মহা নিদ্রা অবসান,
সঞ্জীবনী সুধাদান
করিতেছে মহাকাল বসিয়া শিবিরে।
মহা নিদ্রা অবসান,
ধীরে ধীরে এক প্রাণ
করিতেছে ধীরে অনু-প্রাণিত শরীর
নবজীবনের শ্বাস বহিতেছে ধীর।

৩৩

পিতৃদেব!
শিখাও আমারে নব জীবনের গান।
অমর অক্ষরে লেখা,
দেখাও কর্ত্তব্য রেখা
আঁকিয়া আকাশ পটে; কর শক্তি[illegible]
সেই রেখা অনুসারি-
চরণে যাইতে পারি,
অন্তিমে চরণে তব পাই যেন স্থান,
পিতৃদেব!
শিখাও আমারে নবজীবনের গা[illegible]

নবীন

কুঞ্জ সরকার।

সকলেই বলিতেছেন কুঞ্জ সরকার ফুটিতেছে না, আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ভরাভাদ্রের দুর্দ্দিনের দুর্যোগ সময়ে, তুমি কোন্ কুঞ্জে কয়টা ফুল ফুটন্ত দেখিতে পাও? কৃষ্ণকলি জলপ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দোপাটির চারা ডাঁটাসার, পাপড়িগুলা মাটিতে পোঁত পড়িয়াছে; রজনীগন্ধ নববিধবার মত বিষণ্ণ শুভ্রচ্ছদে নতমুখে চোখের জলে মাটি ভিজাইতেছে; গোলাপের বৃন্তগুলি আছে, পাপড়ি নাই; রাশীকৃত কুন্দ কাদামাখা হইয়া অনাদরে তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের কুঞ্জ সরকারের সময়, রাঢ় অঞ্চলে এমনই দুর্য্যোগ; এমনই দুর্দ্দিন। তখন ললাটী, কপালী, নাক-কাটী, বিশালী, চোরচণ্ডী, রণঝণ্ডী, রঙ্কিণী, শঙ্কিনী প্রভৃতি দেবী মূর্ত্তি সকল দস্যুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়া জাগ্রত-ভাবে শীধু-মাংস-পশু-প্রিয়া নামের সার্থকতা করিতেছেন। তখন বাগ্‌দী ডোম চৌকিদারে দিনে দুপরে দীঘীর পাড়ে, হত্যা করে; দারোগার জমাদারের বক্‌সির নায়েব হিসাব করিয়া আপনার এবং উপরওয়ালার মাসোয়ারা গণ্ডা দস্যুদের স্থানে বুঝিয়া লয়। বিষ্ণুপুররাজের তিনশত ষাট শিবমন্দিরে তখন দস্যু দলই নিত্য অতিথি। তখন মন্দিরের পূজারি দস্যু, সেবক দস্যু, কামদার দস্যু, ভাণ্ডারী দস্যু। সরকার বাহাদুর শিপাহী পাঠাইয়া এই দস্যুতা নিবারণের উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্রমে বিষ্ণুপুরের উপর তাঁহাদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাটওয়ালি জমা একে একে বাজেয়াপ্ত হইতেছে; বিষ্ণুপুরকে বনবিষ্ণুপুর করিয়া মদনমোহন বাগবাজার আশ্রয় লইলেন। তাঁহার গুপ্ত বৃন্দাবন এরণ্ডবন হইতে লাগিল।

রাঢ়ের এমনই দুর্দ্দিনে কুঞ্জ সরকারের আবির্ভাব বা স্থিতিভাব। তখন লাঠির জোরে রাঢ় অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিয়াছিল, তাহার নাম গন্ধ আমাদের কুঞ্জ সরকারে নাই। আর তোমরা যাহাকে 'ফুটন্ত' বল তাহাও কুঞ্জ সরকারে নাই। যদি অলৌকিক শক্তির হঠাৎ আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া বিস্ময় রসে চক্ষু বিস্ফারিত করাই সহজ সাহিত্য পাঠের চরম আনন্দ বলিয়া তোমার ধারণা থাকে, তবে আমাদের কুঞ্জ সরকারে তাহা পাইবে না। তথাপি বলিয়া রাখি কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোক।

কুঞ্জ সরকার ক্ষণজন্মা বলিয়া একব্রতী কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, লোকে তাহাই বলিত; কিন্তু এত টুকু বলিতে পারি যে তিনি একব্রতী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। শাসনের সহিত শিক্ষাদানই কুঞ্জ সরকারের এক কার্য্য, এক ব্রত, এবং সমস্ত জীবন। তবে জীবন ধারণের জন্য দুই চারিটি নিত্য কর্ম্ম ছিল বটে।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর কুঞ্জ মহাশয় দরিয়া দীঘীতে স্নান করিতেন। স্নানের পর একবার, সেই ত্রিভাঁজ শরীর বক্র করিয়া সূর্য্য প্রণাম করিতেন; সেই তাঁহার একমাত্র প্রকাশ্য আহ্নিক। দিনান্তে একবারও সূর্য্যদেব দেখা দিলেন না, এমন হইলে, অবশ্য পাঠশাল বন্ধ থাকিত; কুঞ্জ মহাশয় সে দিন আহার করিতেন না। সেই জন্য লোকে আরও বিশ্বাস করিত, যে কুঞ্জ মহাশয় সূর্য্যোপাসক। স্নানের পর রন্ধন। পড়োরা যে দিন যাহা জোগাড় করিয়া দিবে, কুঞ্জ মহাশয় সে দিন তাহাই রন্ধন করিবেন। আহারের সঞ্চয় ভাণ্ড বা ভাণ্ডার কুঞ্জ মহাশয়ের ছিল না। তবে হাঁড়িতে দুটি পর্য্যুষিত অন্ন এবং তিজেলে একটু তেঁতুলের চাঁচি, বার মাসই তাঁহার থাকিত। আহারের পর তাঁহার 'কেলোকে' দুই থাবা অন্ন দিতেই হইবে। কেলো কুকুর, তাঁহার পুষ্যি পড়ো। কেলো কসিতে বা ঘুসিতে পারিত না বটে। কিন্তু মহাশয় তাঁহার সেই মহাভ্রূ একটু কাঁপাইয়া, সেই অধরোষ্ঠের দক্ষিণ কোণ একটু প্রসারণ করিয়া—একটু যেন গর্ব্বে, একটু যেন আহ্লাদে, বলিতেন "কেলো তরিবতে অনেক পড়োর চেয়ে ভাল।"

'নীতি' বা 'শিক্ষা' এই দুইটি কথা, গুরুমহাশয় চাণক্য শ্লোক পড়ানর সময় ছাড়া বোধ হয়, আর কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি বলিতেনও তরিবৎ; বুঝিতেনও তরিবৎ। পড়োর তরিবৎ ভাল হইলেই, সে মহাশয়ের পরম প্রিয় হইত। যখন এরূপ কোন ছাত্রকে তিরস্কার করিতেন, তখন বলিতেন 'সোদর গাধা।' যাদের তরিবৎ হয় নাই, তাহাদের বলিতেন "বাঁদর গাধা।" যে সকল বয়স্ক ছাত্র তরিবতে তাঁহার প্রিয়, তাহাদিগকে বামে লইয়া বসিতেন এবং উল্লাসের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। নৌকা আঁকিয়া ফাঁড়ে দীঘের মাপ বুঝাইতেন, 'ছাঁদে যত, বাঁধে তত' কথার অর্থ বলিয়া দিতেন। রাস মণ্ডলের চারি ধারে থাকে থাকে ষোলশ গোপিনী সাজাইয়া মধ্যে শ্রীমতীকে রাখিতেন। তাহার মধ্য হইতে থাক বদলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুইশত গোপিনী লইয়া নিধুবনে গেলেন, অথচ শ্রীমতী দেখিতেছেন,

যে সেই ষোলশ গোপিনী তাঁহার সম্মুখেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেম-রহস্যের গণিত-রহস্য কুঞ্জ মহাশয় ধীরে ধীরে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। সেই সময়, ছোট ছোট ছেলেরা একদিকে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জ খেলার' আর্য্যা বলিত।

দেখ, শ্রীরাস মণ্ডলে ছিল, ষোলশ গোপিনী।
মদনমোহন মাঝে, বামে বিনোদিনী॥
হেথা দুই শত সখী তাঁর পাইয়া ইঙ্গিত,
তমাল কুঞ্জের আড়ে যায় আচম্বিত।
রাইকে, মদনমোহন বলে বচন মধুর,
ডেকেছে আমারে মধু মঙ্গল ঠাকুর।
আমি, ঝটিতি আসিব ফিরে সাঙ্গাতি শুনিয়ে,
যেখানেতে যত সখী দেখহ গণিয়ে।
তখন, দলে দলে রাখি সখী রাধিকা গণিল,
চৌদিকে চৌশত দেখি ষোলশ বুঝিল।
হেথা বুঝিয়া লইল রাই সব সখী গণে;
দুই শত লয়ে কানু গেল নিধুবনে।
হোথা কুঞ্জ খেলে গোপীচুরি লীলা চমৎকার।
কুঞ্জ খেল ভেঙ্গে দিল কুঞ্জ সরকার॥

এখনও তোমরা বেশ মুচ্‌কি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেছ,—কুঞ্জ সরকার ফুটিল না,—তবে তোমাদেরই জিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে, কোন্ ছাঁদে, কোন্ ভাষায় কুঞ্জ-সরকারকে ফুটাই বল দেখি ?

কুঞ্জ সরকার, সরোবরের কমলিনী নহে; যে ধীর-মলয়-সমীর-সঞ্চারে, গুঞ্জন্মত্ত-মধুব্রতের ঝঙ্কারে, প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণে,ধীরে, ধীরে,তাহাকে ফুটাইতে থাকিব; সরোবরের ঘাটও নহে;—যে আগ্রীব-নিমজ্জিতা অর্দ্ধাবগুণ্ঠন-গুণ্ঠিতা, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, ষোড়শী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার চাঁদের হাট ঘাটে আনিয়া বাপীকুল প্রস্ফুটিত করিব। জল ছাড়িয়া স্থলে চল;—কুঞ্জ সরকার বেলি চামেলি নহে; যে শ্বেত শোভায় হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যা-সমীরণে দুলিতে দুলিতে,—ফুটিয়া উঠিবে। রাজ পথের ধারের দ্বিতল ভবনের বিস্তৃত গবাক্ষ নহে; যে কোলের ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া, উনুনের হাঁড়ি আধ-সিদ্ধ নামাইয়া, মুক্ত-বেণী, যুক্ত-বেণী, যুবতীগণকে ঘোমটা খুলিয়া, লজ্জা উড়াইয়া,

দলে দলে আনিয়া দিব; আর শতদলে উৎপল ফুটিতে থাকিবে। স্থল ছাড়িয়া অন্তরীক্ষে। কুঞ্জ সরকার আকাশের রাঙ্গা মেঘে ভাঙ্গা রোদের খেলা নহে; যে পশ্চিম দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া রাশি রাশি শিমুল, পারুল ফুটাইব। সাগরতীরের সন্ধ্যাকালের নক্ষত্র নহে, যে একটি করিয়া মিটি মিটি, সরমের দিঠির মত, সেজুতির দেউটির মত, নীরবে ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার সীতাকুণ্ডের জল নয়, যে টগ্‌বগ্ করিয়া,—তুবড়ির বাজী নহে, যে, ফর্ ফর্ করিয়া,—ফুটিয়া উঠিবে।

কিন্তু মানুষত ফুটিয়া উঠে? কুঞ্জ সরকার কেন সেই রূপেই ফুটুক না? তাহাও অসম্ভব। কুঞ্জ সরকার স্বামী সমীপে প্রথম সমাগতা, নব-বিবাহিতা তরুণী নহে; যে দুরু দুরু বুকে, অবনত মুখে, ধীরে ধীরে বসিয়া, লীলা হেলায় বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে, সরমের আঁখি, মরমের সখার দিকে উন্মীলিত করিতে করিতে, বনান্তরালের বন-মল্লিকার মত মৃদু মৃদু ফুটিতে থাকিবে। কুঞ্জ সরকার বাগ্বিদ্যাবিশারদ বাগ্মী নহে; যে বঙ্গবাসিনী ব্যভিচারিণীর উপর সমাজের বিপুল যাতনা বর্ণন করিয়া, হিন্দু জাতির তুষানল ব্যবস্থা করত, হিন্দু শাস্ত্র সকলকে কলিকাতার কসাই টোলার চীনাম্যানদের বিপণিতে উপানতের আবরণ উপকরণে পরিণত করিয়া, চোগা দোলাইয়া, বক্ষ ফুলাইয়া, দক্ষিণে হেলিয়া, ঊর্দ্ধ হস্তে, লম্বকণ্ঠে, বালক যুবকের খর করতালে, দুলিতে দুলিতে উৎকট বিকট ভাবে ফুটিতে থাকিবে। না কুঞ্জ সরকারকে নীরবে, সরবে, গৌরবে, সৌরভে—কোন রূপেই ফুটাইতে পারিতেছি না।

ব্যক্তিবিশেষও বায়ুবিশেষে ফুটিয়া থাকে। ডফ্ ফুটিলেন, হেমনাথ বসুর পালায়; ফীয়ার ফুটিলেন, কালী বন্দ্যোর জ্বালায়। বীডন ফুটিলেন, মহামারীর কটকে; ইডেন ফুটিলেন, পাদরিণীর চটকে। নরেশ ফুটিলেন, শালগ্রামে; রমেশ ফুটিলেন গুণগ্রামে। যতীন্দ্র ফুটিলেন ৯ আইনে; সুরেন্দ্র ফুটিলেন বে-আইনে। শিবপ্রসাদ ফুটিলেন কৃতাঞ্জলিতে; ভূদেব ফুটিলেন পুষ্পাঞ্জলিতে। টম্‌সন্ ফুটিলেন ফিরিঙ্গি নাটে; রীপণ ফুটিলেন, কঙ্করডাটে। কিন্তু এরূপ ফুটনওত কুঞ্জ সরকারের ঘটিবে না।

আর ফুটাইবার যে ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মার বরেই হউক, আর দুর্ব্বাসার শাপেই হউক, ঐ দুইটার মধ্যে একটা কারণ অবশ্য হইবে, কুঞ্জ সরকারে তাহা খাটে না। ফুটনকারিণী রমণীগণের সহিত কুঞ্জ সরকারের চির বিরোধ, স্থায়ী বিরোধ; এবং সুমেরু কুমেরু ভেদ। অভাগা কুঞ্জ মহাশয়কে ফুটান

হাদায়। রূপ থাকুক, আর নাই থাকুক, যদি একজন যেমন তেমনও
বতী সরকারিণী—আনিয়া অর্দ্ধ রাত্রে বীজনী হস্তে কুঞ্জ সরকারের পাশে
সাইয়া, বলাইতাম "তুমিত রহিলে পড়োর পাল লয়ে, এখন মেয়ের বিয়েব
ক হবে বল দেখি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, বিরাজকে যে আর রাখা যায়
া;" আর আমরা সেই সময়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পট তুলিতে পারিতাম,
বে দেখিতে কুঞ্জ সরকার ফুটিত কি না ফুটিত?

তাও না হইয়া যদি মহাশয়কে, কলির সত্যবান করিয়া একজন সাবিত্রী
ানিয়া প্রান্তরস্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পশুপতি সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী
তুর্দ্দশীর পালার উদ্যোগ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, ফুটুক আর না
টুক, ফুটিবার বাতাস ত লাগিত। যদি সেদিকেব পন্থা থাকিত, তবে ঐ
হৎ রাঢ় অঞ্চলে, তেমন ডাঁট খাট না হউক, একটা ভাঙ্গাচুরা গিরিজায়া
ানিয়াও কি সেই কোমল হস্তের সাময়িক সম্মার্জ্জনীর অবতারণা করিয়া
ঞ্জ সরকারকে একরূপ দিগ্বিজয় ফুটন ফুটাইতে পারিতাম না? না, সে
ক্ষিণ দিকের মলয় বাতাসের পন্থা গুরু মহাশয়ের আটচালায় নাই। আমা-
ের কুঞ্জ সরকার ফুটিবে না, নাই ফুটিল। তোমরা কিছু সত্য সত্য বয়সের
য়ে সলমনের কীর্ত্তি প্রয়াসী নহ, তবে আধ-ফুটন্ত তাচ্ছিল্য করিবে কেন?

হনুমান চরিত।

বৃন্দাবন মথুরার যমুনা কিনারে
দলে দলে ফিরে হনুমান;
ঘাটে ঘাটে থানা দিয়া, থাকে পথ আগুলিয়া
বাহির করিয়া দন্ত বিকট আকারে,
দেখি ভয়ে উড়ে যায় প্রাণ।

তুলিয়া লাঙ্গুল কেহ ভ্রমে ইতস্তত
শান্ত শিষ্ট বিজ্ঞের মতন;
নষ্টবুদ্ধি দুষ্ট খল, যুবক শাবক দল,
মারামারি কিলোকিলি করে অবিরত;
নাহি ডরে না মানে বারণ।

পাগল করিয়া তোলে তীর্থ-যাত্রিগণে,
হাতের সামগ্রী কাড়ি খায়;
লয়ে ছাতা জুতা ছড়ি, গাছের উপরে চড়ি,
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ যাত্রিদের সনে;
ব্যস্ত সবে বানরের দায়।

তাহাদের অত্যাচার করি দরশন,
মথুরার রক্ষ সৈন্য যত
ব্রহ্মাস্ত্রে পূরিয়া গুলি, মারিল কতক গুলি,
কাহার লাঙ্গুল কাণ করিল কর্ত্তন;
ধরে লয়ে গেল শত শত।

উঠিল তাহাতে গোল, ক্রন্দনের মহারোল;
হাহাকার বানব সমাজে;
কেহবা রাগের ভরে, দন্ত কিড়ি মিড়ি করে,
কেহ লম্ফ দেয় মাঝে মাঝে।

সবে মিলে গালি পাড়ে, বকে আর মাথা নাড়ে,
রাগে যেন পাগলের প্রায়;
হুঙ্কার গর্জ্জন করি, ভীম গদা হাতে ধরি,
মার মার রবে কেহ ধায়।

ফুলাইয়া বীর দেহ, চেঁচাইয়া বলে কেহ,
"কার সাধ্য আমাদের মারে!
সাজ সবে সাজ রণে, মার রক্ষ সৈন্য গণে,
তাড়াইয়া দেও সিন্ধু পারে।

কেন পর অধিকারে, আসে তারা বারে বারে,
কেন করে গুলি বরষণ?
আমরা রামের চর, নহি পরাধীন নর,
রাক্ষসের মানি না শাসন।"

শুনি তার মুখে জ্বলন্ত বচন
উঠিল জ্বলিয়া শাখামৃগগণ,

ঘোর আস্ফালন,　　মহা আন্দোলন,
কোলাহলে কর্ণ ফাটে;
জয় জয় রাম বলিয়া সকলে,
বাহির হইল সাজি দলে বলে,
জ্বলি ক্রোধানলে,　　নানা কথা বলে
বসি যমুনার ঘাটে।

এমন সময় জনেক সুধীর,
অঙ্গদ নামেতে কোন মহাবীর
কহে মৃদু স্বরে,　　কৃতাঞ্জলি করে,
দাঁড়াইয়া সভাস্থলে;
"শুন ভাই সবে, ক্ষান্ত হও রণে,
করিও না দ্বন্দ্ব রাক্ষসের সনে,
মোরা রাম ভক্ত,　　ধর্ম্ম অনুরক্ত
জানে সবে ভূমণ্ডলে।

পরম ভকত পবন-নন্দন
যাঁহার প্রতাপে কাঁপিত ভুবন,
আমরা বানর,　　তাঁরি বংশধর,
নাহি জানি হিংসা দ্বেষ;
ফলাহার পুণ্যে কাটি মায়াজাল
ধর্ম্মপথে সুখে রব চির কাল,
হয়ে ক্ষমাশীল,　　প্রেমিক সুশীল,
করিব জীবন শেষ।"

জাম্বুবান নামে যুবক জনেক লম্ব-লেজ দন্তমান;
তাহার বচন শুনিয়া অমনি হইল দণ্ডায়মান।
করি বক্র গ্রীবা প্রসারিত বক্ষ, খাড়া করি দুই কাণ;
কহে রোষভরে তুলি দুই বাহু আছাড়ি লাঙ্গুল খান।
"কেন হব মোরা রাক্ষস-অধীন পরিহরি আত্মাদর;
কিসের ভাবনা? কারে এত ভয়? নহি মোরা ভীরু নর?
আমাদের কুলে লইয়া জনম রাক্ষস হইল যারা;
বৃদ্ধ পিতামহ আত্মীয় স্বজনে নাহি মানে এবে তারা।
বানর পুরাণে ডারুইন ঋষি লিখিয়াছে যে বারতা;
হায় রে কপাল! হবে কি সে সব, কেবল কথার কথা।

বনের বানর হইয়া আমরা রহিব কি চিরকাল ?
যারা আমাদের নাতিপুতি জাতি তারা হবে মহীপাল ?
স্বজাতির দুঃখ করিব মোচন রাক্ষসে করিব দূর ;
ত্রেতার মতন সাগর লঙ্ঘিয়া যাব আমি লঙ্কাপুর।
বিভীষণে গিয়া বিনয়ে জানাব রাক্ষস-রীতির কথা ;
তিনি রামভক্ত ন্যায়-অনুরক্ত অবশ্য ঘুচাবে ব্যথা।"
এতেক কহিয়া বাহিরিল যুবা সাহসে করিয়া ভর ;
উত্তরিল গিয়া সেতুবন্ধ পারে সেই সিংহল নগর।
স্বর্ণপুরী শোভা দেউল দেউটি দেখিয়া হরিল জ্ঞান,
ভুলি বৃন্দাবন আপন ভাবনা ভাবিল করিল ধ্যান।
কালা মুখে চুণ মাখিয়া নিপুণ ঢাকিল বানর ছাঁদ,
রাক্ষসের বিদ্যা শিখিতে লাগিল ঘুচাতে বানর-বাদ।
শিখিয়া তথায় রাক্ষসের ঠাট বাঁধিলেক চূড়া ধড়া ;
রাক্ষসি ভোজনে রাক্ষসি বসনে হইল মেজাজ চড়া।
খেতো পাতালতা ছোলা কলা শশা জাতির প্রথার মত ;
ছাড়িয়া সে সব হইল এখন মদিরা গোমাংসে রত।
স্বদেশের রীতি স্বদেশের নীতি রহিল না কিছু আর ;
সকলি ফিরিল, কিন্তু কোন মতে ফিরিল না মতি তার।
ধরি নববেশ নবীন আকার দেশে এল জাম্বুবান ;
নাহি আর ভয়, বানর সমাজ পাইবে এবার ত্রাণ।
আসি বৃন্দাবনে লাগিল ছাড়িতে নব নব উপদেশ ;
বানর বানরী ভয়ে সশঙ্কিত দেখি তার নব বেশ।
রাক্ষস মতন আকার প্রকার করি সবে দরশন ;
ভাবিল মনেতে করিবে আবার গোলাগুলি বরিষণ।
বানর কটক তুলিয়া লাঙ্গুল পলাইল উভরড়ে ;
সেই গণ্ডগোলে পশিল রাক্ষস হাহাকার ধ্বনি পড়ে।
হেরে জাম্বুবানে বানর-রাক্ষস রাক্ষসের হর্ষ অতি,
শিকলে বাঁধিল মঞ্চে বসাইল জাম্বুবান হৃষ্ট মতি।
বানর-রচিত বানর চরিত বানরে শুনিল যবে,
হাসে খিলি খিলি, করে কিলোকিলি বানরে বানরে তবে।

নবজীবন।

১ম ভাগ। } আশ্বিন। ১২৯১। { ৩য় সংখ্যা।

ব্রততত্ত্ব।

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম। অর্থাৎ যে রূপ নিয়ম স্বেচ্ছাক্রমে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়। রাজাজ্ঞা, গুরুজনের আদেশ কিম্বা নৈসর্গিক নিয়ম, ব্রত পদে বাচ্য নহে। এই সকল নিয়মও ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে স্বেচ্ছা কি স্বানুবর্ত্তিতার স্থল নাই; এই নিমিত্তে তাহাতে স্বভাবত কোন ব্রত পালন হয় না। এই প্রবন্ধে কোন ব্রত বিশেষের কথা নাই; নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী হউক কিম্বা জীবনব্যাপী হউক সকলব্রতেরই সাধারণ লক্ষণ কএকটির সমালোচনা করা যাইবে। ভরসা করি ঐ সকল লক্ষণ অনুসারে শাস্ত্রোক্ত বিধানের সারবত্তাও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কি উদ্দেশে ব্রত করা কর্ত্তব্য, করিলে কি ফলোদয় হইতে পারে এবং ইহার জন্য কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই সকল কথা, সমাজ, সুখ এবং নিয়ম নামক তিনটি বিভাগে প্রদর্শিত হইবে। প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে সমাজ সংক্রান্ত নৈসর্গিক নিয়মানুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের একটি নিয়ম, পরার্থপরতা। দ্বিতীয়ত দেখিবেন যে ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুসারে সুখ সাধনের নিয়ম বিভিন্ন; ব্যক্তিগণ পরার্থপরতা বিহীন না হইয়াও অপেক্ষাকৃত প্রবলতররূপে স্বার্থপরতারই বশবর্ত্তী হন। অনন্তর এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে যে এই স্বাভাবিক বৈষম্য নিবারণের সদুপায় কি? পরিশেষে প্রদর্শিত হইবে যে প্রস্তাবিত সদুপায় অর্থাৎ কর্ত্তব্যপালন ও সুখ সাধন বিধির একমাত্র সমবায়ী ব্যবস্থা—ব্রত। হিন্দুধর্ম্মানুসারে প্রথমত যাগ—পরে যোগ, অনন্তর পূজা, ধ্যান ও জপের বিধান করিয়া সর্ব্বশেষে ব্রতের নিয়ম

প্রচলিত হইয়াছে। অতএব ব্রতগুলি ঘৃণিত অবলাগণেরই উপযুক্ত মনে না করিয়া উহার সার মর্ম্ম উপলব্ধি করাই যুক্তি সঙ্গত।

৯। সমাজ।

মানুষ লোকালয়ে ভিন্ন বাস করিতে পারে না; করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। লোকালয়, কেবল লোক এবং আলয়ের সংযোগ নহে। আলয় শব্দ গৃহ, নগর, রাজ্য, পৃথিবী আদি নানা জড় পদার্থের বাচ্য বটে; এবং লোক শব্দও মনুষ্যের বহুত্ব জ্ঞাপক বটে। কিন্তু লোকালয়ে লোকের আলয় ছাড়া আর কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হইবে। লোকালয়ে মনুষ্য পরস্পরার সম্বন্ধ বিশেষ, এবং সম্বদ্ধ মনুষ্যাদির সহিত আলয় বিশেষের সংযোগ—এই অতিরিক্ত বিষয় গুলি উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলত একাধিক মনুষ্যের অসম্বদ্ধ অবস্থা কিরূপ তাহা মনে না করিলে তদিতর সমাজ নামক সম্বদ্ধ-মনুষ্য জ্ঞাপক পদার্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এখানে অগত্যা কেবল সম্বদ্ধ মনুষ্যের আলয়েরই আলোচনা করা যাইবে; অসম্বদ্ধ মনুষ্য সমূহের আলয় কিরূপ হইতে পারে তাহা পাঠক মনে মনে চিন্তা করিয়া বুঝিবেন।

উপরে লোকালয় শব্দে সম্বদ্ধ বিশিষ্ট বহু ব্যক্তির আলয় বলিয়া ব্যক্ত করা গিয়াছে। বস্তুত ইহাতে আরো কএকটি কথা লক্ষিত হইবে। একাধিক ব্যক্তির সম্বদ্ধ-বিশেষ দ্বারা পরিবার সৃজন হয়, লোকালয় আবার সেইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট পরিবার সমূহের সমাবেশ। সমিতি নামক সম্বদ্ধ ব্যক্তিগণ সমাজ পদে বাচ্য বটে কিন্তু কেবল সমিতি হইতে লোকালয় সংস্থাপন হয় না। লোকালয় বুঝিবার জন্য পরিবার নামক পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং পরিবার কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার জন্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত দম্পতি আদি সমাজ-শরীরের নমুনা পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

জীব জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন; জীবের বর্দ্ধন, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, জড় পদার্থের তাহা নাই। তদ্ভিন্ন জীবমিথুন হইতে জীবের উদ্ভব এবং সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই স্থলেই প্রথমত সংযুক্ত জীবের সূচনা দৃষ্ট হইতেছে। সন্ধিনী * শব্দ সচরাচর প্রচলিত নাই কিন্তু উহাতে জীবমিথুনের সংযো

* সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি। ইত্যাদি।
চৈতন্য চরিতামৃত। মধ্যম খণ্ড। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বং গর্ভ ও ভ্রূণের সংযোগ—এই দ্বিবিধ সন্ধির শক্তি ব্যক্ত করে। এই
ক্তি ব্যতিত জীবের সত্তা থাকে না। কিন্তু সন্ধিনীশক্তির ক্রিয়াদ্বয় উভয়ই
ীবধর্ম্মাক্রান্ত অর্থাৎ মনুষ্যধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। গর্ভস্থ সন্তান জীবধর্ম্মানুসারে
াতৃদেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ পৃথক ভাব অবলম্বন করিতে থাকে। কিন্তু
নুষ্য এই পার্থক্য সত্বেও অন্যান্য কারণ সহযোগে মাতার সহিত ক্রমশ বরং
ঢ়তর সম্বন্ধেই সংযুক্ত হইয়া থাকেন, এমন কি জগদীশ্বরীর সহিত যথা-
াগ্য সামীপ্য প্রকাশ স্থলে তাঁহার প্রতি মাতৃ সম্বোধন অপেক্ষা আর কিছুই
পযুক্ত মনে হয় না। ইহাতে বুঝা যাইবে, জীবমিথুন যে জীবধর্ম্ম পালন
রে, মনুষ্য তাহার উপরে অন্যবিধ গ্রন্থি স্থাপন দ্বারাই এক অপূর্ব্ব ভাবের
ত্রপাত করেন।

ফলত দম্পতির স্থায়ী সম্বন্ধ হইতেই পতি-পত্নীর সমাজ, আর সন্তান ও জন-
ীর স্থায়ী সম্বন্ধের উপর জনয়িতার সংগ্রহ হইলেই পরিবারের সৃষ্টি হয়। স্ত্রী-
ুরুষ যে সংকল্প করিয়া এই সকল সম্বন্ধ সংঘটন করেন, তাহারই নাম বিবাহ।
রিবারে জীবধর্ম্ম সমস্তই বিদ্যমান থাকে কিন্তু তদতিরিক্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট
য়ম আশ্রয় করে; এবং সেই সকল নিয়ম এমন মনুষ্যত্বজনক, যে তাহা সমগ্র
বধর্ম্মকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতে পারে। বানপ্রস্থ তাপস তাপসী বিবাহ
ন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। পোষ্যপুত্র দত্তক
হীতার সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে জীবধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ঔরস-পুত্রের অভাব
াচন করেন। এতদ্ভিন্ন একটি অভিনব ইউরোপীয় মত প্রচার হইয়াছে
দনুসারে যাঁহারা রোগ বা দৈন্য হেতু সন্তান উৎপাদনের অযোগ্য
াহারাও চির ব্রহ্মচর্য্য সংকল্প করিয়া বিবাহ করিতে পারেন, এবং পোষ্যপুত্র
পোষ্য পুত্রীর দ্বারা এমন পরিবার রচনা করিতে পারেন যে, তাহাতে জীব-
র্ম্মের সংস্পর্শ এককালে অন্তর্হিত না হউক, নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে।
ই সকল কথা সবিস্তর চিন্তা করিলে জীবমিথুন এবং নরপরিবারের মধ্যে
তর বিশেষ কি তাহা ব্যক্ত হইবে। যাঁহারা পারিবারিক বিধান মধ্যে
ই বিভিন্ন লক্ষণ কিছুমাত্র দেখেন নাই কিম্বা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কিছুমাত্র
ভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই; তাঁহাদিগের সমীপে বেশি কথা বলা বিফল।

অনন্তর পাঠক দেখিবেন, যে কেবল স্ত্রী-পুরুষ এবং সন্তান এই
ন বস্তু লইয়াই পরিবারের সংগঠন হয় না। আমি এখানে একান্নবর্ত্তী
রিবার বা সপিণ্ডবর্গের কথা তুলিব না। কিন্তু প্রতি পরিবার মধ্যে

একটি বংশানুক্রম আছে, তাহা বিভিন্ন বিষয়। যে কোন পরিবা
বল তাহার একজন আদিপুরুষ ধরিয়া বংশনাশ হইবার সী
পর্য্যন্ত গণনা করিলে যতগুলি মনুষ্য হয় তাহাদিগেরও এক সম্ব
অবস্থা আছে। এই সম্বন্ধ অবস্থা একবস্তু, এবং তাহার অন্তর্গত পুরু
পর্য্যায় অপর একবস্তু; আর যে প্রণালি দ্বারা এই দ্বিবিধ বস্তুর ক্রমসাধ
হয়, যাহা দ্বারা ঐ সকল পুরুষ পরম্পরার সম্বন্ধ প্রতিপালিত হয়, তাহা আ
এক পদার্থ। আমি সেই প্রণালিকে বংশানুক্রম বলিতেছি। পরিবারস্থি
ব্যক্তিগণ জীবিতাবস্থাতে যে সম্বন্ধ ধারণ করেন, আর তাঁহাদিগের পুরুষানু
ক্রম দ্বারা যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এই দুটি বিভিন্ন সম্বন্ধ। ইহার মধ্যে বিস্ত
বৈলক্ষণ্য আছে। একটিতে মনুষ্যের জমাট ভাব জন্মে আর একটি প্রণালি
দ্বারা জমাট মানুষ কাল প্রবাহে সন্তরণ করে। করিয়া, আর এক প্রকা
সংযুক্ত রূপ ধারণ করে। একটি সম্বন্ধ মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে, আর একটি
দ্বারা মনুষ্য মৃত্যুকে পরাজয় করে। পরিবারাশ্রিত জমাট-ব্যক্তিগণে
বিয়োগ দ্বারা পরিবার বিনষ্ট হয় না; কেন না এক পুরুষের পরে পুরু
ষান্তর আবির্ভূত হয়। কেবল বংশাভাব হইলে পরিবারের জীবন বিলু
হয়। অতএব পরিবারের জীবন অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। আর পোষ
পুত্রের প্রকরণ অবলম্বন স্থলে উহা অনন্তব্যাপী বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি
হয় না। কিন্তু সমাজ-জীবনে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় রূপে ব্যা
হইয়া থাকে।

জন্ম, বর্দ্ধন, জনন, ক্ষয়, মৃত্যু এই কএকটি বিষয় মধ্যে জীবধর্ম্ম এ
মনুষ্য ধর্ম্মের যে ভেদ আছে তাহা প্রদর্শিত হইল। পরিবার-শরীরে তদ্ভি
আরও কএকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইবে। নরমিথুন জীবধর্ম্ম পালনান্তে
যে সংযুক্ত থাকে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহায্য। ইহ
সমাজ-শরীরের মূলীভূত কথা। এবং ইহাতেই আবার সামীপ্য সাযুজ্য আ
গুরুতর কথার সূচনা হইয়া থাকে। মনুষ্য জীবের ন্যায় আহার করে, কি
সকল জীব মনুষ্যের ন্যায় খাদ্য আহরণ করে না। মনুষ্যর আর একটি বিশে
ধর্ম্ম এই যে দেহ আচ্ছাদনের উপায় না করিলে চলে না। আর কেবল গ্রাস
চ্ছাদন নহে; দিবা রাত্রি এবং ঋতুপরিবর্ত্তন বিষয়ক সমস্ত নৈসর্গিক নিয়ে
জ্ঞানার্জ্জন এবং সেই জ্ঞানের উপযোগী ব্যবস্থা করাই মনুষ্যবর্গের প্রধ
কার্য্য। পরিবার রূপ সমাজ এই সকল কার্য্যের অনুরোধে আবদ্ধ থাকিয়া

সংস্থাপন করে। কিন্তু কেবল গৃহদ্বারা সকল প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয় না। এইজন্য নানা পরিবার একত্রিত হইয়া নগর ও রাজ্য ইত্যাদি লোকালয় সংস্থাপন করে। অতএব পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে সম্বন্ধ মনুষ্য, জীব এবং ব্যক্তি হইতে কত বিভিন্ন। এই সকল পদার্থের পর্য্যায়গুলি উত্তম রূপে উপলব্ধ না হইলে ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য বিধান নির্ণয় করা অসাধ্য।

ইদানিন্তন সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা হেতু নগর রাজ্যাদি সংক্রান্ত নানা কথাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রণালি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রণালীতে সর্ব্বাগ্রে পারিবারিক সমাজের মর্ম্মগ্রহ হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন নগর রাজ্যাদি বৃহত্তর সমাজের বিধান হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। মনুষ্য যদি কেবল পারিবারিক সমাজ দ্বারা স্বকীয় কার্য্য সমস্ত উদ্ধার করিতে পারিত,তাহা হইলে নগর বা রাজ্যের আবশ্যকতা থাকিত না। ফলত প্রথমত পারিবারিক নিয়মে সমাজ স্থাপন করিতে গিয়াই একান্নবর্ত্তী পরিবার, সপিণ্ড, জ্ঞাতি, গোত্র এবং গ্রাম আদি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য সামাজিক অভাব ব্যক্ত হইয়া অন্যবিধ সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। এসকল বিষয়ে সম্যক আলোচনার স্থান নাই। তবে চিন্তার সন্ধি প্রদর্শনার্থ কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। বংশবৃদ্ধি সহকারে পরিবারের ভেদ ও সাধারণত আজ্ঞাদাতা আজ্ঞাকারীর সম্বন্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট এবং সমান এই ত্রিবিধ অঙ্গ স্থাপিত হয়। তদ্ভিন্ন ঐ সূত্রে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে, আবার ভাষার বিস্তার হেতু বিভিন্ন পরিবারের সমাগম হয়। চতুর্থত মনুষ্য পরম্পরার সহযোগ হেতু উপজীবিকার প্রভেদ হইয়া থাকে। আদিম অবস্থায় কখন মৃগয়া কখন পশুপালন এবং কখন বা সামান্য কৃষি কার্য্য দ্বারা নর সমাজের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অগ্রে বল পূর্ব্বক অপহরণ এবং তদনন্তর শ্রমই মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন হয়। আর কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে শিখিলে পরে শ্রমজাত শিল্পাদির উদ্ভব এবং বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়। সমাজ শরীরের পরিবর্দ্ধন বলিতে প্রধানত উল্লিখিত ভেদ ও পরিবর্ত্তন সমূহ বুঝিতে হইবে। নতুবা পারিবারিক ধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খলতা হেতু মনুষ্য জাতির মধ্যে যে বংশ বৃদ্ধি হয় তাহা দ্বারা সমাজশরীরের প্রকৃত পরিবর্দ্ধন হয় না। সে যাহা হউক, আর একটি পদার্থ দ্বারা সমাজশরীর পারিবারিক সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া লোকালয় নামে অবতীর্ণ হয়। সেই পদার্থ—গমনাগমনের উপায় বিশিষ্ট

ধরা-পৃষ্ঠ—অর্থাৎ নগর। নগর ব্যতীত প্রকৃত লোকালয়ের উৎপত্তি হয় না উর্দ্ধপক্ষে উহা কেবল বৃহদাকার পরিবার মাত্র হইয়া থাকে। যেমন ভাষা দ্বারা মনুষ্যগণ পরস্পরের মন আয়ত্ত করে, সেইরূপ নদী এবং বর্ত্মাদির দ্বারা বিভিন্ন পরিবারের সমাগম সুসিদ্ধ হয়। আর ভাষা দ্বারা এবং শ্রমশোভিত আলয় সংযোগে মনুষ্যের জমাট ভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই উপায় দ্বারাই আবার সমাজশরীর অবিচ্ছিন্নরূপে কালব্যাপী হইতে থাকে। অনন্তর এই সঙ্গে রেলরোড ও তাড়িত বার্ত্তাবহের কথা চিন্তা করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, লোকালয়ে পরস্পরের সামীপ্য সাধন কি মহৎ কার্য্য এবং উহার সহিত সমাজশরীরের পরিবর্দ্ধন আর সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কেমন সংসৃষ্ট।

এত বাহুল্য কথাতে কেবল এইমাত্র প্রদর্শন করিলাম যে, অন্য জীব এবং মনুষ্য মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, মনুষ্য এবং সমাজ মধ্যে আর সমাজান্তর্গত পরিবার, নগর এবং রাজ্য মধ্যেও তদনুরূপ ইতরবিশেষ মানিতে হইবে। (কেহ কেহ এপর্য্যন্তও বলেন যে রাজ্য পরম্পরা কোন প্রকারে সুসম্বদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে সমগ্র মনুষ্যবর্গের একত্ব সংস্থাপন হইতে পারিবে।) ফলত প্রাগুক্ত বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন নিয়ম অবগত হওয়া আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ কি কি নিয়মের বশবর্ত্তী তাহা বোধগম্য হইতে পারে না। পরন্তু নানাবিধ সমাজের স্ব স্ব ধর্ম্ম যেরূপ হউক সর্ব্বসমাজের মূলীভূত ব্যবস্থা একমাত্র পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কি পারিবারিক, কি নাগরিক, কি রাজ্যব্যাপী, যে কোন সমাজ হউক সর্ব্বত্র সকলকেই পরস্পরের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতে হয়*। কিন্তু আমাদিগের হিন্দুসমাজে ইহার বিরোধী কতকগুলি কথা প্রচলিত আছে। তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় নাই, কেবল তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বানপ্রস্থ তপস্বীগণ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিতেন, তদ্দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধ

---

* বিচার শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ হইবে বলিয়া পারিবারিকধর্ম্ম বিহীন কতক গুলি সমাজের উদাহরণ দিতে পারি নাই কিন্তু তাহার পর্য্যবেক্ষণ না করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের মর্ম্ম বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে না বলিয়া বলিতেছি যে কোম্পানি, সমিতি, আখড়া, পার্লিয়ামেণ্ট, সেনা ইত্যাদি সমাজ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা পরিবার লক্ষণাক্রান্ত নহে। কি পারিবারিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট সমাজ কি তদ্বহির্ভূত সমাজ সর্ব্বত্রই পরস্পরের সাহায্য বিদ্যমান থাকে।

সংস্থাপন হইত। কিন্তু অনুমান হয় যে এক সময়ে এই নিগূঢ় অভিসন্ধি কোন প্রকারে বিলুপ্ত হইয়া যতিধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব হইয়া থাকিবে; হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম, আশ্রম পর্য্যায় মধ্যে চতুর্থ পদ হইতে স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে। বোধহয়, সেই অবধিই যতিধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সচরাচর এইরূপে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে, যে ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইতে চেষ্টা করাই বিধেয়। তপস্যা ও কৃচ্ছ্র ব্রত অবলম্বন করিলে পরিবার, লোকালয়, অর্থ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কিছুরই প্রয়োজন থাকিবে না এবং যতি স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনাতে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই কথাতে কোথাও এরূপ বিন্দুমাত্র প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যতিধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ গৃহস্থ-ধর্ম্মের ক্ষয়সাধন করা বিধেয়। ঐ দ্বিবিধ ধর্ম্ম-সক্রান্ত যে সকল গূঢ় কথা আছে তাহা প্রকাশ করিবার স্থল নাই তথাচ এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে গৃহস্থ-ধর্ম্ম কখনই অবজ্ঞার যোগ্য নহে। প্রত্যুত উল্লিখিত সমাজ বিষয়ক নৈসর্গিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্যক্ত হইবে যে, গৃহস্থাশ্রমই সমাজের প্রধান অবলম্বন। এবং শাস্ত্রেও এই কথার উল্লেখ দেখা যায়। অতএব যতিধর্ম্মের যদি কোন মাহাত্ম্য থাকে তাহা প্রাগুক্ত আশ্রমের শাখা স্বরূপ মাত্র। সেই শাখা বিশেষের প্রতি যতই আদর কর তাহার নিমিত্তে পারিবারিক, নাগরিক, রাজ্যব্যাপী কিম্বা জগৎ-ব্যাপী নরধর্ম্মের বিঘ্ন সাধন করা নিতান্তই অকর্ত্তব্য। যেখানে এই নরধর্ম্মের সহিত যতিধর্ম্মের ঐক্য না হইবে সেখানে শেষোক্ত ধর্ম্মকেই ভুল বলিতে হইবে, এবং অন্যান্য ধর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। কেননা যেমন দ্রব্যজাতের রাসায়নিক ধর্ম্ম অভাবে জীবধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে না এবং যেমন জীব ধর্ম্মাশ্রিত বংশ পালনাদিকার্য্য ব্যতীত সমাজধর্ম্মের প্রয়োগ হইতে পারে না, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে ভৌতিক নিয়ম, জীবধর্ম্ম এবং সমাজ ধর্ম্ম এই সমস্ত গুলি সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করা আবশ্যক, তদনন্তর যদি কর্ত্তব্য হয় তবে যতিগণের আচরণ বিষয়ক নিয়ম করা যাইতে পারে। ফলত যতিগণ যতই বলুন, মনুষ্য লোকালয়ে ভিন্ন কখনই বাস করিতে পারে না, লোকালয় বিনষ্ট হইলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। লোকালয়ের নিয়ম পরস্পরের সাহায্য। অর্থাৎ লোকালয়ে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়। যে ব্রহ্মচারী মনে করেন আমি অঋণী, আমার জীবন যাপনার্থ কাহারো সাহায্য গ্রহণ করি নাই, করিব না, তিনি নিতান্ত মোহান্ধ।

সমাজের নিয়ম এই বুঝা গেল যে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত ফল এই যে, জীবন পরের জন্যে যাপন করা আবশ্যক। কেননা উহ্য বিষয়—অহং পদার্থ—কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতেছে না। যে পর সেই অহং বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সমাজতত্ত্ব হইতে কি এক উৎকট কথা উদ্ধার করা গেল। ইহা সুসাধ্য হউক, দুঃসাধ্য হউক কিম্বা এক কালীন অসাধ্য হউক এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি নাই। ইহা সুখপ্রদ হউক বা ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত হউক অথবা উভয়ের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হউক কোন মতেই ইহার প্রতি উপেক্ষা করা যায় না। এই কথার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মে তবে আমার তর্ক সোপানের প্রধান প্রধান আরোহণস্থল গুলিতে পুনরায় পদার্পণ করিতে পার। করিলে দেখিবে যে মনুষ্য জীবধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক নানাবিধ সমাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী হয়েন। সমাজ কেবল জীবিত মনুষ্যবর্গের উপর নির্ভর করে না। পুরুষপরম্পরা এবং পুরুষানুক্রম-আশ্রিত ভাষা, নগর ও লোকালয়ের নৈসর্গিক নিয়ম, তাবৎ ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিতে হয়। যতিগণ যাহাই বলুন ঐ সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না। জীবন পরের দ্বারা ভিন্ন কখনই চলে না। সুতরাং তুমি যদি পরের জন্যে আপনার জীবন যাপন করিতে অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে কেবল কৃমিগণের ন্যায় পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জীবনধারণ করিবে। তাহাতে তোমার দেহ রক্ষা হইতে পারে বটে এবং তোমার বাহ্যিক অবয়ব মনুষ্যের ন্যায় থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার মনুষ্যত্ব থাকিবে না, তুমি নিতান্তই পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি বাল্য বা যৌবনোপার্জ্জিত জ্ঞানরত্নে সাহায্যে যদিও কোন প্রকারে মনুষ্যত্ব রাখিতে পার তথাচ তোমার সে জ্ঞানরত্ন কখনই নরধর্ম্মানুসারে পরিবর্দ্ধিত হইবে না। বিশেষত সেই জ্ঞান রত্নই তোমার ভ্রম প্রমাণের স্থল হইয়া থাকিবে। কেননা সেই জ্ঞানরত্ন পরের নিকট পাইয়াছ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। অতএব তোমা জ্ঞান প্রসূত যতিধর্ম্মই তোমার পরাধীনতার প্রমাণ হইতেছে। আর তুমি অ সমাজের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া যদি এখন তাহা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা ক তবে ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচায়ক হইবে।

ফলত যতিধর্ম্মের সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। যতিদিগের নির্ম্মল চরি প্রত্যক্ষ করিলে সকলেই বিদ্যাভ্যাস অভাবেও সদাচার শিক্ষা করিতে পারে

বস্তুত কেবল গ্রন্থপাঠে বিদ্যাভ্যাস হয় না। গ্রন্থোক্ত সদাচার পরায়ণ হওয়া আবশ্যক এবং তাহার নিমিত্ত আদর্শের প্রয়োজন আছে। যতি স্বশরীরে নারায়ণত্বের আদর্শ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে যতি তাহা ভুলিয়া যান, তিনি কখনই যতি নামে বাচ্য নহেন। সে যাহা হউক এই বিভাগের উপসংহার স্থলের কথা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে—জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়—অতএব উহা পরের জন্যে যাপন করণ বিষয়ে গত্যন্তর নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকালয়ে পরস্পরের সাহায্য করিতেই হইবে; সজ্ঞানে কর, মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে; ইচ্ছা পূর্ব্বক কর সুখ লাভ করিতে পারিবে। অনিচ্ছা পূর্ব্বক কর, আজীবন কষ্ট পাইবে আর সমাজ উচ্ছৃঙ্খলিত হইবে। যে দিকে দেখ সমাজ এবং পরস্পরের সাহায্য বিচ্যুত হইলে নরদেহধারী ব্যক্তি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্রমশঃ কেবল পশুত্বই প্রাপ্ত হয়। তীর্থ অর্থাৎ তপস্যাস্থানে পাপ সংস্পৃষ্ট হইলে আর কোথাও মুক্তিলাভ হইতে পারে না। একথা নিতান্ত অপ্রামাণিক নহে।

অনুশীলন।

প্রথম কথা। স্থূল বৃত্তান্ত।

শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্বে; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তি গুলি কি প্রকার তাহার কিছু পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক, ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তি গুলির মধ্যে কতকগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন ও চরিতার্থতাও জ্ঞানার্জ্জনে হয়। যথা,—ধারণা, কল্পনা, স্মৃতি ইত্যাদি। আমি সেই গুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি বলিব। অথবা যে কথা একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই যদি তোমার মতে প্রচলিত রাখা উচিত হয়, তবে সেই গুলিকে তুমি বুদ্ধিবৃত্তি বলিতে পার। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে। সেগুলির কাজ, কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া যথা,—স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে গুলিকে

কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিতে পারি। ইহাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাম পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। *

শিষ্য। Æsthetic কিসের ভিতর পড়িল ?

গুরু। হিসাব মত কার্য্যকারিণীর ভিতর পড়ে। আবার জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির সঙ্গে সে গুলির এমন সাদৃশ্য আছে, যে সে গুলি হইতে এগুলিকে বিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহাহউক, আমরা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বা কোন দর্শনের অবতারণা করিতেছি না—বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় আমাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্য,—কি হইলে মনুষ্যত্ব লাভ করিব, তাহাই নিরূপণ করা। অতএব যাহাতে সকলে সহজে সে তত্ত্ব বুঝিতে পারি, সেইরূপ নামকরণই আমাদের উচিত, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় আমাদের প্রয়োজন নাই। যদি এই শেষোক্ত বৃত্তিগুলির পৃথক নাম দিলে মনুষ্যত্ব তত্ত্ব বুঝিতে আমাদের সুবিধা হয়, তবে পৃথক নামই দিব। তুমিই না হয়, একটি নাম দাও।

শিষ্য। আমি নামকরণ করিতে গেলে ওগুলিকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলিব।

গুরু। আপত্তি নাই। বুঝিলেই হইল। এখন মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জ্জনী (৩) কার্য্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিকী বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি মনুষ্যত্বের উপাদান ?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি কর। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য যথো যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়ত কার্য্যকারিণী

* এই বিভাগ বিলাতি পণ্ডিতদিগের মতানুসারী নহে, আমি জানি। অনেক স্থলে তাঁহাদের মতানুসারী না হওয়াই ভাল।

বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না বটে, তবু তাহার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থত, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূরণও কথঞ্চিৎ বাঞ্ছনীয় বলিয়া লোকের যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইলেন?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি, যে কোন নূতন সম্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। ধর্ম্ম পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্ম্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন ইহাই দেখিতেছি, নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দু ধর্ম্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রেই শিক্ষা প্রণালী বিশেষপ্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রাহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, গুরুর প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ব্রাহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রাহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণীবৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, "না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।" হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্ম ভাগ, অমর; চিরকাল চলিবে, চিরকাল মনুষ্যের হিত সাধন করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কাল ভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নব সংস্কারের এই স্থূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতি কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবন স্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খ্রীষ্ট ধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্সর কোম্‌ত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মত বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। বেদান্তের সঙ্গে হর্বর্ট স্পেন্সরের মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্ত টা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয় হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থূল ভাগ, এত কালের পর ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্ম্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম্ম ছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম্মে তাহা হয়, তাই হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

দ্বিতীয় কথা।

জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি।

শিষ্য। কালিকার কথায় শিখিলাম কি?

গুরু। শিখিলে যে চতুর্ব্বিধ মনুষ্যবৃত্তি গুলির সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন, ও তাহাদিগের পরস্পর সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব। তুমি বলিতেছ, ইহা পুরাণ কথা। হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন কথা পুনরুক্ত করায় অনেক সময়ে

উপকার আছে। আর ইহাও তুমি দেখাইতে পারিবে না, যে কথাটা ঠিক এইভাবে পূর্ব্বে কোথাও কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল। তবে কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য, এরূপ লোক প্রতীতি আছে বটে, এবং তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষা প্রণালী। সেই শিক্ষা প্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতীকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি?

গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ, কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এদেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশল, বাগ্মী, বা সুলেখক; ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য যোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্ত্তি, মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস, এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান কার্ত্তিকেয় বা বলবান্ পবনে নিহিত হয় নাই, বুদ্ধিমান বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগ্দেবীতে নহে; কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতিবিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর?

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক

কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকল গুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল—আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্তপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ব বিহীন সুতরাং ধর্ম্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য! সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুযায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এস্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত?

গুরু। এ আপত্তির মীমাংসাও অনেক কথা, পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে ইহার মীমাংসা করিব। এখন নোট করিয়া রাখ। এক্ষণে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর তৃতীয় দোষের কথা বলি।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন, বৃত্তির স্ফূরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি বা পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,—তেমনি এই জ্ঞানার্জ্জন বাতিকগ্রস্ত

শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চট্‌পট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ত্তারূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জ্জনে সক্ষম, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনুষ্য জন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও বলি। আমি গোস্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাঁহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইংরেজের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত, আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতক গুলা কথা জানিয়াছি; কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকল গুলির সমবায়ের ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলো জ্বলিতেছে, কেবল সিঁড়ি টুকু অন্ধকার। এই জ্ঞান পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, "সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই—আঁটি খাইতে হয়।" তারপর আঁব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন; এ বারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, "সাহেব, কেবল খোসা খানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।" সাহেব সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহার পূর্ব্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র, এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারির ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জাগায় আঁটি, আঁটির জাগায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন?

গুরু। পাগল! অস্ত্র খানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জ্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বৃত্তির বিকাশই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জ্জনই জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি গুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জনই বটে। কিন্তু যে অনুশীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাক। পাক শক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ

মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করে, তেমন এক্ষণকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন।

জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ, সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষা-রূপ অধর্ম্ম সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

তৃতীয় কথা।

নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তি।

শিষ্য। এখন কোন্ বৃত্তির কিরূপ অনুশীলন পদ্ধতি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে কথা ধর্ম্মব্যাখ্যার অন্তর্গত বটে, কেন না ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বাংশব্যাপী। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এই কথোপকথনের ভিতর সমাবেশ করা যায় না। এখন কেবল আমি দুই একটা স্থূল কথা বলিয়া যাইতে পারি। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে স্থূল কথা দুই একটা বলিয়াছি—অন্যান্য বৃত্তি সম্বন্ধেও দুই একটা স্থূল কথা মাত্র বলিব। যদিও আমার মতে সকল বৃত্তি গুলির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্যই ধর্ম্ম, তথাপি সকল ধর্ম্মবেত্তারাই কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এই বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফূরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণ শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্য চরিত্রেও সেই রূপ। কতকগুলি কার্য্য-কারিণী বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,—ইহাদিগের সম্প্রসারণ শক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এই গুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও

কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানত কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণ শক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যতদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, ততদূর স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুল গাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না, যে সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্ত্তব্য, কেন না অম্লে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে বলিতেছি। তেঁতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল—তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি যাহার দমনই সমুচিত স্ফূর্ত্তি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের এক কালীন ধ্বংসে মনুষ্য জাতির এককালীন ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্য্য বৃত্তিরও এককালীন ধ্বংস ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দু ধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ইহার এককালীন ধ্বংস বিহিত করেন নাই, বরং ধর্ম্মার্থ তাহার নিয়োগই বিধি করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্ম্মের অংশ। তবে ধর্ম্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি, তাহা হিন্দু শাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিরোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্ত্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয়দমনই পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্‌টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের এককালীন উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্ট-কারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে, যে আমরা কেবল বুদ্ধি বলেই স্থির করিতে পারি, যে অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলেই দণ্ডনীতি হইল।

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম্ম দেখি না।

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্ত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সামঞ্জসীভূত স্ফূর্ত্তি—ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জ্জনে—কেবল ধনার্জ্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তুমাত্রেরই অর্জ্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিতি মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্বৃত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুইটি কথা বুঝ। যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্টবৃত্তি বলি, তাহাদের সকল গুলিই উচিত মাত্রায়

ধর্ম্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলন তত্ত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইল *। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, কৃষ্ণের যে উপদেশ তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিঘ্নকর হইতে পারে না, যথা

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি। ২।৬৪।

শিষ্য। যাই হৌক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আজ কাল যোগধর্ম্মের বা থিওসফির একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। আমি মনুষ্যের occult শক্তিতে অবিশ্বাসী নহি। অলকট্ বা ব্লাবাট্স্কিতে অথবা ভারতছাড়া নামধারী কুতহুমীলালসিংহে বড় বিশ্বাসী নহি, কিন্তু মহাত্মাদিগের অস্তিত্ব এবং শক্তি স্বীকার করি। স্বীকার করিয়াও আমি তাঁহাদিগের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। যোগধর্ম্মের মর্ম্ম কতকগুলি বৃত্তির এককালীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ। এখন, যদি সকল বৃত্তির

---

* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি রহিল। অনাথা রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনর্জ্জীবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফূর্ত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আর উপধর্ম্ম সঙ্কুল বা "silly" বলিয়া বোধ হইবে না। সময়ান্তরে দুই একটা উদাহরণ দিব।

উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক, কেননা তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক, কেননা তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে, না হয় লম্পট বা উদরম্ভরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম এবং যোগী দিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগতের তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই বুঝিব যে আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগত সম্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিরই অনুকূল—প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগ পরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন "Law"র মহিমা কীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুইজন একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না।

ক্রমশ।

সিংহল যাত্রা।

১২৯০। ৪ঠা ফাল্গুন—কলম্বোর সুপ্রিম কোর্টে সংপ্রতি অধিক কার্য্য আছে এমন বোধ হয় না। গতকল্য আমি বেলা একটার সময় উক্ত ধর্ম্মাধিকরণ দেখিতে গিয়াছিলাম; তখন জজ সাহেবেরা উঠিয়া গিয়াছেন। তবে সেষণের সময়ে তাঁহাদের বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়। এখানকার জেলা জজদিগের সেষণ বিচারের ক্ষমতা নাই; সুতরাং সমস্ত গুরুতর অপরাধের বিচার সুপ্রিমকোর্টেই হইয়া থাকে। জেলা জজদিগের দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ভারতবর্ষের সুবর্ডিনেট জজদিগের ন্যায়; কিন্তু ফৌজদারিতে তাঁহারা এক বৎসরের অধিক কাল কারাবাস এবং ২০০ টাকার অধিক অর্থ দণ্ড করিতে পারেন না। পুলিস মাজিষ্ট্রেটরা তিন মাস মাত্র কারাবাস এবং ৫০টাকা মাত্র অর্থদণ্ড করিতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবদিগকে সেষণের বিচার জন্য কান্দি, গাল, ট্রিনকোমালী, যাফ্না প্রভৃতি নগরে পরিভ্রমণ করিতে হয়। জজদিগের মধ্যে মেষ্টার ডায়াস্ আদিম সিংহলী; কিন্তু তিনি বৌদ্ধ নহেন, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী।

ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে আমরা যাঁহাদিগকে বারিষ্টার বা কৌন্সলী বলি, সিংহলে তাঁহারা আড্‌বোকেট্ নামে অভিহিত; আমরা যাহাদিগকে এটর্ণী বলি, তাঁহারা এখানে প্রক্টর নামে খ্যাত। আমার কয়জন আড্‌বোকেট ও প্রক্টরের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও সুপণ্ডিত। কলম্বো নগরে এরূপ প্রবাদ আছে যে, ভূতপূর্ব্ব চিফ্ জষ্টিস্ সার্ জন্ বড্ ফিয়ার্ একবার বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতার হাইকোর্টের সামান্য উকীল, আইন সম্বন্ধে যেমন তর্ক বিতর্ক করিতে পারেন, সিংহলের বড় বড় আড্‌বোকেটও তেমন পারেন না। ফিয়ার সাহেবের ঐ উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। অসার পুনরুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বিচারকগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। শুনা গিয়াছে মেষ্টার জষ্টিস্ ফিল্ড্ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "মফস্বলের একজন সামান্য উকীল তোমার ন্যায় তর্ক করিতে লজ্জিত হয়।" আড্‌বোকেটের মধ্যে অধিকাংশই বর্গার (Burghers) অর্থাৎ ওলন্দাজ এবং ইংরেজ

বংশোদ্ভব ঔপনিবেশিক; দুই তিন জন ইংরেজ এবং ৪।৫ জন তামিল আছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মেষ্টার ব্রাম্সন্ কলিকাতার বারিষ্টারদিগের নেতা। আমি বলিলাম "বোধহয় একথা ভুল; পল সাহেবই কলিকাতার কৌন্সলীবৃন্দের পুঙ্গব।" তাঁহারা আমাকে কলিকাতার উকীলদের আয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম "আমি এবিষয়ের বড় খবর রাখি না; তবে যাহা কিছু জানি বলিতেছি।" তাঁহারা আমার কথা শুনিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে, সিংহলে ওকালতি কার্য্যে বড় পয়সা নাই। ইলবার্ট বিলের কথা তাঁহারা আপনারাই উত্থাপন করিয়া বলিলেন "সিংহলে জাতি-বৈরিতা আছে; কিন্তু ভারতবর্ষে যে এতটা আছে, তাহা এখানকার লোকে অনুভবও করিতে পারেন না।" বস্তুত এ কথা ঠিক। সিংহলে সর্ব্বত্র দেশী মাজিষ্ট্রেটগণ ইউরোপীয়দিগকে দণ্ড বিধান করিতেছেন; কোন আপত্তি নাই। ইলবার্ট বিলের সময় অবধি ভারতবর্ষের ইংরেজগণ ইউরেসীয়দের প্রতি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্য দেখাইতেছেন; কিন্তু বস্তুত তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করেন। শ্রাদ্ধ বাটীতে ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগকে লুচিমণ্ডা দিয়া সন্তুষ্ট করেন; কিন্তু যে ভাট সেই ভাট রহিয়া যায়। গলায় পৈতা বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া কখনও পরিগণিত হয় না। ভারতবর্ষীয় ইউরেসীয়দিগের * হ্যাট্-কোট্, পেণ্টুলন, পরাই সার; তাঁহারা কখনই ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য হইবেন না। সিংহলের ইংরেজরা বর্গারদিগের প্রতি আত্ম-নির্ব্বিশেষে ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু তাদৃশ অবজ্ঞা প্রদর্শনও করেন না। সর্ রিচার্ড মর্গান্ নামক বর্গার সিংহলের চিফ জষ্টিস হইয়া ছিলেন; কোন ইংরেজ তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই; কিন্তু মান্যবর রমেশচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালার

---

* "ফিরিঙ্গী" শব্দ "ফ্রাঙ্ক" শব্দের অপভ্রংশ। যখন ইউরোপীয়রা যিশুখৃষ্টের সমাধি মন্দিরের উদ্ধার জন্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন ফ্রান্সবাসী ফ্রাঙ্করা তাহাদের নেতা ছিল। এজন্য আরবেরা সমস্ত ইউরোপীয়কে 'ফরেঙ্গ্,' (ফ্রাঙ্ক) বলিত। পোর্ত্তুগালবাসীরা ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতে আসিয়াছিল। এজন্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ তাহাদিগকে 'ফেরঙ্গ্' বলিয়া ডাকিতেন। যদি ফরাসিস্, ইংরেজ, বা ওলন্দাজ ভারতবর্ষে প্রথমত আসিতেন, তাঁহাদেরও নাম 'ফেরঙ্গ' হইত। আমরা ইউরেসীয়দিগকে ফিরিঙ্গী বলি; কিন্তু তাঁহাদের ঐ নামে অধিকার নাই। ইউরোপ ও আসিয়ার শোণিত মিশ্রিত হইয়া যে জাতিশঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে ইউরেসীয় বলাই ভাল।

চিফ জষ্টিস হওয়ায়, ভারতের ইংরেজমণ্ডলে হুলস্থূল পড়িয়া ছিল। সিংহলের আইন সমস্ত এখনও গোলমেলে অবস্থায় আছে। কতক প্রাচীন ব্যবহার, কতক ওলন্দাজদিগের আইন, কতক ইংলণ্ডের আইন, কতক সিংহলের লেজিস্‌লেটিব্‌ কৌন্সিলের অর্ডিনান্স এই সমস্ত লইয়া খিচুড়ী হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ গোলযোগ কতকটা আছে। ইংলণ্ডীয় আইন কলিকাতায় কতদুর প্রচলিত, তাহা হাইকোর্টের জজগণও বলিতে পারেন না। সুপ্রিমকোর্ট নিষ্পত্তি করিলেন যে,রাজা কৃষ্ণনাথ কুমার কলিকাতায় আত্মঘাতী হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহার বিষয়াধিকারী। প্রিবিকৌন্সিল তদ্বিপরীত নিষ্পত্তি করিয়া ধার্য্য করিলেন যে, ইংলণ্ডীয় আত্মহত্যা বিষয়ক বিধি কলিকাতায় প্রচলিত নাই। আবার সুরেন্দ্রবাবুর মোকদ্দমায় স্থির হইল যে, ইংলণ্ডের আদালত-অবজ্ঞার আইন কলিকাতার হাইকোর্টে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের বিবাহ সম্বন্ধে আইন ভারতবর্ষে কতদূর প্রচলিত তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানীয় কার্য্য প্রণালীর আইন সমস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে বিচার কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। সিংহলে ততটা সুবিধা নাই। চিফ্‌জষ্টিস্‌ ফিয়ার সাহেব মফস্বল পরিভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল হাজতে আছে; তাহাদের যাহাতে শীঘ্র বিচার হয় এমন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। ফিয়ার সাহেব ঐ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করায়, এবং সিংহলের ডিষ্ট্রীক্ট জজ ও পুলিস মাজিষ্ট্রেটদের বিচার প্রণালীর নিন্দা করায়, সিংহলের গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এবং ঐ বিরোধ বশতই তিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। ফিয়ার সাহেবের প্রতি আড্‌বোকেটদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে বোধ হয়; কারণ বার লাইব্রেরীতে কেবল তাঁহারই চিত্রপট দেখিতে পাইলাম। সম্প্রতি কুলীর বেতনের আইন (Cooly wage's Ordinance) লইয়া সিংহলে ভারি আন্দোলন হইতেছে। কাফি-করবর্গ এই আইনকে সিংহলের ইলবার্ট বিল বলেন। এই আইন সম্প্রতি বিধিবদ্ধ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। অনেক কাফির আবাদে কুলীদিগের ভৃতি বাকি পড়িয়াছিল; তাহাতে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, সমস্ত আবাদের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মাসে মাসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে তালিকা পাঠাইয়া দিবেন। যিনি তালিকা না দিবেন,

বা মিথ্যা তালিকা দিবেন, তাঁহার অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড বা কারাবাস দণ্ড হইবে। কুলিদিগের ভৃতি সম্বন্ধে নালিসেরও কিঞ্চিৎ সুবিধা করা হইয়াছে। এই আইনের কোন্ বিধি যে অন্যায় তাহা বুঝিতে পারি না। তবে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রবল-প্রপীড়িত দুর্ব্বলদিগকে সাহায্য করিতে গেলে প্রবল ব্যক্তিরা আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি কতকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া সিংহলে শীঘ্রই প্রচলিত হইবে।

৫ই ফাল্গুন—কলম্বো নগর হইতে কালুতারা নগর পর্য্যন্ত একটি রেল পথ আছে। ঐ লৌহময় বর্ত্মের দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। বেলা-ভূমিতে অবস্থিত; এজন্য ইহার নাম সাগর-তট রেল। কলম্বো হইতে যাঁহারা গাল্ নগরে গিয়া থাকেন, তাঁহারা সমুদ্র পথে যাইতে পারেন; অথবা কালুতারা পর্য্যন্ত রেলে গিয়া অবশিষ্ট পথ ডাক গাড়িতে গমন করেন। রেলের পূর্ব্বদিকে সুরম্য কৃত্রিম বন, মধ্যে মধ্যে মনোহর বৃক্ষবাটিকা; পশ্চিমে মহা সমুদ্রের তরঙ্গমালা ভীষণ নাদে তটস্থ শিলার উপর আঘাত করিতেছে এবং প্রতিঘাতে ফেনময় হইতেছে; কিংহংসগণ মৎস্যাহার জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। সাগরোত্থিত সমীরণ এমন শীতল যে অদ্য গমন কালে জাগরিত থাকিবার চেষ্টা করিয়াও রেল গাড়ির মধ্যে সুষুপ্ত হইয়া পড়িলাম। অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিবার সময় নিদ্রার আবেশ হয় নাই; এই জন্য সিংহলের এই ভাগের সৌন্দর্য্য দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কালুতারা নগর কালু-গঙ্গা নদীর সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত। নগরটি দেখিয়া আমার বারাকপুর মনে পড়ে; কিন্তু বারাকপুরে সমুদ্র নাই; এই নগরের শোভা মহাসাগরের ভৈরব মূর্ত্তিদ্বারা বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রত্যুত বারাকপুরে ও শ্রীরামপুরে গঙ্গার যেমন সৌন্দর্য্য, তেমন সৌন্দর্য্য কালু-গঙ্গার নাই। বারাকপুরে কএকটি সুন্দর অট্টালিকা আছে। কালু-তারায় তাহা নাই। বারাকপুরে আমাদের রাজ প্রতিনিধির অতি রমণীয় কৃত্রিম কানন আছে; কিন্তু এখানকার এক একটি উপবন মুনিদের বাঞ্ছিত তপোবন বলিয়া বোধ হয়। কলম্বো হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে সাগর-তট-রেলের ধারে মৌণ্ট-লবিনিয়া নামে একটি জনপদ আছে। ঐ জনপদের পশ্চিম প্রান্তে সাগর তীরে একটি শৈল আছে; তাহার উপর সিংহলের একজন গবর্ণর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা হোটেল হইয়াছে। হোটেলের বারাণ্ডা হইতে সমুদ্র দর্শন ও সমুদ্রোত্থিত বায়ু সেবন যে কত সুখকর, তাহা আমি

বর্ণনা করিতে পারি না। আমার মনে হইল এই স্থানে একখানি কুটীর বাঁধিয়া ভগবানের মহিমা ধ্যান করিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করি।

১৩ ই ফাল্গুন—অদ্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির সন্দর্শন করিলাম। কল্যাণী কল্যাণী গঙ্গার * তীরে অবস্থিত; কলম্বো হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে। কল্যাণী দেখিলে সিংহলের সাধারণ গ্রাম কিরূপ তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে নারিকেলপত্রাচ্ছাদিত কুটীর। স্থানে স্থানে ইষ্টক রচিত ভবন; সুগঠিত, কিন্তু উপরে খোলার ছাদ। রাণীগঞ্জের মৃত্তিকাতে মগরার বালি মিশ্রিত হইলে ভূমির যেমন বর্ণ হয়, এখানকার তৃণহীন ভূমির সেইরূপ বর্ণ। এখানকার নারিকেল গাছ, বাঙ্গালার নারিকেল গাছ অপেক্ষা উচ্চ; আম্র কাঁটালের গাছ আমাদের দেশের আম্র কাঁটালের গাছের দেড় গুণ উচ্চ হইবে; কিন্তু বাঙ্গালার গাছ সিংহলের গাছ অপেক্ষা উচ্চতায় ন্যূন হইলেও অপেক্ষাকৃত স্থূল। ফাল্গুন মাস গত হয় নাই; কিন্তু এখনই আম্র সুপক্ক হইয়াছে; তবে জাফনার আম্র যেমন মিষ্ট কল্যাণীর আম্র তেমন মিষ্ট নহে। এখানে পানের বরোজ দেখিতে পাইলাম না। তাম্বুল-লতা গুবাক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বর্দ্ধিত হয়। রম্ভা ও পনস-তালিকার (bread-fruit) অনেক উচ্চ উচ্চ গাছ আছে। ধান্য-ক্ষেত্র নাই; কিন্তু গবাদি পালন জন্য কর্ষিত তৃণ-ক্ষেত্র আছে। কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দির মধ্যে একটি কাচাবরণ (glass-case) আছে; তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দারুময় বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি শায়ী রহিয়াছে। মুখখানি কতকটা আমাদের জগন্নাথের মত। কিন্তু জগন্নাথের খাঁদা নাক; বুদ্ধের নাক খাঁদা নহে। জগন্নাথের মূর্ত্তির সহিত বুদ্ধ মূর্ত্তির যে কতক সাদৃশ্য আছে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব; জগন্নাথ নামে কোন অবতারই নাই। জগন্নাথ বুদ্ধের উপাধি মাত্র। পূর্ব্বকালে চীন ও তিব্বৎ বাসী বৌদ্ধ যাত্রীরা বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে উৎকলে জগন্নাথের মন্দিরে আসিতেন। এক্ষণে জগন্নাথে ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রা জগন্নাথের ভাই ও ভগিনী হইয়াছেন। জগন্নাথ যে বুদ্ধাবতার তাহার

* সিংহলীরা নদী মাত্রকেই "গঙ্গা" বলে যথা—মহাবলি গঙ্গা, কালু গঙ্গা, কল্যাণী গঙ্গা, ইত্যাদি। ইহাতেও তাহাদের বংশের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় নদী মাত্রকেই 'গাং' বলে। 'গাং' 'গঙ্গা' শব্দের বিকৃতি মাত্র।

একমাত্র চিহ্ন আছে; মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে পুরীতে বর্ণভেদ নাই। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কি অসাধারণ হজমি শক্তি ছিল! যে শাক্যসিংহ অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন, বেদে পশুবধের বিধি থাকায় যিনি শ্রুতি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনিই আবার বেদ প্রতিপালক বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য! তিনিই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে জগন্নাথ নামে উড়িষ্যার বুদ্ধ-মন্দিরে পূজিত। যাঁহারা চার্ব্বাক, জাবালি এবং নিরীশ্বর কপিলকে মহর্ষি বলিয়া সম্মান করেন, তাঁহারা বেদবিরোধী বুদ্ধ শাক্যমুনিকে বিষ্ণুর অবতার বলিবেন, ইহা বড় বিচিত্র নহে; বোধ হয়, তাঁহারা য়িহুদার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রয়োজকদিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তাঁহাদিগকেও মহর্ষি বলিয়া মান্য করিতেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যার পর নাই গুণগ্রাহী ছিলেন। যাঁহার অসাধারণ বা অলৌকিক গুণ দেখিতেন তাঁহার মতামতের বিচার না করিয়া তাঁহাকে মহা পুরুষ বা দেবাবতার বলিয়া পূজা করিতেন। এক্ষণে ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। গুণরাশির মধ্যে আমরা দোষানুসন্ধান করি; চন্দ্র দেখিতে গেলে আগে তাঁহার কলঙ্ক আমাদের নয়ন গোচর হয়।

কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দিরে উপাসনার বড় আড়ম্বর নাই। উপাসকগণ বুদ্ধ মূর্ত্তির নিকট কাষ্ঠ ফলকে কেহ নারিকেল পুষ্প, কেহ মল্লিকা পুষ্প রাখিয়া যান; কেহ কেহ ধূপ ও দীপ জ্বালেন। কোন উপাসককে মন্ত্র পড়িতে শুনি নাই। বস্তুত বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত। নেপাল, সিকিম্, ও ভোটের প্রচলিত মন্ত্র—'ওঁ পদম্ পাণি ওঁ' *। সিংহলের বীজ মন্ত্র "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামঃ; ধম্মং সরণং গচ্ছামঃ; সঙ্গং সরণং গচ্ছামঃ।" † হিমবন্ত প্রদেশের বৌদ্ধেরা মন্ত্রোচ্চারণ পর্য্যন্ত করেন না। তাঁহাদের জপচক্রে মন্ত্র অঙ্কিত আছে; চক্র ঘুরাইলেই জপের ফল হয়। বুদ্ধ মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি দাগোচ অর্থাৎ বুদ্ধাস্থির সমাধি আছে। ঐ সমাধি মন্দির একটি অতি বৃহৎ শ্বেত গোলার্দ্ধ। উপাসকগণ সমাধির চারিপার্শ্বে দীপ জ্বালাইয়া দিয়াছেন। * *

---

* বৌদ্ধদিগের প্রণব আছে; কিন্তু আমরা ওঙ্কারের যে অর্থ করি (অ, ব্রহ্মা; উ, বিষ্ণু; ম্, শিব) বৌদ্ধেরা সে অর্থ করেন না। মন্ত্রে বুদ্ধ পদ্ম-হস্ত বলিয়া বর্ণিত।

† পালি বা মাগধী ভাষায় রেফ্ নাই এবং তালব্য শ ও মূর্দ্ধন্য ষ নাই। 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্প্রদায় বা সমাজ।

* * বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের অস্থিকে ধাতু বলে। উড়িষ্যার মন্দিরে বিষ্ণুপঞ্জর

বুদ্ধ মন্দিরের পশ্চিমে একটি অতি যত্নে রক্ষিত অশ্বত্থ বৃক্ষ। উরুবেলায় নগরে (বুদ্ধগয়ায়) একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, অশ্বত্থের নাম বোধিদ্রুম হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বোধিদ্রুম কেবল অশ্বত্থেরই নাম নহে। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে দীপাঙ্কর হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪ জন মহাপুরুষ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পৃথক পৃথক বোধিদ্রুমআছে।—কাহারও বট, কাহারও শিরীষ, কাহারও চম্পক, ইত্যাদি। কশ্যপ বুদ্ধ ন্যগ্রোধতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন।

বোধিদ্রুমের পশ্চিমে পানশাল (পর্ণশালা) অর্থাৎ বৌদ্ধ যাজকদিগের আশ্রম। ঐ পর্ণশালা তৃণপত্রাচ্ছাদিত কুটীর নহে। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ; কেবল তাহার বারাণ্ডায় একটি চাল আছে। পানশালের মধ্যে অনেকগুলি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। অধিকাংশই তালপত্রে লিখিত; কয়েক খানি মরকত পদ্মরাগাদি মণিদ্বারা খচিত। বৌদ্ধ পানশাল প্রকৃত শান্তিনিকেতন। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন শান্তস্বভাব ভট্টাচার্য্যের টোলে আসিয়াছি।

পীতাম্বর, মুণ্ডিত-শির, বৌদ্ধ যাজকগণ যখন তালপত্রে লিখিত ত্রিপিটক গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন বোধ হয় যেন আমাদের ভট্টাচার্য্যেরা গীতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা যখন ভিক্ষা-পাত্র হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হন, তখন তাঁহাদের কেবল ভূমির প্রতি দৃষ্টি থাকে, এ দিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করেন না এবং মুখেও কিছু যাচ্ঞা করেন না। যাহার যে ইচ্ছা তাহাই দেয়; অনেকে সিদ্ধান্ন ও ব্যঞ্জন দিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রধান যাজককে মহাথেরো বলে। কল্যাণীর মহাথেরো সংস্কৃত জানেন। আমি তাঁহার সহিত ভাঙ্গা সংস্কৃতে আলাপ করিলাম। তাঁহার কথার ভুল ধরিতে পারি নাই; কিন্তু আমি নিজে 'ভাবতবর্ষাৎ আগতোঽস্মি' বলিতে গিয়া 'ভারতবর্ষাৎ আগতাস্মি' বলিলাম। ভারতবর্ষ কোন্ দেশকে বলে মহাথেরো জানেন না। আমি বুঝাইয়া বলিলাম 'যস্মিন্ দেশে শাক্যসিংহস্য জন্মভূমি।' মহাথেরো বলিলেন 'জম্বুদ্বীপাৎ।' তাঁহার সংস্কার এই যে লঙ্কাদ্বীপ জম্বুদ্বীপের বাহিরে। আলাপের সময় আপন দেশকে লঙ্কা বলিয়াই পরিচয় দিলেন। সিংহল কি তম্রপর্ণী নামের উল্লেখ করেন নাই। পরে মগধের অশোক

বলিয়া যে ধাতু অতি যত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধাস্থি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রাজা, সিংহলের দেবানাম্-পিয়তিস্স রাজা, ধর্ম্মপ্রচারক মহেন্দো (মহেন্দ্র), ধর্ম্ম প্রচারিকা সঙ্ঘমিত্তা (সঙ্ঘমিত্রা) ও অনুরাধপুরের বোধিদ্রুম সম্বন্ধে দুই চারি কথা হইবার পর আমি কলম্বো নগরে ফিরিয়া আসিলাম। কল্যাণীতে এত গাছ, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বর নাই। সাগরোত্থিত বায়ুতে ম্যালেরিয়া দূর করিয়া দেয়, বোধ হয়।

ক্রমশ।

নবজীবনে শক্তিসাধনা।

১

কারে জাগাইছ ভাই! জীবন সঁপিয়ে?
আনন্দে, অধীর প্রাণে,
এক মনে, এক ধ্যানে,
বাল বৃদ্ধ শিশু যুবা নর নারী নিয়ে;
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারবে,
পূরিয়া আকাশ ভবে,
সর্জ্জরস-ধূম গন্ধে ভুবন ভরিয়ে,
কারে জাগাইছ ভাই! যতন করিয়ে?

২

কারে জাগাইতে চাও, জান কি সাধনা?
মনে আছে মূল মন্ত্র?
দেখেছ পুরাণ তন্ত্র?
কি উদ্দেশ্য বোধনের, কিবা সে কামনা?
ভূমণ্ডলে কে বা বল,
এই প্রথা প্রচারিল;
কি ফল লভিলা তিনি তুমি কি জাননা?
ভুলেছ পুরাণ কথা পুরাণ ভাবনা!

৩

সে ত ভুলিবার নয় অপূর্ব্ব কাহিনী—
ত্রেতায়, করিয়া ভক্তি,
জাগাইয়ে মহাশক্তি,
জানকী উদ্ধার করে রাম রঘুমণি।
নীলোৎপল বিনিময়ে,
নীল আঁখি উপাড়িয়ে
উদ্যত উৎসর্গ দিতে; অভয়া অমনি
দিলা বর, রাম নামে পূরিল ধরণী।

৪

রাঘবের মহাব্রত ভারত ভিতরে
আজিও রয়েছে লেখা
মুছিবে না সেই রেখা,
তন্ত্রে মন্ত্রে হৃদে হৃদে অনল অক্ষরে।
আজিও কলির শেষে,
দীন হীন শীর্ণ বেশে,
শূন্য গেহে, শূন্যদেহে, অশক্ত অন্তরে
অশক্ত বাঙ্গালি শক্তি পূজে ঘরে ঘরে

৫

বাঙ্গালি অধম জাতি ঘুচায়ে সকল ;
ছাড়ে নাই সেই ব্রত,
ডাকিতেছে অবিরত—
"আয়াহি বরদে দেবি" দেহে দাও বল ;
তোমার চরণে মতি
রেখে, যেন পাই গতি,
এ দুর্দ্দিনে তোমা বিনে নাহি মা সম্বল ;
তোমারি কৃপায় কার্য্য হইবে সফল।

৬

জানকী হারায়ে রাম করিলা সাধনা।
সর্ব্বস্ব হারায়ে মোরা,
ডাকি সেই সারাৎসারা—
"উঠ জাগ জগদম্বা ঘুমালে হবে না ;
সাধুপদ চিহ্ন ধরি,
দেহ প্রাণ পণ করি,
অধম যাচিছে তব অপার করুণা ;
"যথৈব রামেণ,' যেন পূরে মা কামনা।"

৭

বার বার বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ ধরি,
মানসে তোমার পূজা,
করিলাম দশভুজা ;
হৃদয়ের প্রীতিপুষ্পে দিয়ে অশ্রুবারি।
কৈ মা পাষাণ সুতে !
অশ্রুধারা মুছাইতে,
এখনো অভয় কর দিলে না প্রসারি !
সন্তাপ নাশিনী নামে কলঙ্ক শঙ্করি !

৮

পূজিয়াছি বার বার তবু কি ছাড়িব !
শিরায় শোণিত কণা
থাকিতে ত ছাড়িব না ;
কঙ্কালাস্থি-সার-দেহে চরণ পূজিব।
শ্মশান এ বঙ্গালয়ে,
শ্মশান হৃদয় ল'য়ে,
শ্মশানবাসিনী পদে পুষ্পাঞ্জলি দিব,
শ্মশানে চন্দন কভু শোভে কি দেখিব

৯

যুগে যুগে তব পূজা হইল প্রচার।
আজি নব যুগ বঙ্গে,
নব জীবনের রঙ্গে,
নিনাদে অবনী ব্যোম করিয়া বিদার ;
কাঁপাইয়া সিন্ধুবারি,
কাঁপাইয়া দিক চারি,
কোটি কণ্ঠে করপুটে ডাকিব আবার—
"উঠ জাগ জগদম্বে ঘুমায়ো না আর।"

১০

উঠ রবি-শশী-বহ্নি—ত্রিচক্ষু ধারিণী !
রবিনেত্র প্রকাশিয়ে,
আঁধারে আলোক দিয়ে,
আঁধার আঁধার পূরে পোহাও রজনী !
ডুবুক কুগ্রহ তারা,
উঠ শীঘ্র শিবদারা,
তরুণ অরুণ-করে হাসুক ধরণী ;
ফুটুক সরসী কোলে কনক নলিনী।

১১

"অর্দ্ধেন্দু শেখরা" জাগ, ইন্দু আঁখি মেলি,
অমার আঁধার রাশি,
সুধা বরিষণে নাশি,
হাসুক্ শরতশশী দিগন্ত উজলি।
এস এস শারদীয়ে!
প্রাবৃটে বিদায় দিয়ে,
প্রকৃতি-নয়ন-অশ্রু ঝরিছে উথলি;
মুছি ধারা, কর দূর কাল মেঘাবলী।

১২

তৃতীয় নয়ন মাতঃ তেজোরূপী তোর।
তেজোহীন এই ভূমি,
তেজদৃষ্টি দেহ তুমি,
নিস্তেজ সন্তান দল নিদ্রায় বিভোর।
তুমি আঁখি মেল দুর্গে,
জাগুক্ ভকতবর্গে,
দেখুক্ নিদ্রিতপুরে পশিয়াছে চোর;
সর্ব্বস্ব হ'রেছে পাপী অবিশ্বাসী ঘোর।

১৩

জাগিয়া সগণে এস দরিদ্রের পুরে।
কমলা কমলাসীনা,—
বাগ্‌বাণী করে বীণা,
চির সহচরী তব দুপাশে বিহরে।
সুত গুহ গজানন
দৈত্য-বিঘ্ন বিনাশন,
দানব দলনী তুমি শিব কান্ত শিরে;
কেশরী বাহনে নাশ অসুরে অচিরে।

১৪

আজি নব যুগোৎসাহে, নবীন তরঙ্গে
মাতায়ে পাগল প্রাণে,
নব জীবনের গানে,
নবমন্ত্রে মহাশক্তি আরাধিব রঙ্গে।
কে আছ পরম ভক্ত—
ব্রতপর ঘোর শাক্ত;—
দুর্গা নামে তুলি ডঙ্কা মাতাইয়া বঙ্গে
এস হে সঁপিবে প্রাণ সাধন প্রসঙ্গে।

১৫

বুঝেছি সাত্ত্বিক ভাবে শক্তি আরাধনে
সফল হবে না ব্রত,
সঙ্কল্প হইবে হত,
আতপ তণ্ডুলে কিবা কুসুম চন্দনে,
মোদকে, পায়সে, ফলে,
পঞ্চামৃতে, গঙ্গাজলে,
তুষিতে নারিবে শক্তি বিনা বলিদানে;
আত্ম বলিদান চাই শকতি প্রাঙ্গণে।

১৬

বাজা ঢাক ঢোল কাড়া দুন্দুভি বাজনা
বাজা বলি-বাদ্য-বোল;
দেশে দেশে উতরোল,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে গ্রহে গ্রহে পড়ুক ঝঞ্চনা
জয় মা জয় মা রবে,
উন্মত্ত সাধক সবে,
উৎসাহ-পাগল প্রাণে প্রাঙ্গণে নাচ না
'ও মা দিগম্বরি' বোলে মাতিয়ে গাহ না

১৭

খরধার তরবার লও রে ত্বরিতে।
পশুরক্তে বসুন্ধরা,
আজিরে হইবে ভরা;
দুর্গার শোণিত তৃষা হবে নিবারিতে।
রুধির বহিবে থরে,
রুধিরাক্ত কলেবরে,
বলি-প্রিয়া পদে সবে হবে নিবেদিতে;
"হয় মা বিজয় দাও, নতুবা মরিতে।"

১৮

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"—
এই পণ রাখি মনে,
মহাশক্তি আরাধনে,
অবশ্য হইবে জয় সঙ্কল্প সাধন।
তখন আরতি রবে,
ভুবন মোহিত হবে;
ভুবন মোহিনী কান্তি সহস্র কিরণে!
হাসাইবে, জুড়াইব চামর ব্যজনে।

১৯

প্রতিজ্ঞা অনল দীপ্ত জালিয়া মানসে,
হোমকার্য্য সম্পাদিব,
কুমতি আহুতি দিব—
শোক মোহ ভয় পাপ অজ্ঞান কল্মষে।
পুষ্পাঞ্জলি অতঃপর,—
পাদ পদ্মে দিয়ে কর,
বলিব "রেখো মা নিত্য ও পদ পরশে,
আর যেন তোমা হারা হই না অলসে।"

১০

এইরূপে মহাযজ্ঞ সমাধা হইলে;
বর্ষে বর্ষে প্রতিমায়,
পূজি সর্ব্ব মঙ্গলায়,
শক্তি সাধনার তত্ত্ব বুঝিবে সকলে।
হৃদয় মন্দির হতে,
কিন্তু যেন কোন মতে,
ডুবায়ো না শক্তিমূর্ত্তি বিস্মৃতির জলে।
ভবের ভরসা পুন দিও না অতলে!

ষোড়শোপচারে পূজা।

দেহ এবং মন দুইটি পৃথক পদার্থ কি না, দেহ এবং মনের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তাহা কি নিয়মে নির্দ্ধারিত, এ সকল কথার আমি আলোচনা করিব না, আলোচনা করিবার প্রয়োজনও নাই। দেহ এবং মন দুই রকমের বস্তু। একটা ভাব বা চিন্তা যে রকম জিনিস, এক খণ্ড মাংস বা এক ফোঁটা রক্ত, সে রকম জিনিস নয়। গোড়ায় দুই রকম জিনিস এক কি না বলিতে পারি না, এবং সে কথার মীমাংসাও এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গোড়ায় যাহাই হউক, আমরা যে আকারে দেখি বা অনুভব করি, সে আকারে দুইটি জিনিস যে দুই রকমের, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ অসম্ভব। দুইটি জিনিস মানুষের কাছে দুই রকমের বোধ হয় বলিয়া,মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম, ঈশ্বর, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লইয়া অনেক মতভেদ, অনেক বিরোধ, বিতণ্ডা হইয়াছে এবং হইতেছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, সেই সকল মতভেদ এবং বিরোধবিতণ্ডা নিতান্তই অমূলক ও অন্যায়।

দেহ এবং মন, জড়জগৎ এবং আত্মা, দুইটি ভিন্ন রকম জিনিস বলিয়া অনুভূত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি সম্পর্কবদ্ধ, যে একটি অপরটিকে ছাড়িতে পারে না, একটির পূর্ণতা অপরটি নহিলে হয় না, একটির চরিতার্থতা অপরটিতে। দেহ—মনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু—দেহকে পাইলে তবে মনের পরিতৃপ্তি হয়। সন্তান জননীর হৃদয়ের নিধি—কিন্তু সন্তানকে কোলে করিলে তবে জননী-হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। বন্ধুত্ব মনে মনে, হৃদয়ে হৃদয়ে; কিন্তু সেই মনে মনে,সেই হৃদয়ে হৃদয়ে যত মিল,যত মিশামিশি, দেহে দেহে আলিঙ্গন তত ঘন ঘন, তত গাঢ়, তত মিষ্ট। যত দিন মনের মিল, হৃদয়ের মিশামিশি অসম্পূর্ণ, তত দিন কেবল কথাবার্ত্তা; যখন সেই মিল, সেই মিশামিশি ষোলকলায় সম্পূর্ণ, তখন একাসনে বসিয়া এক পাত্রে ভোজন। মনের চরম স্ফূর্ত্তি—দেহ। মন যখন বড় মাতিয়া উঠে, দেহ তখন তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, মন আর ফাটিয়া যাইতে পারে না। জড় জগৎ অন্তর্জগতের চরম মূর্ত্তি এবং চরমকালের জীবন। ভগ্নপ্রাণা জননী মৃত্যুকালে পুত্রের মুখ দেখিতে

পাইলে পূর্ণপ্রাণে মরিয়া যান; অভিমানিনীর হৃদয়ের অসহনীয় তুফান-রাশি একটি ক্ষুদ্র চুম্বনে মিলাইয়া যায়। আবার মন— দেহের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। মনকে পাইলে তবে দেহের পরিতৃপ্তি হয়। সুসন্তানকে কোলে করিয়া জননীর কোল যত পরিতৃপ্ত, কুসন্তানকে কোলে করিয়া তত নয়। সুন্দর দেহে সুন্দর মন না দেখিতে পাইলে সুন্দর দেহ বুকে করিয়া দেহের সুখ হয় না। অন্তর্জগৎ জড়জগতের জীবন ও চরমমূর্ত্তি। অতএব প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর কাছে জগতে দুইটি জগৎ নাই—জগতে একটি মাত্র জগৎ।

দেহ এবং মনের, জড়জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের বিমিশ্র ভাব এত গাঢ়, তাহাদের পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল, তাহাদের পরস্পরের পরিণতি এত অনিবার্য্য বলিয়াই মানুষের মনের ভাব কেবল মনে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, শুধু মানসিক আকারে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ করে না। প্রণয়ী প্রণয়িনীকে শুধু মনে ভাবিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, প্রণয়িনীর হস্তাক্ষর বা প্রতিমূর্ত্তি বা অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। পুত্র স্বর্গীয় পিতাকে শুধু মনে মনে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, পিতার নামে দেবালয় স্থাপন বা সরোবর খনন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়। জাতীয় ভাব মনে সীমাবদ্ধ, জাতীয় পতাকায় উচ্ছলিত। ফরাসী "জাকবিণ" গণ tri-colour flag দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠিত। সমরক্ষেত্রে সৈন্যদল সামরিক ধ্বজদণ্ড দেখিতে পাইলে সিংহবিক্রমে সংগ্রাম করে। Fatherland বলিলে স্বদেশাভিমানী, স্বদেশ-গৌরব-গর্ব্বিত জর্ম্মাণের মনে যে অপূর্ব্ব ভাব উদয় হয়, সেইভাব সে দিন বার্লিন নগরে এক অপূর্ব্ব ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। মহাকবি দান্তের সম্বন্ধে ফ্লরেন্সবাসীর হৃদয় সেই প্রকারে ফোটে নাই বলিয়া মহাকবি বাইরণ ফ্লরেন্সবাসীকে হৃদয়শূন্য বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অন্তর্জগতের চরম মূর্ত্তি এবং শেষ পরিণতি বহির্জগৎ। তাই এথেন্সবাসীর তত সুন্দর পার্থিনন, পালমায়রার তত গর্ব্বের সূর্য্য-মন্দির, শলোমনের তত যত্নের ঈশ্বরাবাস, পোপদিগের অনুপম শিল্পরত্ন-শোভিত মাইকেল এঞ্জেলোর অপূর্ব্ব প্রতিভাপ্রসূত সেণ্টপিটার্স, মুসলমান বাদশাহের মতি-মসজীদ, আর হিন্দুর সেই অপূর্ব্ব অলৌকিক অলোকসামান্য ষোড়শোপচারে পূজা। তাই ফিদিয়সের 'জুপিতর', রোমান ক্যাথলিকের 'মেদনা', আর হিন্দুর দেব দেবীর প্রতিমা। ইহার কোনটিই তুচ্ছ নয়— সকলগুলিই সত্য, সকল গুলিই মনুষ্যত্ব, সকলগুলিই মানব-প্রকৃতির এবং জগৎ-প্রকৃতির গূঢ় রহস্য এবং চরম

ক্তি। স্বয়ং ভগবানই জড়জগতে ব্যক্ত হইয়া মহিমাময় বা ঐশ্বর্য্যশালী ইয়াছেন।

মহ্যাদির্মহিমা তব।

পৃথিবী প্রভৃতি তোমার ঐশ্বর্য্য। (রঘুবংশ—১০ম সর্গ।)

জড়জগতই অন্তর্জগতের ঐশ্বর্য্য। হৃদয়ের প্রতিমা বিনা হৃদয় যথার্থই ক্তিহীন, যথার্থই দরিদ্র, যথার্থই মরুভূমি; সে মরুভূমে ফুলও ফোটে না, লও ছোটে না, গাছও গজায় না, পাখীও গায় না, মেঘও খেলে না, বারিও র্ষে না! পিপাসায় হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা অলীক গতৃষ্ণিকা বই আর কিছুই জুটে না।

পৌত্তলিকতার মূল এবং উৎপত্তি মানব প্রকৃতিতে, জগৎ প্রকৃতিতে, ঈশ্বর প্রকৃতিতে। এখন পৌত্তলিকতার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আদিম অবস্থায় মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপ এবং দেবতা কি রকম, ঠিক রিয়া বলা বড় সহজ নয়; আদিম মনুষ্যের ভাষা অতি অসম্পূর্ণ, তাহাতে ভ্য মনুষ্য প্রায়ই সে ভাষা বুঝিতে পারে না। অনেক স্থলে অসভ্য নুষ্যের কার্য্য দেখিয়াই তাহার মনের ভাব অনুমান করিতে হয়, তাহাতে ত ভুল ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব,—বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। তাই খ্যাত-নামা পুরাতত্ত্ববিদেরা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে, যে অসভ্য মনুষ্য ক্ষ পূজা করে, সে বৃক্ষটাকেই পূজা করে, কি বৃক্ষস্থিত কোন কল্পিত দেব-তাকে পূজা করে*। এই প্রসঙ্গে আমরা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি তাহা ইতে মোটামুটি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রথমে বৃক্ষটাই পূজিত হয়, তাহার পরে বৃক্ষে একটি স্বতন্ত্র দেবতা কল্পিত হইয়া সেই দেবতা পূজিত হন। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে একটা প্রকাণ্ড শক্তি মনে রিতে যতটুকু মানসিক শক্তি ও শিক্ষা আবশ্যক, বৃক্ষস্থিত অথচ বৃক্ষ হইতে তন্ত্র একটি শক্তি কল্পনা করিতে তদপেক্ষা বেশী মানসিক শক্তি ও শিক্ষা াবশ্যক। কারণ প্রথম ক্রিয়াটি মানসিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সম্পন্ন হয়, তীয়টি হয় না। কিন্তু বৃক্ষপূজায় বৃক্ষই পূজিত হউক বা বৃক্ষস্থিত কল্পিত বতাই পূজিত হউন, সে পূজা ঠিক পৌত্তলিকতা নয়। পৌত্তলিকতা তিমূর্ত্তি ব্যতীত হয় না এবং প্রকৃত পৌত্তলিকতায় প্রতিমূর্ত্তি মানব মূর্ত্তির

* Sir John Lubbock's *Origin of Civilisation* নামক গ্রন্থ দেখ।

অনুকরণে নির্ম্মিত হয় *। অর্থাৎ পৌত্তলিকতায় দেবতা একটা অপরিস্ফুট মানসিক ভাবের ন্যায় একটি কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড না হইয়া, একটি পরিষ্কার পরিস্ফুট ভাবের একটা পরিষ্কার পরিস্ফুট মূর্ত্তি। প্রথমত পরিস্ফুটে এবং অপরিস্ফুটে কত প্রভেদ, মানসিক শিক্ষা এবং শক্তির কত বেশীকম, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। বুঝিয়া দেখিলে. আদিম জড়-পূজা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা কত উৎকৃষ্ট এবং উন্নত তাহা জানা যাইবে। দ্বিতীয়ত পরিস্ফুট মনের ভাবকে পরিস্ফুট মূর্ত্তিতে ব্যক্ত করিতে আরও কত শিক্ষা, আরও কত উন্নতি আবশ্যক তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। মনের ভাবকে দেহের ভঙ্গি বা মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে হইলে, দেহ এবং মন উভয়কেই কত ভক্তিভাবে,কত প্রেমভরে, কত তদ্গতচিত্তে, কত বিচারশক্তি সহকারে অধ্যয়ন করা আবশ্যক এবং মানসিক শক্তি এবং শিক্ষা কত বেশী হইলে সে রকম অধ্যয়ন সম্ভব হয়, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। বুঝিয়া দেখিলে তবে জানিতে পারিবে যে, পৌত্তলিকতা মানুষের অবনতি-ব্যঞ্জক নয়, প্রভূত এবং প্রকৃত উন্নতিব্যঞ্জক। এই জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষী হইয়াও এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা মানুষের অধম অবস্থার ধর্ম্ম নয়।†

ফল কথা, মনের শক্তি বা গুণ জড়-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করার নাম পৌত্তলিকতা বা idolatry। শুধু তাই নয়। যে মানসিক শক্তি বা গুণ পৌত্তলিকতায় জড়-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হয়, সে শক্তি বা গুণ, চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় এমন, কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষে অবস্থিত নয়। সে শক্তি বা গুণ পৌত্তলিক নিজ মনে নিজ মানসিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু সেইরূপ উপলব্ধি করার নাম idealisation বা ভাবাভিনয়ন। অতএব idolatry বা পৌত্তলিকতার অর্থ artistic idealisation বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন। এখন দেখিতে হইবে যে, পৌত্তলিকতা যদি artistic idealisation বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়নই হয়, তবে ধর্ম্মোন্নতির

---

* "The idol usually assumes the human form"—Sir John Lubbock's *Origin of Civilisation* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৫৯ পৃষ্ঠা।

† "The worship of Idols characterises a somewhat higher stage of human development. We find no traces of it among the lowest races of men." Sir John Lubbock's *Origin of Civilisation* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৫৬ পৃষ্ঠা।

নিমিত্ত মানুষের পৌত্তলিকতার আবশ্যক আছে কি না। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সর্ব্বপ্রকার মানসিক শিক্ষা এবং সকল শিক্ষা অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, idealisation বা ভাবাভিনয়ন দ্বারা যত সাধিত হয়, তত আর কিছুরই দ্বারা হয় না। উচ্চ কাব্য পড়িয়া হৃদয়ের যে শিক্ষা হয়, দর্শন বা নীতিশাস্ত্র পড়িয়া তাহার এক শতাংশও হয় না। দর্শন বা নীতি শাস্ত্রের কার্য্য বুদ্ধিবৃত্তির উপর। কাব্যের কার্য্য হৃদয়ের উপর। দর্শন বা নীতিশাস্ত্র—বিচার করার, তর্ক করার, বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি দেয়। কাব্য হাসায়, কাঁদায়, আহ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে অভিভূত করে, দুঃখে গলাইয়া দেয়, রাগে আগুন করিয়া তুলে। যা করিতে পারিলে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং মানুষ প্রবৃত্তির অনুযায়ী কার্য্যের দিকে প্রধাবিত হয়, কাব্য তাহাই করে; নীতি বা দর্শনশাস্ত্র তাহা করিতে পারে না। ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে পারে, কিন্তু কাব্য যত, তত নয়। তাই সাহিত্যে কাব্যের পদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাই বাল্মীকির রামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত, দান্তের ইন্‌ফার্ণো, সেক্ষপীয়রের নাটক, শেলির গীতি, বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান রত্ন। তাই অর্ফিয়সের সঙ্গীত, ফিদিয়সের প্রস্তর-মূর্ত্তি, টর্ণর, টিশিয়ান বা রাফেলের চিত্র মানুষের মানসিক সম্পত্তির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমূল্য। অতএব যে idealisation বা ভাবাভিনয়নের গুণে কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত এত মহিমাময় এবং শিক্ষোপযোগী, সেই idealisation বা ভাবাভিনয়নের গুণে পৌত্তলিকতাই বা কেন মহিমাময় বা শিক্ষোপযোগী না হইবে? একটু খুলিয়া বলি। পতিভক্তি বা পাতিব্রত্য যে জিনিস, সকলেরই তাহার এক রকম না হয় আর এক রকম জ্ঞান বা সংস্কার (idea) আছে। কিন্তু সকলের সংস্কার সমানও নয় এবং সম্পূর্ণও নয়। কেহ মনে করেন আপনি না খাইয়া পতিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা; কেহ মনে করেন প্রতিদিন পতির চরণামৃত পান করা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু পতিভক্তির আর একটি চিত্র দেখাই দেখ দেখি। পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অবশেষে যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে রামচন্দ্রের সেই প্রজামণ্ডলী-পরিবেষ্টিত বিরাট সভায় আনয়ন করা হইল, তখন দেবীর মুখে একটি কথা নাই—রাগের, ক্ষোভের বা অভিমানের শব্দটিমাত্র নাই।

তখন দেবীর—

কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা॥ (রঘুবংশ ১৫ সর্গ)

রক্তবস্ত্রে তাঁহার শরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টিসংলগ্ন, তিনি যে পবিত্র-স্বভাবা তাহা তাঁহার সেই শান্ত মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া উপস্থিত প্রজামণ্ডলী আপনাদের প্রচারিত নিন্দাবাদের কথা মনে করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাগণের সন্দেহ নিরাকৃত করিতে দেবীকে অনুমতি করিলেন। কোমলতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবে! দেবী কহিলেন—'যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি তবে দেবি বিশ্বম্ভরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।' পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল, ভিতর হইতে বিদ্যুৎ-প্রভা উথলিয়া উঠিল। সেই প্রভারাশির মধ্যে এক অপূর্ব্ব সিংহাসনোপরি স্বয়ং দেবী বসুন্ধরা উপবিষ্টা। দেবী বসুন্ধরা দুঃখিনী সীতাকে কোলে করিয়া অন্তর্হিত হইতেছেন। তখন সীতা কি করিতেছেন?

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
মামেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ॥

তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত, বসুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাম, "না" "না" ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত!—বল দেখি, পতিভক্তির এমন চিত্র, পতিভক্তির এমন ভাব আমাদের কার্ মনে আছে? এ কি কম শিক্ষা? এ শিক্ষার তেজে একটা মানুষ কি আর একটা মানুষ হইয়া যায় না? প্রতিভা কি মানুষ গড়ে না? আবার বল দেখি, প্রতিভাশালী কবি যে চিত্র আঁকিলেন, প্রতিভাশালী চিত্রকর যদি সেই চিত্র, পটে ফুটাইতে পারেন, তাহা হইলে সে পটেই বা কি অপরূপ অপূর্ব্ব কাব্য হইয়া পড়ে, সে পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষালাভ হয়! কাব্য অপেক্ষা চিত্র অনেক সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষাসম্বন্ধে বেশী উপযোগী। কেন না কাব্য শব্দরচিত; শব্দ সঙ্কেত মাত্র, অতএব কাব্য বুঝিয়া লইতে হয়; চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই হয়। কাব্যে অনেক জিনিস বুঝান যায় না, বা বুঝান সহজ নয়,—যেমন হৃদয়ের অবস্থাবিশেষে দেহের

মূর্ত্তিবিশেষ; চিত্রে তাহা সহজেই বুঝান যায়। কবি বলিয়া দিলেন—তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত। ইহাতে পতিভক্তির তুমি একটি অপূর্ব্ব আভাস পাইলে। কিন্তু তখন সীতার সেই মুখের, সেই নয়নের কিরূপ ভাব তাহা কবি ফুটাইয়া দিতে অক্ষম, কিন্তু তাহা চিত্রিত দেখিলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি কত গাঢ়তর, কত বেশী মুগ্ধকর হইয়া উঠে, বল দেখি? তুমি আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়া সে মুখের, সে নয়নের, সে দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্তু রাফেলের সমতুল্য কোন হিন্দু চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নয়নের, সেই দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে আঁকিয়া দেখান, তাহা হইলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি কেমন অলৌকিক ভাবে ফুটিয়া মনকে মজাইয়া তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল, যাহাতে idealisation বা ভাবাভিনয়ন আছে, তাহাই মানুষের নিতান্ত আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী। আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী নয়—অপূর্ব্ব মহিমাময়। জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, যাহাই বল, প্রতিভার ন্যায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয়। স্বর্গ কেমন? যেমন রামায়ণে সীতা, ভারতে ভীষ্ম, সেক্ষপীয়রে দিস্‌দেমনা, শিলরে থেক্‌লা, সফক্লিসে অন্তাইগনি। আবার ভাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিয়া বস্তু। তবেই দেখ ভাবাভিনয়নমূলক কাব্য বা চিত্র বা প্রস্তরমূর্ত্তি কিরূপ স্বর্গীয় বস্তু—কিরূপ মহিমাময়! তাই বলি যদি শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন এতই মহিমাময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর ভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী এবং উপকারী হয়, তবে ধর্ম্মের বেলা কেনই বা মহিমাশূন্য হইবে এবং হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব বা ধর্ম্মভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ে অনাবশ্যক, অনুপযোগী এবং অপকারী হইবে? মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে ঈশ্বরের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা কেন আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইতে পারিবে না? আর প্রতিভা যদি তাহাই পারে—কাব্যে হউক, চিত্রে হউক, প্রস্তরপ্রতিমাতে হউক—প্রতিভা যদি তাহাই পারে, তবে কি জন্য আমি প্রতিভার কাছে তাহা বুঝিয়া না লইব—কি জন্য আমি আপনাকে সে শিক্ষায় বঞ্চিত করিব? মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ

না করিলে, আমি যেমন পাপগ্রস্ত হই, ঈশ্বর-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আমি কি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব না? কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল, সকলই idealisation বা ভাবাভিনয়ন—হৃদয়ের শিক্ষার প্রধান উপায়। ঈশ্বর-ভাব উপলব্ধি করা হৃদয়ের কাজ। ঈশ্বর সম্বন্ধে হৃদয়ের শিক্ষার প্রকৃত উপায় জ্ঞান বা বিচার নহে, ভাবাভিনয়নই প্রকৃত উপায়। আবার যদি ভাবিয়া দেখা যায় যে, জ্ঞান-পথ অপেক্ষা ভাবাভিনয়ন-পথ শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য মনুষ্য-সমাজে কবি চিরকালই দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা বড়;—হোমর আরিষ্টটেল অপেক্ষা বড়, বর্জিল লিবি অপেক্ষা বড়, সেক্ষপীয়র বর্কলি, হিউম, স্পেন্সর অপেক্ষা বড়, বনিয়ন জেরমি টেলর অপেক্ষা বড়, বাল্মীকি কপিল গৌতম অপেক্ষা বড়;—তাহা হইলে প্রতিভা-প্রসূত-ভাবময়-কীর্ত্তি-অধ্যয়নই যে ঈশ্বর-ভাব পরিপোষণ এবং পরিস্ফোটনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহিমাময় পথ বা প্রণালী, ইহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞান-পথ অপেক্ষা কল্পনা-পথ শ্লাঘনীয়। অতএব ঈশ্বর-ভাব * ফুটাইতে ভাব বা কল্পনা পথ অনুসরণ করা, জ্ঞান-পথ অনুসরণাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় এবং বেশী গৌরবের কার্য্য।

তাই বলি পৌত্তলিকতা অপরিহার্য্য, পৌত্তলিকতা নহিলে মানুষের চলে না এবং চলিবে না, পৌত্তলিকতা ব্যতীত ঈশ্বর জ্ঞান হয় না—হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব পরিপুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত হয় না—মানুষের ধর্ম্মশিক্ষা সুকঠিন। সেই জন্যই যেখানে ঈশ্বরের মূর্ত্তি গড়া নাই, সেখানে হয় যীশুখ্রীষ্ট, নয় মহম্মদ। আর যেখানে তাহাও নাই, সেখানে হয় কিছুই নাই নয় আপনিই সর্ব্বস্ব। কিন্তু প্রকৃত পৌত্তলিক এখনও জন্মে নাই; যে প্রতিভা অনন্তের অনন্ত গুণ কথঞ্চিৎ মঠে পটে ফুটাইয়া দেখাইবে, সে অসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব এখনও হয় নাই। কিন্তু হইবে। রস্কিণ (Ruskin) বলিতেছেন †:—"Sacred art, so far from being exhausted, has yet to attain the development of its highest branches; and the task, or privilege, yet remains for mankind, to produce an art which shall be at once entirely skilful and entirely *sincere.* * * * Religious art, at once complete and sincere, never yet has existed. *It will exist.*" তাই বলি, পৌত্তলিকতার গৌরবের দিন এখনও আসে নাই—উন্নত ধর্ম্মশিক্ষা এখনও

* ঈশ্বর-জ্ঞান নয়। † *Modern Painters* গ্রন্থের ৩ বালম ৫৯।৬০ পৃষ্ঠা।

হয় নাই—ঈশ্বর-ভাব বা ঈশ্বর-মূর্ত্তি মানব-হৃদয়ে ভাল করিয়া এখনও ফোটে নাই। সে শুভ দিনের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। পৌত্তলিকতার পূর্ণ মহিমা ভবিষ্যতে বিকশিত হইবে। মানুষের অদৃষ্টে এখনও অপূর্ব্ব সুখ-সৌভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলিবেন, জড়বস্তু দ্বারা সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে পারি, ঈশ্বরেব কেমন করিয়া গড়িব? ঈশ্বর চিন্ময়—বড়ই উত্তম, বড়ই পবিত্র; পুত্তলিকা জড়—বড়ই অধম, বড়ই অপবিত্র। ইহার প্রথম উত্তর- যেমন করিয়াই ঈশ্বরের ধ্যান কব, মনে মনেই কর, আর পট পুতুল দেখিয়াই কর, তাঁহাকে আকার বিশিষ্ট না করিলে ত চলে না। আত্মাপ্রধান মহাযোগীরা যোগে তাঁহাকে মূর্ত্তিময় দেখেন।

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে॥ (রঘু—১০ম সর্গ)

যোগিগণ মোক্ষ-কামনায় অভ্যাস দ্বাবা চিত্ত সংযম করিয়া, হৃদয় মধ্যে তদীয় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া থাকেন।

অতএব যদি মূর্ত্তিই গড়িতে হইল, তবে মনে মনে গড়িলেই বা ন্যায্য কেন, জড়বস্তু দ্বাবা গড়িলেই বা অন্যায্য কেন? দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ঈশ্বরের জড়মূর্ত্তি গড়িলে কেমন করিয়া তাঁহার অবমাননা করা হয় এবং কেমন করিয়া অপকর্ম্ম করা হয়, বুঝিতে পারি না। দেহ এবং মনে, আত্মায় এবং জড়ে যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ থাকার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ জড় যদি আত্মার আকাঙ্ক্ষা এবং চরম মূর্ত্তি হয়, তবে জড়ের সাহায্যে আত্মা চিত্রিত কবিলে কেমন করিয়া আত্মার অবমাননা করা হয় বুঝিতে পারি না। তুমি মুখে বল জড় অতি অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র। কিন্তু তোমার আত্মা ত জড়ের আকাঙ্ক্ষা করে, জড়ে পরিণত হইয়া চরিতার্থ হয়। তোমার আত্মার কাছে জড় ত তাহা হইলে অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র নয়। তবে কেন জড়ের দ্বারা আত্মার মূর্ত্তি গঠিত হইবে না? আরো এক কথা। তুমি কেমন করিয়া বল যে জড় অপবিত্র এবং অপকৃষ্ট? জড় জগতে জগদীশ্বরের কত যত্ন, কত প্রেম, কত শক্তি-সঞ্চার তাহা কি দেখিতেছ না? একটি গাছের পাতা কত যত্নে, কত প্রেমভরে, কত শক্তি সহকারে রচিত বল দেখি? ভাল, তুমি যে গাছের পাতাটাকে অপকৃষ্ট জড় বলিয়া ঈশ্বর পূজায় ঈশ্বর পদে অর্পণ করিতে ঘৃণা বোধ কর, তুমিই সেই রকম একটা গাছের পাতা গড় দেখি। আচ্ছা,

পাতা ত বড় জিনিস—একটি বালির কণা গড় দেখি। তুমি কি বুঝ না, যে অনন্ত শক্তি হইতে আত্মা উদ্ভূত হয়, সেই অনন্ত শক্তির কণামাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইলে একটি বালির কণাও গঠিত হইতে পারে না? তবে কেন আত্মা অপেক্ষা জড়কে এত নিকৃষ্ট দেখ? যে জড়ের কণামাত্র নির্ম্মাণ করিতে অনন্ত পুরুষের অনন্ত শক্তির প্রয়োজন, তুমি আমি কে, যে সেই জড়কে নিকৃষ্ট বা অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিব? তুমি আমি মানুষ। মানুষের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা কি করেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। বাল্মীকি, সেক্ষপীয়র, কালিদাস, দান্তে, হোমর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ—সকলেই নর-দেবতা। কিন্তু সকলেই আজীবন জড়জগৎ অধ্যয়ন করিয়া অসীম যত্ন সহকারে এবং প্রীতিভরে জড়জগৎ চিত্রিত করিয়া আপন আপন জীবন চরিতার্থ এবং অসাধারণ প্রতিভা অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। আজিও নরশিরোমণিরা—টিনডাল, হক্সলি, ডারবিণ, প্রভৃতি পণ্ডিতেরা—জড়জগৎ অধ্যয়ন করিয়া পবিত্র হইয়া যাইতেছেন! যে জড় অধ্যয়নে নরদেবতাদিগের এত যত্ন, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা এবং স্পর্দ্ধা, যে জড় অধ্যয়ন করিয়া নরদেবতাগণ এত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়া তুমি সেই জড়কে অপকৃষ্ট এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর? কি বলিয়া তুমি সেই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ঘৃণা বোধ কর? আমি এ কথা স্বীকার করি, যে ঈশ্বর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই মূর্ত্তিটিকে পূজা করা কর্ত্তব্য নয়, সেই মূর্ত্তিতে যে ঈশ্বর-গুণ ব্যক্ত থাকে তাহাই পূজা করা কর্ত্তব্য। সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপুস্তকের শিক্ষাও তাই। এমন কি বাইবেলেও তাই বলে। বাইবেলে প্রকৃত পক্ষে পৌত্তলিকতা নিষিদ্ধ নয়। বাইবেলে বলে—পৌত্তলিকদিগের সহিত সংস্রব রাখিও না, কারণ তাহা হইলে "they will turn away thy sons from following thee, that they may serve *other* gods." (দিউতারনমি, ৭,৪) প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বর ভুলিয়া অন্য দেবতার পূজা করাই দোষ। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরকে পূজা করা দোষ নয়। ইস্‌রায়েলের ঈশ্বর আপনাকে *jealous* দেবতা বলিয়া (এক্সোদস্‌, ২০—৫) পরিচয় দিয়া ইস্‌রায়েলকে প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার ভয়ে পৌত্তলিকতা নিষেধ করিয়াছিলেন। পাছে দুর্ব্বল-মতি ইসরায়েল সোণা-রূপার প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া সোণারূপায় মজিয়া সোণারূপাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, সেই ভয়ে ঈশ্বর ইস্‌রায়েলকে সোণারূপার প্রতিমূর্ত্তি গোড়াইয়া

ফেলিতে অনুমতি করেন। সোণারূপায় না মজিলে, সোণারূপার মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বর পূজা করিতে কোন দোষ নাই। যে দুর্ব্বল, সেই মূর্ত্তি-ব্যক্ত ভাবে না মজিয়া, মূর্ত্তিতে মজে। মূর্ত্তি পূজা বা পৌত্তলিকতা দূষণীয় নয়, তবে শিক্ষিত, সংযতচিত্ত, উন্নত মনুষ্যের পক্ষেই বিহিত।

তাই বলি, ভাই, জড়ে আত্মায় ইতরবিশেষ করিও না। যে জড়ে—যে ফুলে—যে বৃক্ষপত্রে—যে বৃক্ষফলে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত, প্রেমভরে বিরাজিত, তাহাকে অপবিত্র বা অপকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিও না। সে সকলই ঈশ্বরের বস্তু, ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। অতএব আইস ঐ পুণ্যপুরী জগন্নাথক্ষেত্রে—যেখানে সম্মুখে ঈশ্বরের মহাসমুদ্র, পশ্চাতে ঈশ্বরের মহাগিরি, উপরে ঈশ্বরের মহাকাশ—তাহে নানা বর্ণের নানা কণ্ঠের ঈশ্বরের সঙ্গীতস্রাবী পক্ষী,—যেখানে চারিদিকে ঈশ্বরের গাছ, ঈশ্বরের পাতা, ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল—আইস ঐ পুণ্যক্ষেত্র মাঝে, অপূর্ব্ব অলৌকিক কবি প্রতিভা-নির্ম্মিত ঈশ্বরের অনন্ত সুন্দর অনন্ত-প্রেমময় মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গলদশ্রু নয়নে ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরের পাতা, ঈশ্বরের লতা, ঈশ্বরের ধূপ, ঈশ্বরের দীপ, অনন্ত ঈশ্বরের অগণ্য নিধি,—আর ঐ মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহাকাশ, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ফুল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই হৃদয় ভরিয়া অঞ্জলি পুরিয়া উপহার দিয়া অনন্ত ঈশ্বরের ষোড়শোপচারে পূজা করি! অথবা আইস আজি বঙ্গের শুভদিনে অনন্ত পুরুষের অনন্ত শক্তিরূপিণী দশভূজার পদে অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত ফুল, ফল, ধূপ, দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র সকলই উৎসর্গ করিয়া অনন্তের ষোড়শোপচারে পূজা করি!

ষোড়শপচারে পূজা আমাদের হিন্দু পিতৃপুরুষগণ ব্যতীত আর কেহ কখনও করে নাই। ষোড়শোপচারে পূজা প্রকাণ্ড হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কার্য্য—প্রকাণ্ড হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কথা। কাল, প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্বব্যঞ্জক একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছিলাম—তুষানল। আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব-ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম—ষোড়শোপচারে পূজা। আইস, তুষানলে এবং ষোড়শোপচার পূজায়, আবার সেই প্রকাণ্ড হিন্দুর সেই অলৌকিক অলোক-সামান্য প্রকাণ্ডত্ব পুনর্লাভ করি।

হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ।

ধর্ম্মের সহিত সমাজের নিগূঢ় সম্বন্ধ। ধর্ম্ম বন্ধনই সমাজ বন্ধনের মূল। সমাজের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইলে, সমাজ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হয়, অনাচার যথেচ্ছাচার তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। যে সমাজে ধর্ম্ম শাসন নাই, সে সমাজের লোকের আচার ব্যবহারের কোন প্রকার নিয়ম থাকে না। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেই,ভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, কিসে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হইবে, এ চিন্তা তাহাদিগের মনে স্থান পায় না। কোন্ কার্য্যে সমাজের ইষ্ট হইবে, কিসেই বা অনিষ্ট ঘটিবে, ইহা কেহ ভাবিতে চেষ্টা করে না। সকলেই আপনার সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে। ধর্ম্মনিয়মে সমাজ-বদ্ধ থাকিলে এইরূপ যথেচ্ছাচার ঘটে না। সকলেই একই নিয়মে কার্য্য করে, একই ভাবে সমাজে বিচরণ করে, সেই একতায় সমাজেব বল বৃদ্ধি হইতে থাকে ও তদ্দ্বাবা সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।

ধর্ম্মদ্বারা সমাজকে বাঁধিলে সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মবিধি যদি সমাজের অবস্থার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে সমাজকে সে নিয়ম দ্বারা অনুশাসিত করা সুকঠিন। কালের অনতিক্রমণীয় শক্তির অধীন হইয়া সমাজস্থ জনগণ সমাজকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে চাহেন, সমাজের ধর্ম্ম যদি তাহার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে বিষম ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বল যদি অধিক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম সে সমাজকে শাসন করিতে পারে না। দুর্ব্বল ধর্ম্ম, বলবান সমাজবাসীগণেব নিকটে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। এই জন্য দেখা যায়, সমাজ যেরূপ অবস্থাপন্ন ধর্ম্মও ঠিক তাহার অনুরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল হওয়াতে ধর্ম্মের মূল নষ্ট হয় না। ধর্ম্মে যে সকল অবিসম্বাদী সত্য আছে, তাহা সৃষ্টিকাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহা থাকিবে। তবে ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক যে সকল অবান্তরধর্ম্মনিয়ম থাকে, সমাজের অবস্থানুসারে তাহারই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আমার

ক্তব্য বিষয়টি আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। জগতের াল্যাবস্থাতে মনুষ্যের ধর্ম্মের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজ ঊনবিংশ তাব্দীতে আমরা তাহার কোন নিদর্শনই পাই না। কিন্তু সেই সময়ে র্ম্মের যে মূল ভাব ছিল, আজিও যে সেই ভাব বর্ত্তমান আছে, এ কথা বলিলে বাধ হয় কেহই আশ্চর্য্য হইবেন না। পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই াশ্চর্য্য কৌশল রচিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া যেমন প্রত্যেক পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে ূজা করিয়াছিলেন, আজ আমরা ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরের পূজা করি না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে মহাশক্তির অবস্থান দেখিয়া সেই বাহ্য স্তুতে মহাশক্তির পূজা করিয়াছিলেন, আমরাও আজ সেই মহাশক্তির পূজা করিতেছি। ইহাতে ধর্ম্মভাবের মূলগত একতা দেখা যাইতেছে। অথচ সৃষ্টিকাল হইতে এই অবিনশ্বর একমাত্র ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতেছে। সমাজের অবস্থানুসারে ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আর্য্য ঋষিদিগের সময় হইতে ভারতে এক হিন্দুধর্ম্ম কত প্রকার পরিচ্ছদে প্রকাশমান হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত যে হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রচলিত হইয়াছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। সমাজের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন যে কেবল ভারতেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে। জগতের সর্ব্বত্রই একই নিয়মে কার্য্য হইয়া আসিতেছে। ঊনিশ শত বৎসর মাত্র যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন-শীলতার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ রূপে প্রতিতী হইবে যে, সমাজের অবস্থা ও গতি অনুসারে ধর্ম্ম নিয়মিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় রোমান ক্যাথলিক মত চলিয়াছিল, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়াই প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হয়। আবার যে অবস্থায় প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে অবস্থার ব্যত্যয় ঘটিতেছে বলিয়া ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট মত পুনঃসংস্কৃত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধর্ম্মের বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ধর্ম্মের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত প্রচলিত হওয়ার পর হইতে সমাজের অবস্থা অনুযায়ী ধর্ম্ম আর

প্রচলিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, চৈতন্যদেব ঠিক ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই, তিনি ভক্তিবিপ্লব সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সমাজের সকল তত্ত্বের গূঢ় ভাব ঠিক সেই সময়ে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতেই সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হন নাই। তথাপি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-অনেক পরিমাণে যে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, সে সময়ে হিন্দু সমাজ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। অধ্যাপকদিগের মুখে নীরস জ্ঞানমূলক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী অনেক পণ্ডিতগণের মধ্যে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, যাজক ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মাপেক্ষা অর্থলিপ্সা অধিক দেখিয়া, লোকের মন বিরক্ত হইয়া উঠে। ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া প্রেমমূলক বৈষম্য-বিরোধী ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত-গণ তাঁহাদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় দেখিয়া তাঁহারা চৈতন্যদেবকে অপদস্থ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা আত্মীয় বন্ধুগণের ভয়ে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিলেন না, তাঁহারা গোপনে যোগ দিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজ টলমল করিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। সমাজস্থ লোকের হৃদয় যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত অনেক পরিমাণে তাহার উপযোগী হইয়াছিল বলিয়াই সকলে হিন্দুধর্ম্মের কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করিয়া এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুসমাজের নেতাগণ দেখিলেন যে, সমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে লোককে ধর্ম্মশাসনে শাসিত করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারা সমাজবন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন টীকা করিলেন, সমাজবাসীগণকে সময়োপযোগী স্বাধীনতা দিলেন, সুতরাং সমাজে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সেই সময়ে রঘুনন্দন যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন টীকা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া প্রণয়ন না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হিন্দু সমাজে একটি বিষমতর বিপ্লব উপস্থিত হইত।

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সমাজের অবস্থানুসারে উপধর্ম্মবিধি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এক্ষণে হিন্দুসমাজের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে,

তাহাতে পূর্ব্ব প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যে সমাজের উপযোগী নহে, ইহা গোঁড়াগণ ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম যদি সমাজের উপযোগী হইত, ইহার বিধিব্যবস্থা যদি সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের অনুমোদনীয় হইত, তাহা হইলে সমাজ হইতে দলে দলে লোক বাহির হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত না। খৃষ্টধর্ম্ম এ দেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবামাত্র, যে লোকে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ধাবমান হইতে লাগিল, ইহার অভ্যন্তরে কি কোন কারণ নাই? খৃষ্টধর্ম্মের নীতি কি হিন্দুধর্ম্মনীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে সেই জন্য লোকে সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ম্মের অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের বাহ্য উদারতা দেখিয়াই যে লোকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এ কথা বলিবার প্রয়োজন করে না। ঠিক এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় বঙ্গ সমাজক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। হিন্দুসমাজের লোকের হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে তিনি তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া তিনি তদুপযোগী ধর্ম্মমত হিন্দুশাস্ত্র হইতেই প্রচার করিলেন। একটি দুইটি করিয়া ক্রমে ক্রমে বহু লোক তাঁহার প্রচারিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের সকল স্থানের লোকই খ্রীষ্ট ধর্ম্মেবীতশ্রদ্ধ হইলেন।

ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে লোকের মন সরল ও উদারভাব-পূর্ণ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যেরূপ ধর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হইতে পারে, যে ধর্ম্মের সাধনপ্রণালী সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইতে পারে, যে ধর্ম্ম সংসারকে উপেক্ষা করিয়া যখন তখন বনে গমন করিতে উপদেশ প্রদান করেন না, অথবা সংসারীর জন্য স্বতন্ত্র প্রকার শিথিল বিধি নির্দ্দেশ করেন না,—এইরূপ ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের চিত্ত প্রধাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ম্ম হিন্দু সন্তানদিগের চিত্তের এই সকল বাসনা মিটাইতেছেন না, সুতরাং পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ম্মের প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম যদি হিন্দু সন্তানদিগের হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ক্রমে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা

হ্রাস হইবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম্মের নীতি যেরূপ উচ্চ, তাহাতে এ ধর্ম্ম চিরদিন জগতে মস্তকোত্তলন করিয়া থাকিবে। আমরা এইরূপ মতাবলম্বীদিগের মতের প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে এই ধর্ম্মের নীতি খুব উচ্চ, ইহার উপদেশ খুব গভীর ভাবপূর্ণ, একথা জানিয়া বা শুনিয়া কি ধর্ম্ম পিপাসুর হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? শাস্ত্রোক্ত বাক্য বা উপদেশের মর্ম্ম আপনার জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে, কোন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এইখানে কথা এই, হিন্দুর উপধর্ম্ম কি হিন্দুসন্তানদিগের এইরূপ পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন? হিন্দুসন্তান কি শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া ধর্ম্মামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হইতেছেন?—ঐ যে হিন্দুসন্তান ভাগ্য দোষে শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহার ঐ সাগর মন্থনে কি অধিকার আছে? ঐ ব্যক্তি যদি সাহস করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ঐ মুণ্ডিত-মস্তক, কুঞ্চিত-ললাট, শিখা ধারী, যজ্ঞসূত্র-অধিকারী হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, উহাকে পাষণ্ড অভিধানে অভিহিত করিয়া নরকে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। হতভাগ্য শূদ্র যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে যদিও সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তথাপি তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চার অধিকার নাই, তাঁহাকে ঐ হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। ইহাতে কি তাহার পিপাসা শান্তি হইতে পারে? এইজন্যই বলিতেছি, পূর্ব্বপ্রচলিত হিন্দুর উপধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে অসমর্থ। এখন হিন্দুর উপধর্ম্ম যদি এই কার্য্য সাধনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদায় দিয়া যে ধর্ম্মে আমাদিগের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে, তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। এইস্থানে একবার একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন হইতেছে। "পূর্ব্ব প্রচলিত" হিন্দুর উপধর্ম্ম সমগ্র হিন্দুসন্তানের ধর্ম্ম-পিপাসা মিটাইতে অক্ষম, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ইহাতে অসমর্থ কি না, তাহা একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিকট হইতে চিরবিদায় লইলে ভাল হয়।

বাঙ্গালির দুর্গোৎসব।

বাঙ্গালির দুর্গোৎসব বড়ই বৃহদ্ব্যাপার। বালক কাল হইতে বর্ষে বর্ষে নিত্য ক্রিয়ার মত, দিবাকরের উদয়াস্তের মত এই দুর্গোৎসব আমরা দেখিয়া আসিতেছি তাহাতেই দুর্গোৎসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না। শারদীয়া মহাপূজার প্রতিমায় সর্ব্বকালিক উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি সমষ্টি আছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং মানব কালে কালে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেব ভক্তি পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে, দুর্গোৎসবের উপকরণে তাহার সকল গুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব সকল কালের সকল প্রকার পূজার সংকলন বা (Synthesis)। শারদীয়া পূজা—প্রকৃতই মহাপূজা। এরূপ পূজা আর কোন দেশে নাই; ইহা পূজার কল্পদ্রুম বা (Encyclopædia)। স্বার্থ-চালিত জুবর্ট সাহেবের প্ররোচনায় যেমন জন কতক সাহেব শুভো কলিকাতার গড়ের মাঠে নানা দেশের শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেরূপ ভাবে জন কতক মুনিঋষির খেয়ালে, বা জন কতক স্বার্থপর পুরোহিতের প্ররোচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহানুষ্ঠান সংগৃহীত হয় নাই। যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণী পৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাবে কাল মাহাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মে স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে, সেই ভাবে বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে নানা রূপ উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; অতীত-ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শ মত সেই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। যে বিবর্ত্তন-বিকাশ জড়-জীব-জগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বলেই, সেই বৈদিক কালের শক্তিরূপা অতসী বর্ণময়ী উজ্জ্বলা অনল-শিখা, আজি এই অধঃপতনের দুর্দ্দিনে সর্ব্বদেব-পরিবেষ্টিতা মহাশক্তিতে চণ্ডীমণ্ডপ মণ্ডিত করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্তি-শক্তি, উপনিষদের শব্দ-শক্তি, পুরাণের দেব-শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাতৃ-শক্তি, বাঙ্গালির কন্যা-শক্তি, আর কত কালের কতরূপ শক্তি, আজি ইতিহাসের মহা রাসায়নিক সংযোগে দ্রবীভূত অথচ বিবর্ত্তনে বিকশিত হইয়া দুর্গোৎসবের কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তি

রূপে বিরাজ করিতেছেন। ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি—গণ-শক্তি, রণ-শক্তি—পাশব শক্তি, দানবশক্তি—বৃক্ষঃশক্তি, শিলাশক্তি—অগণিত দেবশক্তি—সেই মহা কেন্দ্রের মহাবৃত্ত ভাবে মহাশক্তির শক্তিপোষণ, শোভাময়ীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। এমন দালানভরা ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা প্রতিমা, এমন কালভরা পদ্ধতি, এমন জগতভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পূজা, এমন প্রবৃত্তিভরা উৎসব—আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব মানবের হৃদয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গালির পরম গৌরবের পরিচয়।

নিতান্ত অসভ্য মানবমণ্ডলী হইতে,পরিস্ফুট-চিত্তবৃত্তি সভ্য জাতি পর্য্যন্ত সকল জাতিই সকল সময়ে সকল দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি বিশেষশক্তিকে জড় জগতের জীবন বলিয়া মনে করিয়া,—ভয়,ভক্তি—সান্ত্বনা, রঞ্জনা,—আরাধনা, উপাসনা করিয়া থাকে। প্রথমে মানবের কিরূপে শক্তি-জ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্ শক্তির আরাধনা করিতে আরম্ভ করে, পরে ক্রমেই বা কোন্ শক্তির স্বত্তা মনুষ্য উপলব্ধি করে, এ সকল কথার আলোচনা করায় আমাদের অদ্য কোন প্রয়োজনই নাই; মানবহৃদয়ে দেবোপাসনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস চর্চ্চায় অদ্য আমরা প্রবৃত্ত নহি। উপাসকগণ সময়ে সময়ে যে যে পদার্থে যে ভাবে জগজ্জীবনী শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং যে ভাবে সেই শক্তির উপাসনা করিয়াছেন, তাহারই কতক কতক বুঝা অদ্য আমাদের আবশ্যক।

সকল দেশেই বোধহয় উপাসনার প্রথম অঙ্কুর ভীতি-জড়িত। ভূত, প্রেত —দৈত্য, দানব,—সিংহ, শার্দ্দূল,—শস্ত্র, সর্প—এই সকল সেই সময়ের উপাস্য দেবতা অথবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা। এরূপ দেবতার রঞ্জনা বা সান্ত্বনা করাই সেই সময়ের উপাসনা। শারদীয়া মহাপূজায় এই ভীতিভর উপাসনার সকল রূপ উপাস্যই আছেন, সকল রূপ আলম্বনই ইহাতে বিদ্যমান। আর সেই অসভ্য কালের উপাসনাই কি আমরা ছাড়িতে পারিয়াছি! এই বিশাল শ্মশান ক্ষেত্রে অগণিত ভূত-প্রেত আজিও বীভৎস ভাবে, বিকট মূর্ত্তিতে আমাদের অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে স্বেচ্ছা বিচরণ করিতেছে, এবং স্থানে স্থানে চিতাবহ্নির ধূসর আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় ভীষণকে আরও ভীষণতর বোধ হইতেছে। প্রেতগণের বিকটমূর্ত্তি, অট্টহাস্য বীভৎসলীলা, পৈশাচিক ব্যবহারে আমরা সকলেই ভীত, স্তব্ধ, স্পন্দ-রহিত। কাজেই ভয়-জড়িত হৃদয়ে নিতান্ত অসভ্যের মত আমরা সেই প্রেতগণেরই

উপাসনা করিতেছি। তাহার উপর,ঐ সকল দৈত্য দানবের দারুণ দলন,সিংহ শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, এবং রক্ত মাংস লোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট অস্ত্র সকলের প্রতিনিয়ত রক্তলালসার ঝঞ্ঝনা, আর ঐ তীব্রচক্ষু কণ্টক-জিহ্ব খল সর্পের কালকূট বিস্তারণ। কাজেই আমরা পিশাচ-পীড়িত, দৈত্য-দলিত, সিংহ-হিংসিত, শস্ত্র-শাসিত, এবং সর্প-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ভীতিভরে গলবস্ত্রে গলদশ্রু হইয়া এই প্রেত-পশু-দানব-সর্প-শক্তির নিয়ত উপাসনা করিতেছি। অসভ্যের দেবপূজা আমাদের নিত্যক্রিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্ব্বত,বৃক্ষ,নদ নদীর উপাসক। বাল্য-ক্রীড়ারত অপোগণ্ড মানব দেখিল—সম্মুখে মহান্ হিমালয়, উত্তুঙ্গ শৃঙ্গসহস্র লইয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান। সূর্য্যরশ্মিতে মস্তকের কিরীটিপুঞ্জ ঝকমক করিতেছে। মেঘের পর মেঘ আসিয়া বিশাল স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে; পর্ব্বতের বিরাগ নাই, বিকম্প নাই। সহসা পর্ব্বত ভ্রূকুটি করিল,স্ফুলিঙ্গ ছুটিল, পরক্ষণেই ভীষণ গর্জ্জন। গুড়্ গুড়্ শব্দে আকাশ পাতাল সেই গর্জ্জনে প্রতিধ্বনি করিতেছে। মানব তখন বুঝিল,—পর্ব্বত রাগে, পর্ব্বত গর্জ্জায়, পর্ব্বত হাসে, পর্ব্বত কাঁদে। পর্ব্বত তাহারই মত। তবে তাহা অপেক্ষা প্রভূত বলশালী এবং বিশাল আয়ত। মানব বলিল ঐ দেবতা। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ,—ঝঞ্ঝার সময় আশ্রয় দেয়, রৌদ্রে ছায়া দান করে, কত পাখী ডাকিয়া আনিয়া গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দোল খাওয়ায়; মানব বুঝিল এই এক দেবতা। নদী—তৃষ্ণার সময় শান্তিদায়িনী,—রৌদ্রের সময় অবগাহনে স্নিগ্ধকারিণী, কিন্তু রাগিলে খরস্রোতে কুলপ্লাবনে সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়,—মানবের চক্ষে নদী আর এক দেবতা।

আর একটু সভ্য হইলে মানব শস্য পূজা করে। যাহা জীবনের অব-লম্বন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী। ক্রমে সকল বৃক্ষেরই উপকারিতা মনুষ্য উপলব্ধি করিতে থাকে, কাজেই উদ্ভিদুপাসক হয়। দুর্গোৎসবে ইহার সকলগুলিই আছে। দুর্গোৎসবে পর্ব্বতের প্রতিনিধি রূপে শিলাখণ্ডের পূজা করিতে হয়; নদ নদীর পূজা করিতে হয়; বিশেষ করিয়া শস্যের পূজা করিতে হয়, এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত উদ্ভিদ্ জাতির প্রতিনিধি লইয়া উদ্ভিদের উপাসনা করিতে হয়। ইহারই নাম নবপত্রিকা পূজা।

রম্ভা, কচী, হরিদ্রাচ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমৌ,
অশোকো, মানকশ্চৈব, ধান্যঞ্চ, নবপত্রিকা।

নবপত্রিকার এই পরিচয় শুনিলে মনে হয়, যে এত গাছ পালা থাকিতে এই নয়টিরই বা কেন পূজা হয়?

ঐ প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর আছে। ঐতিহাসিক, বৈষয়িক, এবং আধ্যাত্মিক। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, কালে কালে মানব যত প্রকার উদ্ভিদের পূজা করিয়াছে, তাহার সকল প্রকার ঐ নয়টিতে আছে। বৈষয়িক ব্যাখ্যা এই যে, যে যে কার্য্যে মানবের উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়, তাহার সকল কার্য্যের উপযোগী এক এক উদ্ভিদ্ নমুনার মত ঐ নয়টিতে আছে। অন্নের জন্য ধান্য আছে; তরকারির জন্য কচ্বী আছে; মসলার জন্য হরিদ্রা আছে; মণ্ডের জন্য মাণ আছে; মিষ্টের জন্য রম্ভা আছে; অম্লের জন্য দাড়িম্ব আছে; ঔষধের জন্য বিল্ব আছে; শোভার জন্য অশোক অছে; উৎসবের জন্য জয়ন্তী আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এক এক প্রকার উদ্ভিদ্ দর্শনে মনে এক এক রূপ ভাবের উদয় হয়; উদ্ভিদ্ অবলম্বনে মনে যে কয়প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে, নবপত্রিকায় তাহার সকলগুলিই হয়। গ্রন্থে আছে, রম্ভা শান্তি-প্রদায়িনী। আমাদের সত্য সত্যই বোধ হয়, কলা গাছগুলির বড়ই ঠাণ্ডা মূর্ত্তি। কেমন জল ভরা ভাব, সুগোল বলন, মসৃণ ত্বচ্, শীতল স্পর্শ; ঠাণ্ডা-সবুজ চৌড়া পাতাগুলি—যেন চিরদিনই ধীরে ধীরে দূরস্থিত আর্ত্তজনগণকে বীজন করিতেছে; কোথাও যেন রুক্ষ ভাবের একটু ছায়াও নাই, যথার্থ শান্তমূর্ত্তি। জয়ন্তীর জয়শ্রীভাব। কদলীর শান্তিময়ী শোভা জয়ন্তীতে এক বিন্দু নাই; অথচ জয়ন্তীতে শোভার অভাব নাই; ছোট ছোট পাতাগুলি কেমন সাজান গোছান, অল্প বাতাসে কেমন ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে; তাহার সকলগুলিই চঞ্চল, সকলগুলিই উল্লসিত। জয়শ্রী এমনই বটে। অশোকে শোকশান্তি হয়। সেই যে ফুলের ভরে, বৃক্ষ নত হইয়াছে, শোভা ধরে না, তবু অহঙ্কার নাই, দর্প নাই—তাহাতে শোকার্ত্তের শোকশান্তি হয় কি না, আমরা জানি না, কিন্তু প্রাচীনেরা ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের সকল ব্যাখ্যার অনুশীলন করিবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই, যে এইরূপে দুর্গোৎসব পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে নানা বিষয়ের সমষ্টি নানা ভাবে বিন্যস্ত আছে।

মনুষ্য আবার সময় বিশেষে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাসক। এমনও অনেকে অনুমান করেন, যে এক সময়ে পৃথিবীর সভ্য স্থানের সর্ব্বত্র

সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। আসিরি, মিসর, যুনানী, রোমক সর্ব্বত্রই সূর্য্যোপাসনা ছিল; আসিয়ার আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ রূপেই ছিল। অতি প্রাচীন কালে, আর্য্যঋষিগণ হিমালয়ের সানুদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উষারঞ্জিত নভোপটে নয়নক্ষেপ করিয়া সূর্য্যাগমন প্রতীক্ষায়,ভূর্ভুবস্ব রবে দিক্ পরিপূরিত করত সূর্য্য-স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন; মধ্যকালে তন্নুমিশ্র স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াও সূর্য্য মহিমা ভুলিতে পারেন নাই; দিল্লীর নিকটস্থ যমুনা পুলিনে একাকী দণ্ডায়-মান হইয়া ভৈরবরাগে সূর্য্যবন্দনা করিয়াছেন।* ইদানীন্তন কালে ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্‌টেয়ার নাস্তিক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই বল্‌টেয়ার একবার সূর্য্যপানে চাহিয়া দেখিলেন,সেই জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু ধাঁদিয়া গেল; তাঁহার মানস ভরিয়া উঠিল; হৃদয় গলিল; বল্‌টেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি জগদীশ্বর থাকেন, তবে ঐ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি; আমি ঐ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি।" এইরূপে দেখাযায়, যে জগচ্ছবির উজ্জ্বল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কোন না কোন মনুষ্যের উপাসনীয়। নবগ্রহ পূজা দুর্গোৎসবের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন; পূজার পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ স্বতন্ত্র। এরূপ বিভেদেরও ঐতিহাসিক, বৈষয়িক, এবং আধ্যাত্মিক কোন যুক্তি আছে কি না, তাহা আমাদের বুঝিবার কথা, ভাবিবার কথা। প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণা, যাঁহাদের পণ্ডশ্রম বলিয়া ধারণা নাই, তাঁহারা যদি এইরূপ সকল বিষয়ে, আপনার বুদ্ধিবিবেচনার ব্যায়াম করেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি, যে বাঙ্গালির এই বিষম ব্যাপার দুর্গোৎসব বাস্তবিক কি প্রকাণ্ড কাণ্ড। আপাতত ভাসা ভাসা আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি আমাদিগের এই ক্ষীণ চেষ্টায়, এই উৎসবের প্রকৃত গৌরব বাঙ্গালি হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত হয়, তাহা হইলেই আমাদের যত্ন সফল হইবে।

---

* তানসেনের গান;—

প্রভাকর ভাস্কর, দিনকর দিবাকর, ভানু প্রঘট বিহান।
তেরি উদয়িতে, পাপতাপ ছুটে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নি(য়)ম হোয়, গুরুজ্ঞান ধ্যান॥
ঝকমকায়ত জগতপর, জগচক্ষু জ্যোতিরূপ,
কশ্যপসুত, জগতেকি প্রাণ।
কহে তানসেন, প্রভু, জগত-কবাট খুলত,
দিবে বিদ্যা দান॥

মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্যপূজা দুই প্রকারের। অবতারে মনুষ্য পূজা; কুমারীতে নারী পূজা। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাই নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ চরিত্রে ভারতভূমি উজ্জ্বলীকৃত আছে। এই সকল অবতার মূর্ত্তি দুর্গোৎসবের চালচিত্রে চিত্রিত থাকে, এবং তাঁহাদের পূজা হয়।

আমাদের তন্ত্রে নারী পূজা। বিদেশের কোম্‌তে নারী পূজা। নারীই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিতে প্রকৃতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃত্তি-শক্তি। নারী জন্মদাত্রী, পালয়িত্রী, জগদ্ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী। নারী ভবসাগরের তরণী, জীবনের বন্ধনী। নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী ইহলোকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপা। নারীর মধ্যে কুমারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কুমারী শান্তির প্রতিমা, সরলতার ছবি, পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী। অনন্ত কোটি মানবের প্রসবিনী শক্তি কুমারীতে অন্তর্নিহিত; কুমারী জগদম্বা-শক্তি। কুমারী সরমের সরলতা, আদরের কোমলতা। কুমারী লজ্জাশক্তি, দয়া-শক্তি, শ্রদ্ধারূপা, ভক্তিরূপা। কুমারী পূজা, কুমারী ভোজন দুর্গোৎসবের অঙ্গ। সেইরূপ মাতৃকা পূজা দুর্গোৎসবের অঙ্গ। সকলরূপ পূজাই দুর্গোৎসবে আছে।

সকল দেবতার পূজাও দুর্গোৎসবে আছে। ঈশ্বরের সৃজন-পালন-সংহরণ মূর্ত্তিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এবং ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশক্তি, ইঁহাদের সকলেরই পৃথক চিত্র বা মূর্ত্তি আছে। পৃথক পূজা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি সকলেরই স্থান আছে, ধ্যান আছে, অর্চ্চনা আছে, আরাধনা আছে। আর সকল শক্তির সমষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তির মহাপূজা আছে।

মহাশক্তি অনন্ত মূর্ত্তিতে অনন্ত সংসারে বিরাজিতা; গ্রন্থকারেরা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন—

"সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্য প্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্য শক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহীণাং গৃহদেবতা॥

মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানাং মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তি-শক্তি ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা॥
নৃপানাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসার সিন্ধূনাং ত্রয়ী দুস্তারতারিণী॥
সৎসু সুবুদ্ধিরূপাচ মেধাশক্তি স্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তি শ্রুতৌশাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্রাদিনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তি সতীষু চ।
এবং রূপাচ যা শক্তি ময়া দত্তা শিবায় সা॥"

এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সমষ্টির সহিত সমগ্র জড়শক্তি এবং দৈবশক্তি মিলিত হইলে, তবে দুর্গা প্রতিমা হয়। জড় জগতের দৈত্য দানব,—ভূত প্রেত,—সিংহ শার্দ্দূল,—শস্ত্র সর্প,—ময়ূর মূষিক,—বৃক্ষ গুল্ম,—নদ নদী,—শিলা-মৃত্তি,—গ্রহ নক্ষত্র,—চন্দ্র তারকা প্রভৃতি—আর আধ্যাত্মিক জগতের প্রভা, শোভা,—ধন, পণ,—জ্ঞান, মান,—বিদ্যা, বুদ্ধি,—ধৃতি, ক্ষমা,—দয়া, লজ্জা,—শৌর্য্য বীর্য্য,— ঐশ্বর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি। আর দেবজগতের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। দুর্গোৎসবের প্রতিমায় এই ত্রিজগতের জাজ্জ্বল্য মতী মহামূর্ত্তি। দুর্গোৎসব বিশ্বপূজা।

এখন আবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি তাহার অনুমাণ হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণা করিয়াছে! অন্য কোন দেশের কোন কবি, কোন দার্শনিক, কোন শাস্ত্রকার এরূপ ত্রিজগতের সমষ্টিতে জগজ্জীবনের পূজা কখন কল্পনাতেও আনিয়াছেন কি? সকল দেশেইত ধর্ম্মোপাসনায় যুগের পর যুগান্তর হইয়াছে। স্তবের পর স্তব উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। পশুপূজা, বৃক্ষপূজা, নরপূজা, দেবপূজা সকল দেশেই ত হইয়াছে,—কিন্তু দুর্গোৎসবের মত এমন অতুল্য Museum এবং অমূল্য Laboratory আর কোথাও আছে কি? বঙ্গবাসী মহাকালের সাহায্য লইয়া ঐ অপূর্ব্ব যাদুঘরে জগতের ধর্ম্মোপাসনার সকল স্তরগুলি একত্র করিয়াছে; আপনার প্রতিভাময়ী কল্পনার রাসায়নিক দাহনে তাহার অনেকগুলি গলাইয়াছে; গলাইয়া, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়াছে, যেগুলি গলে নাই, সেগুলিকে সেই মূর্ত্তির অলঙ্কাররূপে বড়ই মুন্সিয়ানায় সাজাইয়াছে। ধন্য বলি, এই বিশ্বময়ী ধারণা; আর ধন্য বলি, এই বিশ্বময়ী কল্পনা।

যেমন বিশ্বময়ী কল্পনাপ্রসূতা ঐ বিশ্বময়ী মূর্ত্তি; পূজার প্রকরণ পদ্ধতিও

তত্বপযোগিনী। ঘট পট গঠনে মূর্ত্তির কল্পনা; জ্ঞানে, ধ্যানে, মননে ধারণা। মহাপূজা 'চতুষ্কর্ম্মময়ী' এবং ত্রিবিধা। সাত্বিকী, রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ। সকল ভাবেই দেবীর পূজা হইতে পারে;—

লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবী মণ্ডলস্থাং তথৈবচ।
পুস্তকস্থাং মহাদেবীং পাবকে প্রতিমাসুচ।
চিত্রে চ বিশিখে খড়্গে জলস্থাঞ্চাপি পূজয়েৎ॥

সর্ব্বকালেই দেবীর পূজা হইবে।

যাবদ্ভূর্বায়ুরাকাশং জলং বহ্নি শশিগ্রহাঃ।
তাবচ্চ চণ্ডিকাপূজা ভবিষ্যতি সদা ভুবি॥'

পূজায় সকল প্রকরণই আছে;—শুদ্ধি, সিদ্ধি,—আচমন, প্রাণায়াম,—মুদ্রা, মন্ত্র,—বলি, হোম সকলই আবশ্যক। অধিবাস, অধিষ্ঠান,—আরাত্রিক, আরাধনা, সকলই করিতে হয়। ধূপ জ্বাল, দীপমাল সকলই অনুসঙ্গ। বিশ্বপূজার উপকরণ বিশ্ব সংগ্রহ,—ফলজল,—পত্রপুষ্প,—স্বস্তিক সিন্দুর,—গন্ধ চন্দন,—কষায় ওষধি,—শস্য গব্য,—মণি রত্ন,—ভোজ্য ভোগ,—নৈবেদ্য শীতল,—সকল পূজার সকল উপকরণ আহরণ করিতে হয়; মালির মালঞ্চ, বণিকের বিপণী, মণিহারীর মণিহার, গোলদারের গোলা, আহরণ করিলে তবে দুর্গোৎসব হয়। বিশ্বভাণ্ডারের নমুনা লইয়া বিশ্ব প্রচলিত পদ্ধতিমত বিশ্বশক্তিরপূজা।—

হা ভগবান আমার দরিদ্রের অদৃষ্টে তবে কি তোমার বিশ্বশক্তি মূর্ত্তির পূজা হইবে না? না, এমন কথন হইতে পারে না, আমাদের শাস্ত্র ত পক্ষপাতের শাস্ত্র নহে। শাস্ত্রের বিধান বড়ই উদার;—

সম্যক্ কল্পোদিতাং পূজাং যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে,
উপচারাং তদা দাতুং পঞ্চৈতান্ বিতরেত্তদা।

কি কি?— গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেবচ।

তাও যদি না জুটে। অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং

তাও যদি আহরণ করিতে না পারি,—তদভাবে ভক্তিতঃ।

এমন কল্পনাও কথন হবে না; এমন উদার শাস্ত্রও আর কোথাও পাব না।—কিছু না পারি আজি শুভদিনে—আইস ভাই, একবার ভক্তিভরে বিশ্বশক্তি ব্রহ্মময়ীর ধ্যান করি।

হুতোম প্যাঁচার গান।

সহর বন্দনা।

কলির্ সহর কল্‌কাতাটীর পায়ে নমস্কার!

যার ঝাঁক্‌জমকে ভাগীরথীর ছু-ধার গুল্‌জার,
যার কোলের কাছে ঘাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান,
যার মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখ্‌লে জুড়োয় প্রাণ,
যার পাথর-ইঁটে পথ বাঁধানো "ফুট্‌পাথ" দোধারি,
যার পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি,
যার তিনদিকে জল সহর ঘেরা— উত্তরে বাহালি
আহা বাগবাজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী,
আর অজ্‌দখীণে আদিগঙ্গা টালির নালা হালি!
যার মাথার দিকে পাইকপাড়া খুরে খিদিরপুর,
যার পূব্ব্ ঘেঁসে শুঁড়ো টালি ঘোঁজে আলিপুর,
যার ইটদালানে খোলার চালে ঠেকাঠেকি গায়,
যার গির্জ্জে মসীদ ঠাকুর বাড়ীর চুড়োয় আকাশ ছায়,
যার বাজার গঞ্জ বিষ্ঠেনলি বাইরে জলে ঝাড়,
যার বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া, মেথর হাঁকায় ষাঁড়!
যার টাউন্ যোড়া পল্লী ছুটী সাহেব নেটিব পাড়া,
যার চৌরঙ্গী সোণার থালা সহর ধূলোর হাঁড়া!
যার গ্যাসের আলো রাত্রিকালে চক্ষে লাগায় ধাঁধা,
যার কোলে দোলে লোহার সাঁকো এদিক ওদিক বাঁধা!
যার রাস্তা ঘরে সহরফুঁড়ে কলের পানি ছোটে,
যার ছুধের কেঁড়েয় খাঁটি পানি তিন্‌পো ছেড়ে ওঠে!
যার দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাজাই সাঁচা,
যার লম্বাটে গোচ চেহারাটা ফজ্‌লি আমের টাঁচা;
আহা ভাগীরথীর ছুকূলযোড়া রূপের ছটা যার,
কলির সহর কল্‌কাত্তা তোর পায়ে নমস্কার!

তোর পায়ে নমস্কার!
তুই—রাজার নগর আজব সহর
ভারত-ভূমির হার!
তোতে—মুক্তপলা কতই আছে
শালুক্ শোলা আর!
আজ্ তুলে তুলে দেখবো খুলে
চিকণ্‌তা কি কার!

দেখবো রে তোর ভোজের বাজী,
দেখবো রে তোর ফুলের সাজী,
দেখবো রে তোর রাংতা-মারা চাল্‌খানির বাহার!
কলির সহর কল্‌কাতা তোর পায়ে নমস্কার!!

তোর গুণে নমস্কার—ও তোর গুণে নমস্কার!

কলির সহর কল্‌কাতা তোর গুণে নমস্কার!!
তোর সভ্যগায়ের বাতাসে হয় দ্বিপদ অবতার;
তোর কোলে পীঠে সাদা কালো মহাবীরের মেলা,
যেন কলির মাঝে আবার ফিরে ত্রেতাযুগের খেলা!
তোর কড়ির গুণে শৃগাল সাজে সিংহ বাঘের ছালে;
তোর ভক্তি গুণে ভাগীরথী "পেশাব"-নলে চলে!
তোর বাজার হাটে শোভা করে সকল ফুলের সাজি;
তোর রাজপসারে সমাজমাঝে সদাই দড়াবাজি!
তোর এলেমগোলা ইংরিজিতে ঘোচে গায়ের মলা;
তোর হালের রীতি গরু খাওয়া বাবার ভাষা বলা!
তোর জলের গুণে জাত পিরিলি ধুয়ে মুছে খারা;
তোর মাটীর গুণে দাস্‌ কৈবৎ বেণে সমাজ সেরা;
তোর ভজন্‌-গুণে ভোজন-কালে সব হাঁড়ী সমান—
ও তোর খেষ্ট-ভজা বেহ্মাচাচা হিঁদু মুসলমান!
তোর নব্য কেতা দাড়ি-রাখা সভ্য প্রথা জারি;
তোর ফুল বাবুদের ঘাড়ে ছাঁটা সদরে কেয়ারি!
তোর তুড়ীর জোরে রায়বাহাদুর—কুস্তিগিরি ভাঁজা;
তোর নেকনজরে আঁস্তেকুড়ে আস্কেগোণা রাজা!
তোর সভ্যমুখে বাংলা বুলি ঠন্‌ঠনে পয়জার!
ওরে কলির সহর কল্‌কাতা তোর গুণে নমস্কার!
তুই রাজার নগর আজব সহর

ভারত ভূমির হার!

তোতে মুক্ত-পলা কতই আছে
শালুক শোলা আর!
আজ তুলে তুলে দেখবো খুলে
চিকণতা কি কার!
দেখবো রে তোর রাংতা হালি,
দেখবো রে তোর কল্কা চালি,

দেখবো রে তোর চিত্রিকরা পুতুলগুলি আর ;
একবার—একে একে এগিয়ে এসো আসরে যে যার ॥

আসর বর্ণন।

এসো এসো সবার আগে ঠাকুর বাড়ীর চাঁই,
বুল্‌বুলি পাগ্‌ শিরে বাঁধা তালপাতা-সেপাই।
পাথর ঘাটায় রাজগী জারি "সার" মহারাজ নাম,
মুন্সী-আনায় জেঁকে গেছে ছ্যাতলা ধরা থাম।
সিঁতির মাঠে কুঞ্জবিহার দীপ্ত মরকত,
কুঞ্জমাঝে "গ্রটো" গহ্বর মাটীতে পর্ব্বত !
বংশ যশে "লেজিস লেটিভ" রংমহলে চড়ে
রাজ-মহারাজ নাগরা পিটে মাথার পগ্‌গ নেড়ে !
মিষ্টিবোলে মিছরি ঘোঁটা সরটুকু সে ছাঁকা ;
যার অভ্যুদয়ের ছায়া লেগে সহর খানা ঢাকা !
এসো এসো ভারত-মাজী কসে ধরে হাল,
বিলিতি বাতাসে ভ্যালা উড়ায়েছ পাল !!

এসো এসো দাদার পরে গলায় পরে হার,
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে "মিউজিক্‌-ডাক্তার" !
"অর্ডার অফ্‌ সি আই ই অ্যাণ্ড রাজা-কম্‌ ;"
"অর্ডার অফ্‌ লিওপোল্ড কিংডম্‌ বেলজিয়ম্‌,"
"অর্ডার অফ ফ্রাঁসে জোসেফ এম্পাইয়ার অষ্ট্রিয়া,"
"অর্ডার অফ ডনার ব্রোগ" ডেন্‌মার্ক নিয়া,
"অর্ডার অফ অ্যালবার্ট অ্যাণ্ড স্যাক্‌সনী ;
"অর্ডার অফ মেলুসাইন্‌ মেরি লুসিগনানী ,"
"অর্ডার অফ মলটা-রোড্‌স ফ্রাঙ্ক সিভেলার,"
"অর্ডার ডিউ টেম্পেল ডিউ সেণ্ট সেপলকার,"
"ইম্পিরিয়েল অর্ডার অফ পাউ সিং" চাইনার,"
"সেকেন্‌ কেলাস ইম্পিরিয়েল লাইয়ন অ্যাণ্ড সন্‌,"
"সেকেন কেলাস্‌ ইম্পিরিয়েল মেহেদিজ্জি সুলতান,"
"অর্ডার অফ রয়েল ক্রাইষ্ট" রাজ্য পর্তুগাল,
"অর্ডার অফ" গুর্খা-তারা দিয়েছে নেপাল,

শ্যামদেশের	বসবামালা	পারস্য সা-জাদা ;
এর ওপরে	আরো কত	এট্‌সেটেরা গাদা ! ! !
সত্যই এ	সকল গুলি	রাজশ্রীর হার ;
সাক্ষী দেখো	সব কেতাবের	মলাটে বিস্তার ॥
এখন সরো সরো	ছোটো বড়	রাজা মহাশয়,
আসর নিতে	"আউআর কজিন"	হচ্চেন উদয় !

এসো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে,
তুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে ?
স্বয়ংসিদ্ধ মহারাজা—সহর শোভন ;
যথা গিরি গোবর্দ্ধন গোকুলের ধন !
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি ;
গঙ্গার উপমা আহা গঙ্গাই যেমনি !
সভাস্থলে টাউন্‌হলে বক্তৃতার চোটে,
ভাদ্রে নদীর জলে ফেণা যেন ফোটে !
সেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পরা ঠিক,
খালি সে চুড়োটী নাই—তিলক কৌলিক !
মাথার চুলের ভাঁজে খেলে জোয়াব ভাঁটা,
সমুখে বাগানো তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাঁটা !
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই,
কাশী মক্কা পাশাপাশি—কোন্ দিকে তাকাই !
এসো এসো মহারাজ—আরো ঘেঁসে যাও ;
আতর-গোলাপ-পাস্—লে-আও লে-আও !

এসোতো বণিকপতি এসোতো এবার,
করতো জাঁকায়ে বসে আসর গুল্‌জার !
নেটিবের সদাগর, বেণেদের নাক্,
কমলার কল্‌কাটী, সোণার মৌচাক !
দেশ-কুল-মুখোজ্জ্বল ব্যাপারে হুনুরি,
বাজারে যাহার হালে বড়ই জাহিরি !
বড় "লকী" জাদুগীর্ দাঁত বাঁধা "চ্যাপ",
হানা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সোণাচাপ !
এর কাছে আর যত ঝুটো পোখ্‌রাজ,
গিল্টি-সোণা দাগী-চুনি ঝকে মারে লাজ্ !
সহরে সবার কাছে শুনি এঁর নাম,
আক্‌বরী আস্‌রফী যেন দরে দুনো দাম !

অম্লভাষী "নোভো হোমো" কাঁচামিঠে ঝাঁঝ,
গরমে পচেনি আজো টাট্‌কা আছে মাজ॥
তারি মত ছোট ভাই গায়ে নাহি তাং;
সাবাস ত্রিমূর্ত্তি লাহা—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!

তার পর গুড়ি গুড়ি এসো বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ী—অদ্ভুত "নসীব"!
জমিদারি মিণ্টে ঢালা আদোৎ "মডেল,"
বাঙ্গালার কাদাহোড়ে পাথুরে পাট্‌কেল!
বয়েসে অনাদি লিঙ্গ "জরাসিন্ধ" বলে;
দাপোটে এখনো যার হুগলি জেলা টলে॥
মাল্‌-আইনে তোদর-মল, রোখে হাইদর-আলী,
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি!
গুষ্টী বহু, বাস্তুভূমি যেন লঙ্কাপুরী,
ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সলে মুহুরি!
দিগ্বিজয়ী দণ্ডধর রাষ্ট্র যুড়ে নাম,
ইহাগচ্ছ—ইহাগচ্ছ, চরণে প্রণাম!

এই ত গেলো কল্‌কাতা তোর কল্কা পরার দল,
দেখবো এবার গোটা কত দিক্‌পাল আসল!
দেখবো এবার আসর মাঝে মনের রাজা যারা,
সব আসরে যাদের শিরে জ্বলে সোণার তারা!
তফাৎ সরো তফাৎ সরো ফড়িং ফিঙ্গের পাল,
আসর নিতে আসছে এবে বাজ-পাখী "রয়াল"।

আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির!
বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞান ব্যাপী!
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দ্রাঢ্যে শালকড়ি,
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি!
প্রতিজ্ঞায় পরুশরাম, দাতা কর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্রে শেঁকুল-কাটা—পারিজাত ঘ্রাণে!
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত "ডিস্",
টোল-স্কুলী-অধ্যাপক দুয়েরই "ফিনিস"।

এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ অলঙ্কার,
"দিক্‌পাল" তোমার মত দেশে নাই আর!
দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সহুরে রাস্তায়,
কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়।

কার শোভাতে জলুস বেশী আসর যুড়ে যায়?
পাঁও লাগে বাচস্পতি এসোতো সভায়!
জীবন্ত ভাষার কোষ, পাণিনির মই,
শাস্ত্রেতে সুপক্ব-রুই—নহে টুলো কই!
স্মৃতি-দরশনে-দৃষ্টি তর্কের মাজ্জার,
"মোক্ষমূলর্" "ল্যাসেনের" মুণ্ডের টোপর!
ব্যাকরণে বোপদেব-ভ্রাতর-মামাতো,
সংস্কৃত বিদ্যা দাঁড়ে হর্‌বোলা কাকাতো;
শিক্কাধারী খর্ব্বদেহ দর্শনে দুর্ব্বাসা,
আলাপে তালের সাঁস কিম্বা ক্ষীরে সঁসা!
পাতা পেতে ছানা ক্ষীর দিতে সাধ যায়;
এসো এসো বাচস্পতি—পাঁও লাগে পায়!
অনেকে তো নৈবিদ্যির ভাগ সরাতে জড়,
বলোতো জলুস কার সভার মাঝে বড়?

বলো গো সভার শোভা এবার কেমন,
নমস্কার - নমস্কার ন্যায়ের রতন!
ফুটেছ ব্রাহ্মণকুলে আপনার বাসে,
বুকেতে বেঁধেছো "চাপ" প্রকৃতির "পাসে"!"
থানের-চাদর-পরা থান-ধুতি মোটা,
কালোমুখে জ্বলে আলো—প্রতিভার ছটা!
নিজ গুণে নিজ পণে রাঢ়ে বঙ্গে মান,
পৈতৃক মকরধ্বজে নহ অনুপান!
সাহেব করেছো বশ বিদ্যারসে তাজা,
বাসে তব ভাসে কত "ফেদার"-ধারী রাজা!
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন,
গুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জ্জন!
মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দাভাষী,
উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী॥
মজলিসেতে বাবুর পোষাক্—ঐটি কেলেঙ্কার,
তবু হ্যাদে খাঁটি বাসে তুল্য কে তোমার?

এসো এসো তাহার পরে রেভারেণ্ড সাজ,
বন্দ্যকুল-চূড়ামণি "মানোআরী" জাহাজ!
শুভ্র ভুরু, শুভ্র কেশ, শুভ্র দাড়ি চেরা,
গিরীক্‌-ল্যাটিন-হিব্রু-ইংরিজি-ফোয়ারা!
মাকাল-বনের মাঝে পাকা আম্র ফল,
স্বধর্ম্ম তেয়াগী তবু স্বজাতীর দল!
মিষ্টভাষী বঙ্গষষ্ঠি হৃদে মাখা চিনি,
বয়েস খুঁজিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি!
দ্বাপুরে ভূষুণ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ;
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্ব্বত!
রাংতা-জরি-চাক্‌তি-পরা নকিব ফুকার
বলোতো এমন আলো তোমাদের কার?

পথ ছাড়ো—পথ ছাড়ো—আসিছে এবার,
গদাধর-পাদপদ্মে মতি গতি যার!
তাল-পত্র, তাম্রপত্র, পুঁথিপত্র থোকা,
বগলে পুঁটলি বাঁধা কেতাবের পোকা।
এসো মিত্র লালেলাল মজলিস জাঁকাও,
কেদারা ঠেসান দিয়ে মোড়াসা হেলাও।
প্রত্নতত্ত্ব তল্লাসিতে দীগ্‌গজ মসনদ,
খড়ি মাড় নাই খাপে—আধোয়া গরদ।
আচার, আমের সত্ব, কুলকুটো ভাঁজ,
যখন যে দিকে হাত তাতে ধড়িবাজ।
বাক্‌যুদ্ধে, বাগ্মীতায়, লেখার লড়ায়ে,
রাজনীতি, রচনায়, সুর বাজখেঁয়ে!
ইংরিজি-বিদ্যা-বাগানে "ফাষ্টরেট" মালী,
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি।
সকল বিদ্যার খই—বুদ্ধি ভাজাখোলা,
বিধি বিড়ম্বনে আজ কাণে গোঁজা শোলা!
অহংত্ব বড় বেশী নহিলে হাজার
রাজার মাথার চূড়ো—তুল্য কে উহার?

আসর জাঁকায়ে বসো তুমি অতঃপর,
গাল্‌জোড়া ফাঁসা গোঁপ—বুড়ো প্যাগম্বর!
চুঁচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান,
হৃদয় ক্ষীরের খনি—আকারে পাঠান্‌!

হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা-জ্ঞান-গুড়ে,
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে!
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে!
তর্কেতে তক্ষক যেন, মেজে তেজপাতা,
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা!
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে,
দেশের দোছোট বটো—মোদ্দা কথা গড়ে।
ধনে মানে কুলে যশ পদে পাকা-তাল
সেকেলের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল!
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ,
দেখো হে পুতুলরাজা—বাঙালীর বাঘ!

———

তুমিও আসরে এসে বসো একবার,
কলিতে কাঁসারী কুলে প্রভা জ্বলে যার!
কণ্ঠে তুলসীর মালা দীনহীন বেশ,
কাঁধেতে চাদর ফেলা—পোষাকের শেষ!
সহরের দীনদুঃখী দরিদ্র অনাথ
আনন্দে দু'হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ;
চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশে—
শিশুব চক্ষর ধারা মুছে চীর-বাসে।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার
বসিতে এদের পাশে "ছাড়্" বিধাতার;
কি হবে কোমব পেটী, কে চায় চাপ্‌রাস্!
অনাথ-তারক নামে পেয়েছো যে "পাস্",
তরে যাবে তারি গুণে সকল দুয়ার!—
আসর বর্ণনা আজ "ষ্টপ" আমার॥
বড বড় বুড়ো বুড়ো চুনে নিমু কটা,
ফিরে আবার আসর নেবো মাথায় বেধে ফ্যাটা॥
গাইব তখন আবার শুনো শুনটী যেমন যার;
আল্লা গৌর বলো এখন বেলা দুপুর পার!
শ্রীপাঠ কলকাতা তত্ত্বে অধ্যায় প্রথম,
হুতোম্ প্যাঁচার গান নরম গরম!!

নবজীবন।

১ম ভাগ। } কার্ত্তিক ১২৯১। { ৪র্থ সংখ্যা।

ব্রততত্ত্ব।

২। সুখ।

ব্রততত্ত্বের প্রথম বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমাজের মূলীভূত নিয়ম, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়, আর এই প্রতিজ্ঞাটির অব্যবহিত ফল এই যে, জীবন পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে। কিন্তু শেষোক্ত নিয়মটি মনে করিলেই এত অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় যে কেহই উহাকে প্রশস্ত নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। বস্তুত নিয়মটি কোন কারণ বশত ব্যক্তিগত চৈতন্যের নিতান্ত বিরোধী। সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, ব্যক্তিগণের নিকট উহা গ্রাহ্য হইবার উপায় কি? সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্তগত হন; এই বিষয় সকলেরই প্রত্যক্ষ মনে হয় অথচ কথাটি ভ্রম বটে। সূর্য্য চলেন না; পৃথিবী ঘুরেন। ব্যক্তিগণের এই ভ্রমটি অপনয়ন করিবার জন্য নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। তাহাতেও সূর্য্যের গতিবিষয়ক জনসাধারণের এই কুসংস্কারটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। ইহার তুলনায় আমি যে নিয়মের কথা বলিয়াছি তদ্বিষয়ক ভ্রম দূরীকরণ করা নিতান্ত কঠিন গণ্য হইবে। জীবন পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে এই নিয়মটি সমাজতত্ত্ব হইতে উদ্ধারিত বটে কিন্তু সমাজতত্ত্ব এখনও জ্যোতিষতত্ত্বের ন্যায় বিশ্বাসভাজন হয় নাই। বিশেষত সমাজতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উহা নানা বিজ্ঞান-

শাস্ত্রের সহিত একত্রে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। জ্যোতিষতত্ত্ব অতি কঠিন হইলেও সমাজতত্ত্বের ন্যায় জটিল নহে। আমি এই নিমিত্ত অনেক বাহুল্য উক্তি করিয়াছি বটে তথাচ প্রস্তাবিত নিয়মটি বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। কিন্তু বাস্তবিক ঐ নিয়মের সত্বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের সহিত নিতান্ত অনুরূপ বটে। এবং তাহাতে পাঠকের সম্যক বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। সূর্য্যের গতিবিষয়ক কুসংস্কার দূরীকরণের নিমিত্ত কেবল পৃথিবীর দৈনিক গতির কথা শুনিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহার বিষয় হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ সমাজতত্ত্ব অনুযায়ী পরার্থপরতা বিষয়ক নিয়ম জানিলেই হইবে না; তাহা এমন করিয়া বুঝা আবশ্যক যে ব্যক্তিগণের মতি ও তদনুরূপ হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্য পাঠকের নিজের চেষ্টা ব্যতীত তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

অনন্তর বিবেচনা করা যাউক যে কি জন্য নিয়মটি এত উৎকট বলিয়া মনে হয়। ইহার এক কারণ এই যে, লোকে সহসা বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না; আমাদিগের স্ব স্ব মনের গতি অনুসারে ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়মাত্রেরই নানাবিধ বিভিন্ন চৈতন্য জন্মিতে পারে। আমি যে নিয়মটির কথা বলিয়াছি তাহা যদি প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াগত হইত কিম্বা প্রকৃষ্টরূপে ঐ ক্রিয়া সংসৃষ্ট হইত, তাহা হইলে সকলেই অনায়াসে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কিন্তু যেখানে প্রথমত নানা বস্তুগত ব্যাপার বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত করিতে হয়, যেখানে চিত্তবৃত্তি সঞ্চালনের তাদৃশ স্থল নাই সেখানে ঐ সকল বিভিন্ন ব্যাপারের শৃঙ্খলাবিশিষ্ট সংস্কার উদ্দীপন করণার্থে বিশেষ যত্ন অথবা ব্যাপক কাল আবশ্যক হয়, তাহা ব্যতীত ব্যাপার গুলির সম্বন্ধে যথাযোগ্য বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হয় না! এতদ্ভিন্ন প্রস্তাবিত ব্যাঘাতের আর একটি কারণ আছে। ব্যক্তিগত চরিত্রে এরূপ একটী নিয়ম আছে যে তাহা প্রাগুক্তসমাজ উদ্ধারিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে এবং কোন বিশিষ্ট কারণ বশত সেই ব্যক্তিগত নিয়ম আবার অপেক্ষাকৃত বলবৎ চৈতন্য-প্রদায়কও হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ নিয়মটি মনুষ্যের সুখসম্বন্ধীয়, এবং তাহা ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তিমূলক বলিয়া অনায়াসে উপলব্ধ হয়; এমন কি, ব্যক্তিবর্গ আপনাপন মনের অপরিজ্ঞাত রূপে ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এক্ষণ সেই সুখোৎপত্তি সম্বন্ধীয় নিয়মটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। স্থূল কথা এই যে, সমাজতত্ত্ব হইতে উদ্ধারিত কর্ত্তব্য বিধানটি মনুষ্যের সুখপ্রা

মনে হয় না। কিন্তু কিসে কর্ত্তব্যবিধান ও সুখসাধনবিধানের সমবায়ী ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইতে পারে তাহাই আমাদিগের অনুসন্ধানের স্থল। এতদর্থে আমরা এখন সুখ বিধানের লক্ষণ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সুখ ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে কিন্তু উহা আবার জীবধর্ম্মেরও নিতান্ত অনুবর্ত্তী। যদি জীবধর্ম্মানুযায়ী সুখের নিয়মাদি জীবতত্ত্ব হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে স্থিরীকৃত হইত তাহা হইলে আমাদিগের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইতে পারিত। কিন্তু জীবধর্ম্মানুযায়ী সুখবিষয়ক নিয়মের কথা দূরে থাকুক, আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থামতে ঐ সুখের সহিত ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুখের বিভেদ আছে বলিয়া সহজে বোধগম্য হয় না।

ক্ষুধাজনিত যন্ত্রণা এবং উহার পরিতোষজনিত সুখ জীবধর্ম্মাক্রান্ত। ব্রত পূর্ব্বক উপবাস করিলে যে সুখ লাভ হয় তাহা ব্যক্তিগত। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির যন্ত্রণা মোচন জনিত সুখ সমাজ সঙ্গত এবং ব্যক্তিগত। আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত একত্রে আহার করিলে যে সুখ হয়,তাহাও বোধ হয় ঐরূপ দ্বিবিধশ্রেণিভুক্ত। কিন্তু আমরা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বহু আয়াস দ্বারা কোন দশ গ্রাম বা পল্লিস্থিত শত্রুমিত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষ্কণ্টকে ভোজন করাইয়া যে সুখলাভ করিয়া থাকি, তাহা সমাজব্যাপী নিয়ম বিশেষের ফল। ইহাতে ব্যক্তিগত সুখ নাই বলিলেও হয়। যে কএকটি উদাহরণ দেওয়া গেল ভরসা করি, তাহাতে নানাবিধ সুখের বিভেদ কতদূর স্পষ্টাকারে ব্যক্ত হইবে, কিন্তু অনেক স্থলে সুখবিশেষ নিতান্ত জটিলভাবে একাধিক শ্রেণিভুক্ত হইয়া থাকে,এবং তাদৃশ স্থল সুখ বিধানের ঋজুজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন ব্যাপার। অতএব পাঠক মনে রাখিবেন যে,আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখের আলোচনা করিতেছি না, যাহা কেবল ব্যক্তিগত বিধানের অনুবর্ত্তী তাহারই আলোচনা করিতেছি।

ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, চিত্তবৃত্তির চালনা ও অবরোধের ফল। কিন্তু চিত্তবৃত্তি গুলি নির্ব্বাচন করা কঠিন কার্য্য। যদি কখন Phrenology ফ্রেনলজি শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বোধ করি, নরমস্তিষ্কের লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়া এই বিষয়ের সহজ উপায় আশ্রয় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থাতে বুদ্ধিবৃত্তির ও চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা উপলব্ধ করাও দুষ্কর; নরমস্তিষ্কের অঙ্গভেদ এবং চিত্তবৃত্তি সমূহের ভেদাভেদের কথা আর কি বলিব। অতএব চিত্তবৃত্তির বিভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা বস্তুগত

ব্যাপারের পরিবর্ত্তে প্রজ্ঞাগত ব্যাপার সংক্রান্ত বিচার প্রণালি অবলম্বন করিতেছি। প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে, ব্যক্তিগণ সকলেই স্বকীয় বুদ্ধিমতে অহং-পর দুটি বিষয়ের ভেদ সততই করিয়া থাকে। আর কোন কোন চিত্ত-বৃত্তি সঞ্চালিত হইলে অহং পদার্থ সুখী হয়। এ কথার প্রমাণ বস্তুগত ব্যাপারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে কিন্তু আমরা প্রজ্ঞাগত প্রণালি মতে ইহার পক্ষে এই মাত্র বলিব যে সকলেই আপন মনে বুঝিতে পারেন এই স্থলে অহং পদার্থ সুখী হইল এবং এই সুখের হেতু, অমুক চিত্তবৃত্তির চালনা। সকলেই যে এরূপ স্থলে চিত্তবৃত্তিটির লক্ষণ বিষয়ে একবাক্য হইবেন, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু কোন একটি চিত্তবৃত্তি সঞ্চালিত হইল এবং তাহা হইতে অহং পদার্থ সুখী হইল, এই দুটি বিকাশ সময়ে সময়ে সকলেরই প্রজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। অতএব এই শ্রেণীস্থ চিত্তবৃত্তি ও সুখগুলিকে স্বার্থপর বলিয়া আখ্যা-য়িত করা যাউক। অহং পদার্থের সহিত "পর" পদবাচ্য মনুষ্য বা জীব শ্রেণীর ভেদ সম্যক্ পরিমাণে অনাবৃত। অতএব এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে মনুষ্যের পরার্থপর চিত্তবৃত্তি আছে কি না অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরচিত্তে এমন কোন বৃত্তি আছে কিনা যে তাহা সঞ্চালন স্থলে প্রধান কল্পে পরের সুখ কামনা হয় এবং সেই কামনা পরিতোষ হেতু গৌণ কল্পে স্বকীয় সুখোৎ-পত্তি হয়। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে মনুষ্যের দয়াবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ বটে। এইরূপে চিত্তবৃত্তি মধ্যে স্বার্থপর পরার্থপর নামক দুটি শ্রেণী সহজেই স্থিরীকৃত হইতেছে।

সমাজতত্ত্ব অনুসারে যে কর্ত্তব্য বিধান উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহা প্রতি-পালন দ্বারা ব্যক্তিগণের পরার্থপর চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্তু স্বার্থ-পর চিত্তবৃত্তিগুলি প্রাগুক্ত বিধানের নিতান্ত বিরোধী। অতএব কর্ত্তব্য বিধান ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিয়োজিত করণ পক্ষে এই এক মহাসঙ্কট স্থল উপস্থিত হইতেছে। সমাজতত্ত্ব মতে পরার্থপর কার্য্যগুলি নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যক্তিগত নিয়ম মতে তাহা সকল সময়ে সুখপ্রদ হয় না। সমাজগত সুখ এবং ব্যক্তিগত সুখ মধ্যে স্বাভাবিক ঐক্য নাই। এই সঙ্কট আবার আর একটি কারণে বিলক্ষণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া আছে। স্বার্থপর চিত্তবৃত্তিগুলি স্বভাবত পরার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল। এবং এই প্রবলতা এত গাঢ় যে, ব্যক্তিগত পরার্থপরতা যতই পরিবর্দ্ধিত হউক কিছুতেই ঐ শ্রেণিস্থ স্বার্থপরতাকে পরা-জয় করিতে পারে না। তৃতীয়ত ঐ স্বার্থপরতার আধিক্যই আবার জীবধর্ম

রক্ষার উপযোগী। সুতরাং আমরা সর্ব্ব প্রকারেই স্বার্থপরতা পাশে অতি দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইয়া আছি। সূর্য্যের গতি বিষয়ক কুসংস্কার দূরীকরণের তুলনাতে সমাজ উদ্ধারিত কর্ত্তব্য বিধানটি হৃদয়ঙ্গম করা কত দুঃসাধ্য তাহা এখন অনুভূত হইতে পারিবে।

পাঠক যদি এ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে অনুধাবন করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কি বিষম সঙ্কটের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু এই সঙ্কট অভিনব কিম্বা অজ্ঞাত নহে। ফলত জগতে পাপের ছড়াছড়ি যথেষ্টই রহিয়াছে; আর পুণ্যাত্মাগণের চেষ্টা এবং উৎকণ্ঠাও বিরল নহে। তথাচ পাপ পুণ্যের বৈষম্য চিরকালই আছে। সুতরাং সমাজতত্ত্ব ও ব্যক্তিতত্ত্ব হইতে যে পরস্পর বিরুদ্ধ নিয়ম প্রদর্শন করা গেল, তাহা এই চিরপ্রসিদ্ধ বৈষম্যের সাক্ষী মাত্র। বরং এই বৈষম্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করাই অসঙ্গত। যদি এইরূপ সঙ্কট না থাকিবে তবে পাপ পুণ্যের বিরোধ এত প্রগাঢ় কেন হইবে? জগতে পাপের আতিশয্য এবং পুণ্যের সঙ্কুচিত অবস্থা মনে করিলে উল্লিখিত বিরুদ্ধ নিয়মাদির সত্তা সম্যক্‌রূপেই সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং সমাজধর্ম্মানুযায়ী পরার্থপরতার বিধান ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুযায়ী সুখসাধন বিধান, এই বিধানদ্বয়ের বৈষম্য বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উভয়ের সমবায়ী ব্যবস্থা অন্বেষণ করিতে হইতেছে।

সুখ বিধান বিভাগের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে আর কতিপয় নিয়মের উল্লেখ করা আবশ্যক। এগুলি আপাতত উপরোক্ত কথার সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না কিন্তু পরে যে সকল কথা বলিতে হইবে তাহার জন্য অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত সুখ ত্রিবিধ। তাহার মধ্যে দ্বিবিধ সুখের উল্লেখ করা গিয়াছে; যথা স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা জনিত সুখ। তৃতীয় শ্রেণীস্থ সুখ, ক্রিয়াজনিত। অর্থাৎ বিবিধ চিত্তবৃত্তির পরিতোষ হেতু যে সুখোৎপত্তি হয় তাহা ব্যতীত আর এক প্রকার সুখ আছে। আমাদিগের চিত্ত বা বুদ্ধি সংক্রান্ত মনোবৃত্তির কথা বল, কিম্বা বহিরিন্দ্রিয়ের কথা বল, কেবল ইহাদিগের চালন হইতেই এক প্রকার সুখ হইয়া থাকে। যৌবন ও বাল্যাবস্থায় যে সকল সুখলাভ করিয়াছ তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে উৎসাহ পূর্ব্বক যে কোন বিষয়ে উদ্যম কর তাহাতেই সুখোৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সুখ কোন চিত্তবৃত্তি পরিতোষের ফল নহে। মৃগয়ার সুখ মৃগলাভ সুখের দ্বারা পরিমিত হয় না; উভয় এক শ্রেণীস্থ বলিয়াও গণ্য নহে। যে কোন উদ্যম

বল তাহা উত্থ হইলে যেরূপ দুঃখ হইয়া থাকে এবং তাঁহার অনুসরণ কালে যে সুখলাভ হয়, তাহার সহিত উদ্দিষ্ট বিষয়ের লাভালাভ জনিত সুখ দুঃখের তুলনা করাও কঠিন। বাস্তবিক সুখ যে এত দুর্লভ বস্তু তাহার প্রধান কারণ এই যে ইহা প্রধানত উদ্দেশ্যানুসরণেরই অঙ্গ, নিরুদ্যম হইয়া স্বকীয় মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে সুখের চৈতন্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে তদ্বিষয়ক স্মৃতিমাত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সুখের সত্ত্বা, সুখ অতীত হইলেই বুঝা যায় অস্তিত্ব কালে তদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভ করা অতীব দুষ্কর। এই কথার একটি পোষক প্রমাণ হিন্দু মাত্রেরই স্মরণ হইবে, কেননা শাস্ত্রমতে আত্যন্তিক সুখবোধ মোহস্বরূপ বলিয়া গণ্য। যে চেতনা যথাকালে লক্ষিত হয় না, যাহা কেবল স্মৃতি মধ্যে অবস্থান করে, তাহা স্বপ্নবৎ এবং মোহ-নিদ্রা জনিত ভিন্ন আর কি হইবে? বস্তুতঃ এই শাস্ত্রোক্ত কথার সূক্ষ্মতত্ত্ব কেবল উল্লিখিত ভেদজ্ঞান মূলক। চিত্তবৃত্তির পরিতোষ হইতে এক শ্রেণীর সুখ হয় আর সেই সুখ লাভের জন্য নানাবিধ কামনা মনে উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু যে কোন কামনা মনে স্থান পায় তাহার অনুসরণ দ্বারাই আর এক প্রকার সুখলাভ হইবে। এমন কি দুঃখ লাভের কামনা অভাবনীয় বিষয় নহে। সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রব্রতেই এই কামনা দৃষ্ট হয়। এবং এই সূত্রে দুঃখভোগও সুখপ্রদ হইয়া থাকে এইরূপ সুখ, যত্নদ্বারা লব্ধ দুঃখের সহিত অভিন্ন নহে। উহা দুঃখরূপ কামনা বিশেষ অনুসরণ করিবার ফলমাত্র।

আর একটি কথা এই যে জীবমাত্র সাধারণত এবং ব্যক্তিগণ বিশিষ্টরূপে অভ্যাসের বশবর্ত্তী। যেসকল মনোবৃত্তি সঞ্চালিত হয় তাহা অভ্যাস সংস্কারে সতেজ হইয়া থাকে এবং যাহা উপর্য্যুপরি অবরুদ্ধ হয় তাহা ঐ কারণে হীনতেজ হইয়া উঠে। অতএব অভ্যাস প্রক্রিয়া দ্বারা প্রথমত অনুসরণ মূলক সুখোদয় হইয়া থাকে, আর তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া, তত্তৎ বিষয়ক পরিতোষ জনিত সুখের তারতম্য হয়। এই নিয়মগুলি স্বতঃসিদ্ধ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যাপার হইতে উহা উদ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বসাধারণেরই অভিজ্ঞতা আছে। সকলেই স্ব স্ব অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করিলে এই সকল নিয়মের সত্ত্ব স্বীকার করিবেন, এবং স্বীকার করিলে উহা অবলম্বন করিতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

অতএব দেখা গেল যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সুখ-সাধন বিষয়ক বর্ত্তী

নিয়ম আছে। তাহার সহিত সমাজগত নিয়মানুযায়ি কর্ত্তব্য বিধান বিভিন্ন। এই বৈষম্য দূরীকরণ করা আবশ্যক। এতদর্থে আর কতিপয় নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমত ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা বিষয়ক ভেদজ্ঞান, দ্বিতীয়ত অভ্যাসের ফলাফল তৃতীয়ত এই সকল বিষয়ের কোন সমবায়ী নিয়ম। আর চতুর্থতঃ অনুসরণ সুখ বিষয়ক নিয়ম। আগামী বিভাগে উপরোক্ত তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বুঝিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্বন্ধে সমবায়ী নিয়ম করিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। তদ্ভিন্ন লোকালয়ের বিশৃঙ্খলা বিমোচন হইবে না।

অন্ধকার ক্রোড়ে।

গভীরেণান্ধকারেণ প্রচ্ছন্নে হৃদয়ে হি যৎ।
তমসি তমসি ত্যক্ত্বা বাচো ব্যাহরণৈ মুহুঃ।

এই অন্ধকারেই নির্গুণ ঈশ্বর। গুণাধার হইয়াও কেবল সত্তারূপে প্রকাশিত।

৺ কেশবচন্দ্র সেন।

কাল রজনি! মহা নিশি! ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল; অন্ধকারের উপর অন্ধকার আরও ঢাল; নিবিড় কালিমাময় দিগন্ত-ব্যাপী অতুল্য অনন্ত অন্ধকার। মরি কি সুন্দর, কি ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক, আত্মা-স্পর্শী এই মহান্ দৃশ্য!! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ; তরঙ্গায়িত, প্লাবিত, পৃথিবী আজ অন্ধকারে; গাঢ় গভীর সর্ব্বগ্রাসী ভীম অন্ধকারে; বামে দক্ষিণে, উচ্চে, নিম্নে, সম্মুখে পশ্চাতে, পার্শ্বদেশে ছুটিতেছে ভ্রূকুটি করিয়া ওই অন্ধকার;—ছুটিতেছে, নাচিতেছে, প্রবাহিত হইতেছে—গাঢ় অন্ধকার স্রোত। ধরে না, যামিনি! আর ধরে না এই পৃথিবীতে তোমার অক্ষয় তিমির রাশি। জগৎ প্লাবিত হইয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে প্রত্যেক পরমাণুতে ঐ ঘোর অন্ধকার;—নিবিড় নীরদ জালে জড়িত নক্ষত্র বিরহিত আকাশমণ্ডল,—উচ্ছ্বাসিত হইতেছে অন্ধকারে; তবুও ঢালিতেছে, অবিশ্রান্ত অবিরত মূষল ধারে ঢালিতেছে।—তিমির রাশির উপরে তিমির রাশি! ঢাল, ঢাল, কালরাত্রি

আরও ঢাল তোমার অক্ষয় অনন্ত সম্পদ! মনুষ্য! তোমার কি দুর্ব্বুদ্ধি; তুমি এই অসীম অন্ধকার রাশি আলোকিত করিতে চাও। ইহার কোন্ অংশ তুমি আলোকিত করিবে? ইহার একটি পরমাণুকেও উজ্জ্বল করিবার ক্ষমতা ত তোমার নাই। তোমার এই "দেওয়ালী" উৎসব বালকের ক্রীড়া; উচ্চ অট্টালিকা-নিচয় দীপ মালায় সুশোভিত করিয়াছ, রাজ পথে, বিপণি-স্থলে, দীপপুঞ্জ সংস্থাপিত করিয়াছ; ক্ষণেকের জন্য অতি সুন্দর দেখিলাম, একটি, দুইটি, তিনটি, ভাই! তোমার প্রদত্ত সমস্ত দীপ নিবিল; রাজপথে, অট্টালিকা পরে, বিপণি স্থলে সংস্থাপিত দীপ-পুঞ্জ অন্ধকারে গ্রাস করিয়াছে। দুই একটি নিভৃত কক্ষ হইতে বাতায়ন পথে মৃদু আলোকের এক আধটা ক্ষীণ রশ্মি দৃষ্টি গোচর হইতেছিল, তাহাও ক্রমে অদৃশ্য প্রায়। হায়! এইরূপ, মনুষ্যের ক্রিয়া মাত্রই ক্ষণস্থায়ী বাল্য ক্রীড়া। দুই মিনিট মধ্যে তাহার দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল; দুই ঘণ্টা পরে তাহার জীবনালোক নিবিবে; দুই দিন পরে তাহার নাম মাত্রও পৃথিবীতে রহিবে না; অখণ্ড পূর্ণ অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইবে!

ভীম, নিবিড়, দুর্জ্জয়, অন্ধকার-রাশির মধ্যে আমি একাকী। নিস্তব্ধ, নীরব, সুপ্ত, মৃতপ্রায় প্রাণী জগৎ, ওই যে কি শব্দ। অন্ধকারের শব্দ! ডাকিতেছে, গর্জ্জিতেছে অন্ধকার!! এক দিকে ভীষণ, আতঙ্কময়, অনন্ত তিমির পারাবার, অপর দিকে একটি পতঙ্গ, কীটাণুকীট, ক্ষুদ্র পরমাণুর পরমাণু কণা মনুষ্যাধম আমি। কি বিসদৃশ অবস্থা!! কোনও মনুষ্যের জীবনে এরূপ অবস্থা ক্ষণেকের জন্যও হয় নাই!

আমি এই নিবিড় অন্ধকার স্রোতে ভাসিয়া যাইব—আলোক চাই না; আলোক চঞ্চল; অন্ধকার অচঞ্চল; আমি অচঞ্চল ভালবাসি; অন্ধকার ভালবাসি। প্রিয়তম সুন্দর অন্ধকার! আমি তোমাতে ভাসিয়া যাই, তোমার উপর সন্তরণ করি, আইস তোমাকে অনুভব করি, স্পর্শ করি, চুম্বন করি, আলিঙ্গন করি। আমাকে তোমার অনন্ত স্রোতে অন্ধকার! ভাসাইয়া লইয়া চল অনন্তের দিকে; আমি আর ফিরিব না;—অনন্তের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তে যাইয়া মিলিব। ঈশ্বর অনন্ত; অন্ধকারও অনন্ত, আমি অন্ধকারের সঙ্গে সেই অনন্ত বিধাতার দিকে কি যাইতে পারিবনা? কিন্তু হায়! আমি যে ডুবিতেছি; এই গভীর তিমির রাশির অতল গর্ভে আমি যে ডুবিতেছি,—শরীর ডুবিল, মন ডুবিল; আত্মা আচ্ছন্ন আতঙ্কময়, অন্ধকারে! হায় একি আমার সত্তা

নাই, অস্তিত্ব নাই? সমস্ত ডুবিল যে অন্ধকারে; আমি তবে অন্ধকারের এক অংশ; আমিও কি তবে অন্ধকার? তা বই কি? মনুষ্য জীবন অন্ধকার বই আর কি? পূর্ব্বে অন্ধকার, পরে অন্ধকার, মধ্য ভাগে অন্ধকারের সহিত কঠিন সংগ্রাম। সংগ্রামে কে জয়ী? মনুষ্য? না, অন্ধকার জয়ী। কিন্তু যামিনি প্রিয়তমে, আমাকে ডুবাইও না; গভীর আঁধার রাশিতে আমি ডুবিব না; আমি তোমার আধার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনন্তের দিকে যাইব; যামিনি আমাকে লইয়া চল। তাই বা কেন? আমি ডুবিব। যদি না ডুবিলাম, তাহা হইলে ত কেবল ভাসিতেই থাকিলাম। ভিতরের সকল রহস্য লুকা-নই রহিল। ডুবিলাম না, বাহিরের স্রোতের উপর ভাসিতে থাকিলাম! তা নয়, ডুবিব অন্ধকারের মধ্যে,—অনন্তের মধ্যে ডুব দিব; গভীর হইতে গভীর-তর গর্ভে প্রবেশ করিব; তথায় যাইয়া প্রাণ-ভরে অনন্ত অনুভব করিব, স্পর্শ করিব, অনন্তের সহিত আলাপ করিব, অনন্তে হৃদয় মিশাইব। আহা অনন্তে হৃদয় মিশান কি আরাম, কি শান্তি, কি সুখপ্রদ; স্বর্গীয় শান্তি, পবিত্র আরাম, অপার্থিব সুখ! অন্ধকার মধ্যে হৃদয় পূর্ণ বিমোহিত, প্রফুল্ল, উদ্বেলিত, অন্ধ-কার উপলব্ধি করিয়া। অন্ধকারের ঢেউ আসিয়া হৃদয়ে লাগিল; হৃদয় উথলিল, সংসাররূপ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া হৃদয় শত মুখে, সহস্র ধারায় ধাবিত হইল; উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, হৃদয়ের তরঙ্গ যাইয়া অন্ধকারের তরঙ্গে ঠেকিল, উভয়ে একত্র হইয়া অনন্তের দিকে ছুটিল।

অন্ধকার হৃদয়-স্পর্শী; অন্ধকারে হৃদয় উথলে, হৃদয় তন্ত্রী বিধ্বনিত হয়, আত্মা জাগরিত হয়, জড় জগতের দুর্গন্ধময় বায়ু পারাবার ভেদ করিয়া আত্মা অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে; আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎ হয়; আত্মায় পরমাত্মায় সম্মিলন হয়। হায় এত রহস্য অন্ধকার মধ্যে। এত ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ অন্ধকারের! এক মিনিট পূর্ব্বে যে হৃদয় নীচতার সুগভীর, সংকীর্ণ পঙ্কিল কূপের পঙ্কিলতম স্থানে নিপতিত হইয়া সহস্র কদর্য্য পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিল, মলিনতার উপর মলিনতা উদ্গীর্ণ হইতে ছিল যে হৃদয় হইতে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরীবর্ত্তন সংঘটিত হইল! নিবিড় গভীর অন্ধকার হৃদয়কে টানিয়া আনিল মলিনতা হইতে নির্ম্মলতায়, নীচতা হইতে মহত্ত্বভাবে, সংকীর্ণতা হইতে অনন্তে টানিয়া আনিল হৃদয়কে অন্ধকার! হৃদয় সংসারের ক্ষুদ্রত্ব ভুলিল; অন্ধকার মধ্যে অবাক হইয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইল!!

আড়ম্বর, ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক অন্ধকার! কোন্ হৃদয়, কোন্ মনুষ্য-হৃদয় অন্ধকাররাশি দেখিয়া, তাহার প্রাণস্পর্শী শব্দ শুনিয়া আতঙ্কে ব্যাকুলিত না হয়? কেন এ আতঙ্ক, কেন এ ব্যাকুলতা? নিশীথ নরহন্তা তস্কর বা দুর্বৃত্তদিগের কথা বলিতেছি না, কুসংস্কারাপন্ন ভীরুপ্রাণ কাপুরুষদিগের কথাও বলিতেছি না; তাহাদের ত্রাস মলিনতা-জনিত ও অজ্ঞানতা-নিবন্ধন, তাহাদের আশঙ্কা দুর্ব্বৃত্ততা-মূলক, অতএব তাহাদের কথাও বলিতেছি না কিন্তু কুসংস্কার, বিহীন, নির্ম্মলস্বভাব, সাহসী, বলশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-প্রবরও কেন অন্ধ-কার দর্শনে সঙ্কোচিত হন? কেন তাঁহার হৃদয় এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আতঙ্কে আলোড়িত হয়? কেন তিনি ক্ষণকালের জন্যও চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হন ও স্থির অথচ বিস্মিতনেত্রে নিবিড় অন্ধকার রাশির প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করেন? কোন নির্দ্দিষ্ট ভয়ে তিনি ভীত নন, তাঁহার ত্রাস,—ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়গত নহে; অন্ধকারের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের যে অবস্থা সম্পাদিত হয় তাহা সামান্য ভয় বা ত্রাস বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না; সে অবস্থা সাধারণ ভয় বা ত্রাসের উচ্চতর গ্রামে স্থিত; তাহা অসীম অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্ক—ইহাই অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করে, মনপ্রাণ ব্যাকুল করে। কিন্তু অন্ধকার দেখিয়া কেন এই হৃদয়-বিকম্পনকর আতঙ্ক উপস্থিত হয়? অন্ধকার মধ্যে এমন কি দ্রব্য আছে, যে মনুষ্য তাহা সহ্য করিতে পারে না, ধারণ করিতে পারে না? যাহা হইতে মনুষ্যহৃদয় বিকম্পিত হইয়া, ব্যাকুলিত হইয়া, দূরে পলায়ন করিতে চায়, সে পদার্থ কি? অন্ধকার মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা এবম্ভূত আতঙ্ক সমুৎপাদিত হয়? বোধ হয়, তাহা সেই হৃদয়-বিশ্লথকর পদার্থ, সেই ভয়দ বস্তু—অনন্ত। নিবিড় অন্ধকার-নিহিত অনন্তের গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মনুষ্য অজ্ঞাতসারে নিজের ক্ষুদ্রতা, উপায়হীনতা উপলব্ধি করে, তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, সে আপনার পদশব্দে আপনিই চমকিত হয়। "অকূল অনন্ত অন্ধকার পারাবারে আমি উপায়হীন, আমি একাকী, আমি একটি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর পরমাণুবৎ; আমার বলবীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা—হায়! এ সকল কিছুই নয়, সমুদ্র মধ্যে জলবিম্ব-বৎ" ইত্যাকার চিন্তা তাড়িত গতিতে মনুষ্য-হৃদয়ে উদিত হইয়া ক্ষণেকের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়, মনুষ্য তখন ভয়ে বিহ্বল হয়। নিজের সংকীর্ণ শক্তি বা শক্তিহীনতা ক্ষণেকের জন্যও সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া সে অন্য "কিছুর" প্রতি নির্ভর করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু সে অন্য "কিছু" কি, আর মনুষ্য

তুমিই বা কি? কবি কহেন তুমি "a worm—a god" যথার্থই তুমি তাই; তোমাকে পর্য্যালোচনা করিলে, তোমাকে চক্ষু মেলিয়া দেখিলে বোধ হয় তুমি উভয়ই "a worm—a god." তোমাতে নির্ম্মল দেবভাব ও নারকীয় কীটত্ব উভয়ই বর্ত্তমান। স্বর্গের দেবতা ও নরকের কীট, তুমি একাধারে উভয়ই। মনুষ্য! তোমার জীবন, তোমার প্রকৃতি, এক অপূর্ব্ব অজ্ঞেয় রহস্য। তুমি কি তাহা জানি না। হায়! তবে কে বলিবে, তিনি কি, যিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন। তুমি যাঁহার সৃষ্টি, প্রতি পদক্ষেপে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানেই হউক, তুমি যাঁহার প্রতি নির্ভর না করিয়া থাকিতে পার না, তিনি কি!!!

তিনি জ্যোতি না অন্ধকার! হায়—ক্ষুদ্র অধম মনুষ্য, তুমি কিরূপে জানিবে তিনি কি? তিনি তোমার বুদ্ধির, জ্ঞানের, কল্পনারও অতীত। তিনি তিনিই। তুমি তোমার নিজের রঙে তাঁহাকে রঞ্জিত করিতে ক্ষান্ত হও। তাঁহার বলিয়া তোমার নিজের ছবি আর জগতে দেখাইও না।

হৃদয়ের অন্তস্তল-স্পর্শী সৌন্দর্য্য অন্ধকারের আছে। ঐ দেখ আঁধারের কালিমা রাশি হইতে সৌন্দর্য্য ছটা কেমন উছলিয়া পড়িতেছে, আঁধারের এই অতুল মাধুরী যে নিরীক্ষণ না করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্যের এক অংশ দেখে নাই। সৌন্দর্য্যের যে অংশে নিবিড়তা, যে অংশে গাম্ভীর্য্য, সে অংশে সে অন্ধ। মনুষ্য! অন্ধকারের রূপরাশি একটি বার নয়ন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া দেখ—আর ভুলিবে না, ভুলিতে পারিবে না।

শুন, ঐ শব্দ শুন—আঁধার ডাকিতেছে,—কি ভয়ানক মর্ম্মস্পর্শী শব্দ! আঁধার ডাকিতেছে, বলিতেছে—মনুষ্য সাবধান!—আলোকের পর অন্ধকার, জন্মের পর মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর পর কি? অন্ধকার বলিল—আমাতে ডুব, তবে জানিবে। হায়! অন্ধকারে ডুবিব, তবে জানিতে পাইব, মৃত্যুর পর কি? মৃত্যু হইবে তবে জানিব মৃত্যুর পর কি, আর মৃত্যুই বা কি? ইহার পূর্ব্বে জানিতে পাইব না, জানার অধিকার নাই? ভাল আলোকের পর যেমন অন্ধকার, অন্ধকারের পরেও ত তেমনি আলোক। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পরেও কি তেমনি জন্ম?—জন্মমৃত্যু চক্র-প্রায় কি তবে ঘুরিতেছ? হায়! অন্ধকারের সেই একই শব্দ—"আমাতে ডুব, তবে জানিবে"। হায় অন্ধকার! তোমার পূর্ণতায় নিমগ্ন হইলে প্রাণী কি আর তোমার সীমা পার হইতে পারে?

মর্ম্মকথা।

প্রায় আটশত বৎসর হতভাগ্য ভারত কঠিন অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবাসীগণ ক্রমে ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া আসিতেছিল, নতুবা যে দেশ বিজয়-মদোন্মত্ত সেকেন্দর সাহের প্রচণ্ড আক্রমণও অটলভাবে সহিয়াছিল, সে দেশ অপেক্ষাকৃত অসভ্য ধর্ম্মোন্মত্ত ইসলাম্‌দিগের আক্রমণ কেন প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না? বৈদিক সময়ের সারল্য ও ওজস্বিতা, মহাভারত ও রামায়ণের সময়ের বীরত্ব ও মহিমা, দর্শন ও পুরাণ স্ফূর্ত্তির সময়ের মানসিক পূর্ণবিকাশ, পরে বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি রাজাগণের সময়ের গৌরব ও কীর্ত্তিপ্রচার,—পুরু ও সেকেন্দরের যুদ্ধ হইতেই ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর থানেশ্বর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সহিত আমাদের মনুষ্যত্ব ও আমাদের সমস্ত পূর্ব্বগৌরব একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই আট শত বৎসরের অধীনতায় আমাদের যেরূপ দুর্দ্দশা ও যেরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহাতে আমরা যে আর কখন আমাদের অবস্থার উন্নতি বা পরীবর্ত্তন করিতে পারিব, তাহা সহজে আমাদের উপলব্ধি হয় না। আবার এই সময়ের মধ্যে রাজ পরিবর্ত্তনে—মুসলমানের পর ইংরেজদের অধীনতায়,—আমাদের অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

যখন এদেশ মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল, তখন এদেশের একরূপ অবস্থা হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র দেশ ছিল না; তাঁহারা ভারতবর্ষকেই তাঁহাদের স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন। তাহার পর বহুদিন একত্রে থাকায় পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষে উভয় জাতির মধ্যে কতকটা সম্মিলন হইয়া আসিতেছিল। পশ্চিমেই মুসলমানদিগের প্রভাব অধিক ছিল, বাঙ্গালায় তাঁহারা ততদূর আধিপত্য করেন নাই; সেই জন্যই পশ্চিম দেশীয় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বাঙ্গালীদিগের হইতে পৃথক্‌ ও অনেকটা মুসলমানদিগের অনুরূপ। তথায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহ পর্য্যন্তও চলিয়া গিয়াছিল। এতদূর মিলন হইলেও আমরা চিরকাল মুসলমানদিগের অধীনে থাকিয়া তাহাদের সহিত কখনই একজাতি হইয়া যাইতাম না। মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন যেরূপ বৃদ্ধ সিংহের তেজে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে

ছিল—রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, ও শিখ্ জাতি মধ্যে আর্য্যবীর্য্যের যে স্ফুলিঙ্গ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তাহা কালসহকারে ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া রেরূপে বিস্তৃত হইতেছিল, তাহাতেই মুসলমান রাজত্বের আহুতি হইত। ডাক্তার হণ্টার সাহেব বলিয়াছেন যে 'হিন্দুস্থানে ইংরাজের অধিকার স্থাপনের পূর্ব্বেই মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারত রাজ্য সংস্থাপনের জন্য দিল্লীর বাদসাহ বা কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ করিতে হয় নাই। কেবল মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ জাতির সহিত বহুদিন ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক কেবল হিন্দুরাই ইংরেজদিগের ভারত জয়ে বাধা দিয়াছিল।" সে যাহা হউক, মুসলমান রাজগণ ঐতিহাসিক পরিণামের কোন চিহ্ন রাখিবার পূর্ব্বেই কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেলেন—ইংরাজেরা আসিয়া এদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। মুসলমানদিগের ন্যায় ইংরাজের ভারতাধিকার অন্য জাতি কর্ত্তৃক বিচ্যুত হইবে না এই ধারণা করিলেও, ইংরাজাধিকারে আমাদের কি পরিণাম হইবে সমগ্র ইতিহাস শাস্ত্র মন্থন করিয়াও এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভারতের ভবিষ্যৎ অতি ভয়ানক। বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞগণ অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আমাদের হতভাগা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে আমাদের যেরূপ অবস্থাই থাকুক না কেন, এক্ষণে যে আমাদের অবস্থা—বিশেষত আধিভৌতিক অবস্থা—বিশেষ অবনত এবং ধন, সমৃদ্ধি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অনুন্নত, তাহা আর প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই। এখন কেবল ভাবিবার কথা আমাদের পরিণাম কি?

যদি জেতৃ-জিত-ভাব চিরদিন থাকা সম্ভব না হয়—যদি এক জাতি আর এক জাতির চিরদিন অধীন থাকা সম্ভব না হয় যদি এক জাতির চিরদিন আর এক জাতির অধীন থাকা ঐতিহাসিক সত্য-সঙ্গত না হয়, তবে এই হতভাগ্য ভারতের কি পরিণাম হইবে? ভারতবাসীরা কি পরিণামে ধ্বংস হইবে? —আমরা কি কালসহকারে ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে উন্মূলিত হইব? তাহা হইব না। যদি আমরা একেবারে অসভ্য বর্ব্বর হইতাম—যদি আমরা এত উন্নত জাতি না হইতাম—অথবা যদি আমরা কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত, অবস্থা

বিশেষের বিপর্য্যয়ের সহিত,আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে না পারিতাম—যদি আমাদের সমাজ এত দৃঢ়বদ্ধ না হইত তাহা হইলে আমরা শত শত বৎসরের অধীনতায় এতদিন কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। অন্ততঃ এতদিনে আমাদের ভবিষ্যৎ সন্দেহ সঙ্কুল হইত। হিন্দুসমাজ অত্যন্ত দৃঢ় বদ্ধ—সমাজে অন্তর্ভূত শক্তি অত্যন্ত প্রবল। বুদ্ধদেব হইতে চৈতন্য পর্য্যন্ত কত কত ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকগণের এত চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের উপর তাঁহারা কেহই কোন বিশেষ দাগ বসাইতে পারেন নাই। মুসলমানের তেজ ও বীর্য্য, প্রতাপ ও তরবারি—এ সমাজকে বড় অধিক বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত করিতে পারে না। এখন ইংরেজের বিজ্ঞান, ইংরাজিশিক্ষা, ইংরেজের স্বার্থপর রাজনীতি ও ইংরাজের খৃষ্টানধর্ম্ম এত পরিবর্ত্তন করিয়াও হিন্দুসমাজে কোন গভীর চিহ্নই অঙ্কিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সভ্য ও উন্নত হিন্দুসমাজ সমুন্নত বা স্বীয় অবস্থা পরিবর্ত্তনে অসমর্থ নহে। এদেশের অন্তর্ভূত শক্তি অত্যন্ত অধিক—এখানে আধিভৌতিক (বৈষয়িক) উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মনের উৎকর্ষতা অধিক স্বাভাবিক।

যাহারা সামান্য তর্কে পরাস্ত হইয়া বহুকাল পোষিত মত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না,* তাহারা যে অবস্থা পরিবর্ত্তনে অসমর্থ একথা বড়ই ভ্রমাত্মক। তবে সাধারণত বৈষয়িক উন্নতিতে হিন্দুসমাজকে অনেকটা বীতরাগ দেখা যায়। হিন্দুসমাজ অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া স্থিতিশীলতা বশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, উন্নত অবস্থা অথবা উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে সহজে নিম্নতর অবস্থায় যাইতে পারে না;—এই জন্যই এপর্যন্ত হিন্দুসমাজের রক্ষা হইয়াছে। মুসলমানেরা ত আমাদের তুলনায় কিয়ৎপরিমাণে অসভ্যজাতি ছিল, তাহারা ত পাশব-বলেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছিল। অবশ্য মুসলমান-দিগের আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোন উন্নতিই ছিল না। এ অবস্থায় যদি উন্নত আর্য্যজাতি কতকটা স্থিতিশীল না হইত—যদি তাহার অন্তর্ভূত বল অধিক না থাকিত—তাহা হইলে হিন্দুসমাজের বড়ই দুরবস্থা হইত। সেইরূপ বর্ত্তমান ইংরাজাধিকারেও এই স্থিতিশীলতা গুণেই হিন্দুসমাজ এখনও এত অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা অবশ্য বৈষয়িক অথবা আধি-

* শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ের দ্বারা স্বীয় মত প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নূতন আবরণ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভৌতিক বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক অবনত কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি এখনও আমাদের যাহা আছে, সে বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা অন্তত আমরা কোন অংশে ন্যূন নহি। এ অবস্থায় হিন্দুসমাজ অধিকতর পরিবর্ত্তনশীল হইলে বড় সুফল ফলিত না। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমাদের আধিভৌতিক উন্নতি না হইলে—শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় ইংরাজদের অপেক্ষা অনুন্নত আছে, তাহার উন্নতি না হইলে—এ সময়ে আর আমাদের ভদ্রস্থতা নাই। সে যাহা হউক হিন্দুসমাজ একেবারে মৃত নহে কিম্বা একেবারে অতীতের ভূস্তরে পরিণত হয় নাই, যে সে দিকে আমাদের উন্নতি হইবে না। এখনই সে পথে শিক্ষিত যুবকদল অগ্রসর হইতেছেন এবং শীঘ্রই যে আমাদের সে দিকে উন্নতি হইবে তাহার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

অসভ্যজাতির সামান্য পাশববলের দ্বারা সভ্যজাতির উচ্ছেদ হয়। তবে যে জাতির অন্তর্ভূত শক্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহাকে পাশব-বল একেবারে নষ্ট করিতে পারে না। চীনকে মহা অত্যাচারী তুর্কীরাও বিনষ্ট করিতে পারে নাই—হূন প্রভৃতি প্রবল অসভ্যজাতিরা রোমের একেবারে সমূলোচ্ছেদ করিতে পারে নাই। দুর্দ্দান্ত মুসলমানেরাও হিন্দুসমাজের কোন বিশেষ অপকার করিতে পারে নাই। একেত বর্ত্তমান উন্নত সময়ে পাশববলের আধিপত্য অধিক নাই—আবার দৃঢ়বদ্ধ হিন্দুজাতির পাশব-বল হইতে বিশেষ কোন আশঙ্কাও নাই। এই সকল কারণে ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ কখনই সম্ভব নহে।

হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত শক্তি অত্যন্ত অধিক বলিয়াই আর্য্যনামের এখনও এত সম্মান রহিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষই হউক, আর জাতি বিশেষই হউক, শক্তিই তাহাদের মহত্ত্ব—তাহাদের উৎকর্ষতা পরিমাণ করিবার একমাত্র উপায়। যে পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয় অথবা যে পরিমাণে তাহার ফল উৎপন্ন হয়, তদনুসারে সে শক্তির পরিমাণ বা তাহার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। তবে যখন কোন শক্তি অন্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়, তখন বিরুদ্ধ শক্তি যে পরিমাণে পরাভূত হয়, তাহা দ্বারাই সেই শক্তির প্রকৃত ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই রূপে ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের শক্তির পরিমাণ করিয়াই তাহাদের মহত্ত্ব—তাহাদের উপযোগিতা নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত। আর্য্যজাতির শক্তি অসীম ছিল, তাহার পূর্ব-

বিকাশও হইয়াছিল। তাঁহারাই প্রথমে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, জ্যোতিষ, গণিত, রাসায়ন, চিকিৎসা রাজনীতি সমাজনীতি, সাহিত্য, কাব্য, প্রভৃতি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির আদিগুরু এবং এসিয়ার এক সীমা হইতে ইউরোপের সীমান্তর পর্য্যন্ত সকল জাতিরই শিক্ষক ছিলেন। প্রাচীন রোম বা গ্রীস এত অধিক শক্তির বিকাশ করিতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দুজাতির সমতুল্য মহৎ বা উন্নত জাতি আর নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ যে অনন্ত শক্তিবলে জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তাহার ফলও অনন্ত;—কারণ শক্তি অনন্ত, তাহার বিনাশ নাই—তাহার ফল অনন্তকাল পর্য্যন্ত ফলিতে থাকিবে। তবে ভিন্ন সময়ে ফল ভিন্ন হইবে অথবা শক্তির বেগ প্রতিরুদ্ধ হইবেমাত্র।*—আর্য্যশক্তি প্রধানত সমগ্র পৃথিবীকে এই উন্নতির অবস্থায় আনিয়াছে। নদী যখন সামান্য নির্ঝরিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে অন্য স্রোতস্বতীর সহিত মিলিতে মিলিতে—তাহার তেজ ও তাহার আয়তন বিস্তার করিতে করিতে, বেগবতী হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করে—তখন সেই নির্ঝরণীর প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে না,—কিন্তু তখনও সেই নির্ঝরণীই এই বেগবতী প্রবাহিণীর প্রাণস্বরূপ প্রবাহিত হইতে থাকে। সেইরূপ পৃথিবীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত তাহার জনয়িত্রী হিন্দুজাতির অনন্ত চিরপ্রবাহিনী শক্তির দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু এখনও যদি আমরা মানবজাতির এই সভ্যতা—এই উন্নতির মূল

---

* শক্তির অনন্ত ফলোৎপাদিকাগুণ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বড় সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি একটি সামান্য লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায় তবে সেই লোষ্ট্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে—সেই আকর্ষণ বলানুসারে পৃথিবী একটু ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং তাহার কেন্দ্রও তদনুসারে একটু স্থানচ্যুত হইবে। পৃথিবী কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আকর্ষণ বলে সূর্য্য ও তাহার সহিত অন্য গ্রহগণকেও কেন্দ্রচ্যুত করিবে। এই রূপে সৌর জগৎ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া নাক্ষত্রিক জগৎকে স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে। যদিও লোষ্ট্রনিক্ষেপে এই অনন্ত জগৎকে স্থানভ্রষ্ট করা এত সামান্য যে, কোন যন্ত্রের দ্বারা এমন কি কল্পনা দ্বারাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—তথাপি সত্য সত্যই এই ফল ফলিয়া থাকে। যাঁহারা আকর্ষণের স্বরূপ এবং Laws of motion বুঝেন তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইতে হইবে না। এইরূপ শক্তির অনন্ত ফলোৎপাদিকতাগুণ সম্বন্ধে Conservation ও Transformation of energy বুঝিলে এবং জড়জগতে ও জীব জগতে শক্তির ক্রিয়া বুঝিলে, আর কিছুই বুঝাইতে হইবে না।

অনুসন্ধান করি, তবে প্রাচীন হিন্দু জাতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়িবে। এক্ষণে আধুনিক ইউরোপ বাহ্যিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিভোর রহিয়াছে বলিয়া প্রাচীন আর্য্যশক্তির প্রভাব তাহাদের উপলব্ধি হয় না। সেই শক্তির সংস্কার-মাত্র রহিয়া গিয়াছে। আবার যখন আধিভৌতিক উন্নতির পর আধ্যাত্মিক উন্নতির সময় আসিবে, তখনই আর্য্যগৌরব পুনর্ব্বার জগতে প্রভাসিত হইবে।

অতএব যদি ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব না হয় তবে, কি কখন তাহারা জেতৃজাতির সহিত মিলিত হইবে?—কখন কি এই উভয় জাতি মিলিয়া এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হইতে পারিবে? তাহাও সম্ভব নহে। জেতৃ-জিত-জাতির পরস্পর মিলনের যে কয়েকটি কারণ দেখা যায়, তাহার কোন কারণই এস্থানে লক্ষিত হয় না। এখানে জেতা ও জিত জাতির মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। পরস্পরের ভাষা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক উন্নতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উভয়ের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রভেদও অত্যন্ত অধিক। আবার উভয় দেশের দূরতা এত অধিক যে একদেশ হইতে অন্য দেশে যাতায়াত করিতে একমাসেরও অধিক সময় লাগে; সুতরাং এই দুই দেশের মধ্যে এক প্রকার কোন সংস্রবই নাই বলিতে হইবে। আবার জেতৃ-জিত-জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব এত অধিক ও দৃঢ়সম্বদ্ধ যে তাহা কখন অপনীত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল যে বহুদিন সহবাসে উভয় জাতির বিদ্বেষভাব লাঘব হইয়া আসিবে। কিন্তু সম্প্রতি রাজনৈতিক আন্দোলনে যেরূপ মহা হুলুস্থূল পড়িয়াছিল—পর-স্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষভাব যেরূপ স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সকলেরই পূর্ব্ব সংস্কার ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরস্পরের রীতি নীতি, ও ধর্ম্মগত পার্থক্যহেতু উভয় জাতি মধ্যে যে বিজাতীয় ঘৃণা বদ্ধমূল রহিয়াছে,—পরস্পরের অবস্থার পার্থক্য, জেতা ও জিতের অধিকারের বিভিন্নতা ও আমরা আর্য্য বলিয়া ম্লেচ্ছদের প্রতি আমাদের যে ঘৃণা, এবং আমরা জিত ও অসভ্য বিশ্বাসে আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে ঘৃণা—যেরূপ দৃঢ়সম্বদ্ধ রহিয়াছে—তাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এরূপ বিদ্বেষভাব কখন দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পর ইংরাজেরা কেহই এদেশের অধিবাসী হইবেন না; ইংরাজেরা এদেশকে তাঁহাদের স্বাধীন দেশ মনে করেন, এজন্য তাঁহারা কেহই এই পদানত দেশের অধিবাসী হইতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষত ইংলণ্ডের উপনিবেশ গুলির

যেরূপ অধিকার—যতটুকু স্বাধীনতা আছে, এদেশে বাস করিলে অন্তত সে অধিকার, সে স্বাধীনতা, পাইবেন না; আবার "ব্ল্যাক আক্ট" বা "জুরিসডিক্সান্ আক্ট" দ্বারা এস্থানে যেরূপ মধ্যে মধ্যে উৎপীড়িত হইতে হয়—তাহাতে তাঁহারা এদেশে বাস করা এক প্রকার নীচতা বা অপমান বোধ করেন। যদি তাঁহাদের সহিত আমাদের বিদ্বেষভাব এত দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়—যদি পরস্পরের সম্মিলন সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজিক সঙ্গঠন, বিভিন্ন রীতি, নীতি ভাষা বা ধর্ম্ম বিশেষ অন্তরায় হয়, তবে উভয় জাতির একত্র মিলন কখনই সম্ভবপর নহে। যদি কখনও ইংরাজেরা এদেশে বাস করিতেন, তাহা হইলেও কালক্রমে ইংলণ্ড তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে অথবা অন্য কোন কারণে ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, কোন কালে বরং উভয় জাতির সম্মিলন সম্ভব হইতে পারিত;—অন্তত, মুসলমানেরা আমাদের সহিত যতটুকু মিশিয়াছিলেন, ততটুকু মিশিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উভয়জাতির পরস্পর সম্মিলিত হইবার কোন কারণই লক্ষিত হয় না। অনেকে মনে করেন যে ইংরাজী শিক্ষার অধিক বিস্তার হইলে,—ইংরাজী বিজ্ঞানের অধিকতর আদর হইলে—আমরা শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য করিতে শিখিলে ও ক্রমে ক্রমে এইরূপে ইংরাজের সমকক্ষ হইলে—পরস্পরের বিদ্বেষভাব হ্রাস হইয়া আসিবে এবং কালসহকারে সম্ভবত উভয়জাতি একত্র সংমিলিত হইবে। কিন্তু এই বিশ্বাস বড়ই ভ্রমাত্মক। প্রথমত, উভয়জাতির বিদ্বেষের কারণ স্বতন্ত্র। আমাদের সমাজের এইরূপ উন্নতিতে পরস্পরের বিদ্বেষভাব অপনীত না হইয়া বরং ঘনীভূত হইবে। দ্বিতীয়ত, যখন আমাদের সমাজের এইরূপ আধিভৌতিক উন্নতি হইবে—তখন পরস্পরের সম্মিলন অপেক্ষা আমাদের অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই অধিকতর সম্ভাবনা।

অতএব যখন ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে হিন্দুজাতির কখন বিনাশ নাই —অন্তত বিনষ্ট হইবার এখন পর্য্যন্ত কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই, এবং যখন তাহারা বিজেতাদের সহিত মিলিয়া কখন এক সমাজভুক্ত হইতে পারেন না —তখন অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে হিন্দুগণ আবার স্বাধীন হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব পুনর্ব্বার উদ্ভাসিত করিবেন— তাঁহারা আবার শ্রেষ্ঠজাতি হইয়া অন্তত আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষক হইবেন।

সর্ টমাস্ রোর দৌত্য।

বাণিজ্যজীবী ইংরাজ বহুকাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। এই বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সাধ্যমত উপাসনা করিয়াই অদ্য তাঁহারা এই ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারিত্ব গ্রহণ, ও শাসনকার্য্যে সক্ষম হইয়াছেন। মহাত্মা আকবরের সময় হইতে এমন কি তাহার কিছু পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেজেরা ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য কার্য্যে ব্রতী হন। যে সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ইংরাজ ভারতের সহিত বাণিজ্যে প্রথম প্রবৃত্ত হন, ঐকান্তিক যত্ন ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রভাবে তাঁহারা আজ সেই মহৎ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা ভারতে বাণিজ্য কার্য্যে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাহার সাধনার জন্য তাঁহারা সহযোগী ইউরোপীয় বণিকদিগের হিংসাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, মোগল সুবাদার ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের অসহনীয় অত্যাচার, মোগল সম্রাট্‌দিগের কর্ত্তৃক বাণিজ্য উচ্ছেদের ভয় প্রদর্শন ও অন্যান্য নানাবিধ উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, আজ সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বানুভূত কষ্টের যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা ঐতিহাসিক প্রণালীতে অদ্য তাঁহাদের সেই বাণিজ্যের প্রথম অবস্থা ও তদানুষঙ্গিক কষ্ট সমূহ এবং সুবিখ্যাত সর্ টমাস্ রোর দৌত্যকার্য্য ও তাহার ফল এবং তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকটি চিত্র যথাক্রমে পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিব।

সর্ টমাস্ রো সাহেব ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে এসেক্স (Essex) এর অন্তঃপাতী লোলেটন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ম্যাগডেলেন কালেজে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। টমাস্ রো'র প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই আমরা তাঁহার চতুরতা, অসম সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বদেশহিতৈষিতা ও কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রভৃতি গুণ পরম্পরার যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে থাকিব। অত্যাচারী, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, যথেচ্ছাচার বাদসাহ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসিয়া অশেষ বাধাবিপত্তি

উত্তীর্ণ হইয়া, যে ব্যক্তি স্বদেশের কার্য্যসাধন, ও সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া গিয়াছেন, তিনি কখন সামান্য ব্যক্তি নহেন। যদি যথার্থ বলিতে হয়, তাহা হইলে টমাস্ রো সাহেবই ভারতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন ও তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের সৌভাগ্য সংসাধনের মূল কারণ।

হকিন্স্ সাহেব (Hawkins) যদিও জাহাঙ্গীরের সময়ে রো'র পূর্ব্বে আসিয়া ভারতে ইংরাজ বাণিজ্যের সুবিধা সংস্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যদিও তাঁহার নিকট রাজা জেম্সের স্বাক্ষরিত অনুরোধ লিপি ছিল, যদিও তিনি বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শীঘ্রই তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি মূল কার্য্যের কিছুই সুবিধা করিতে পারেন নাই। রো সাহেবের ন্যায় তিনিও সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংরাজ বাণিজ্য চিরস্থায়ী হয়, তাহা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, অষ্ট প্রহর সম্রাট্সদনে উপস্থিত থাকিতেন, তথাচ, তদ্দ্বারা কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কি প্রকারে হকিন্সের সেই চিরসঞ্চিত আশা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াগেল, তদ্বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের এই প্রবন্ধের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়াই আমরা পূর্ব্ব ঘটনার অনুসরণে বাধ্য হইলাম।

হকিন্স্ সাহেব যখন প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মীর মোকারাব খাঁ বাহাদুর তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি সেই বাণিজ্য পোত হইতে কতকগুলি দ্রব্যজাত লইয়া আদতে তাহার মূল্য দান করেন নাই। ইহা ভিন্ন হকিন্সের প্রতি অন্যান্য কুব্যবহার করাতে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দুরপনেয় মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। সময়-ক্রমে হকিন্স্ আগরায় গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণে বিশেষ কৃতকার্য্য হন। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া হকিন্স্ মোকারাব খাঁ বাহাদুরের অত্যাচারগুলি সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। সম্রাট্ বিদেশীয়-দিগের প্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া মীর মোকারাবকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কার সাধ্য মোগল সম্রাটের অনুজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে? সম্রাট যাহা বলিলেন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা সম্পাদিত হইল। মীর সাহেব পদচ্যুত, অবমানিত ও যথাসর্ব্বস্ব হীন হইয়া মনে মনে প্রতিহিংসা লইবার জাল গড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল, মীর মোকারাবের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি পুনরায় প্রসন্ননয়নে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি উৎকোচ প্রদানেই হউক, বা সম্রাটের দয়াবলেই হউক, পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হৃত মান ও ধনরাশির উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইলেন। অনেকগুলি প্রধান প্রধান আমীর ওমরাও তাঁহার সহায় হইয়া উঠিলেন। সকলেই ইংরাজের প্রতি সমান অনাদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল হকিন্স (Hawkins) যে তাঁহাদের বিষনয়নে পতিত হইলেন, এমন নহে—সমস্ত ইংরাজ জাতির প্রতিই তাঁহাদের বিদ্বেষপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে ইংরাজবাণিজ্য লোপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সকলেই জানেন যে, জাহাঙ্গীর অতিশয় অলস ছিলেন। তিনি বড় লোকের মুখে যখন যাহা শুনিতেন তখনই তাহাতে ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সত্যাসত্য পর্য্যবেক্ষণের কিছুমাত্র নিজে চেষ্টা করিতেন না। জাহাঙ্গীরের এই প্রকার অলস প্রকৃতি উপরোক্ত ইংরাজ দ্বেষীদিগের বাসনা সিদ্ধির পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইল। তাঁহারা সকলে মীর সাহেবের সহিত মিলিয়া সম্রাটের কর্ণগোচর করিলেন যে, ইংরাজদিগের প্রশ্রয়ে সম্রাটের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধন হইতেছে। তাঁহারা একটি আশ্রয়স্থান (কেল্লা) নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ও তজ্জন্য অনেক গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র ও কামানাদি আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, ইহারা হয় ত কালক্রমে সম্রাটের প্রতিযোগী অন্যান্য বিদেশীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবেন। অতএব যত শীঘ্র মোগলরাজ্যে ইংরাজবাণিজ্যের লোপ হয়, সম্রাটের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই প্রকার অনুযোগ বস্তুত বিশেষ ফলোপধায়ক হইল, সম্রাট সত্যাসত্য কিছুই অনুসন্ধান করিলেন না। যখন তাঁহার মঙ্গলকারীগণের মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তখন যে ইহা যথার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি হকিন্সের প্রতি সমস্ত অনুরাগ ভুলিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ জলদগম্ভীরস্বরে বিঘোষিত হইল "ইংরাজ আর মোগল-রাজ্যের কোন স্থানে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে পারিবেন না।" ইহাতে মোকারেবের অভীষ্ট ও বৈরসাধন প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হইল, ইংরাজ বাণিজ্যের মূলে অসহনীয় আঘাত পড়িল, হকিন্সের স্বদেশে মান ও প্রতিপত্তি লাভের আশা লোপ হইল এবং তিনিও বিফল মনোরথ হইয়া আগরা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

* Vide Hawkin's Letters to the East India Company.

যখন এই সংবাদ বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণগোচর হইল, তখন তাঁহারা সাতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রচুর লাভ হইতেছিল এবং এই বাণিজ্য ক্রমে আরও বর্দ্ধিত ও দৃঢ়মূল হইলে তাঁহাদের অর্থাগম যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এই আশায় তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিতে-ছিলেন। কিন্তু এ সংবাদে তাঁহাদের সে মোহ অপনীত হইল ও তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মধ্যে মধ্যে আরও অত্যাচারের কথা ভারত হইতে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ও তাঁহারাও ব্যস্তসমস্ত হইয়া আশু প্রতীকারের কোন উপায়ানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের প্রথমে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম স্থাপিত হয় ও তাহার কিছুকাল পর হইতেই এই কোম্পানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতের সহিত বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হন। বাণিজ্যে তাঁহাদের বিশেষ ধনাগম হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি ভারতের সহিত তাঁহারা অব্যাহত বাণিজ্য চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য তাঁহাদের না করিলেও চলিবে। কিন্তু ভারতে যে ঘটনা উপস্থিত, তাহাতে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আকাশ নিতান্ত অন্ধকারময় বলিয়া তাঁহাদের উপলব্ধি হইতেলাগিল। কালে যে এই মেঘরাশি একত্রিত হইয়া ভীষণ ঝটিকা উত্থিত করিবে, তাঁহারা ইহা দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ভারত হইতে বিবিধ প্রকারের অত্যাচারের কথা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই সমস্ত দুর্ঘটনার প্রতিবিধানার্থে তাঁহারা একটি উপযুক্ত লোক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সর্ টমাস্ রো ঠিক সেই সময়ে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রো সাহেবের ভ্রমণ-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল, এক্ষণে আমেরিকা ভ্রমণে তাহা শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে—তিনিও ভ্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বহুকাল হইতে মোগল-রাজ্যের (Great Mogul) ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির বিষয় তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা সাতিশয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভারত-সম্রাটের স্বর্ণময় স্তম্ভ, মণিখচিত ছাদ, বহুমূল্য বস্ত্র মণ্ডিত সভাতল ও নানাবিধ বহুমূল্য মণিখচিত, স্বর্ণমণ্ডিত দ্যুতিময় সিংহাসন ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভারতীয় ঐশ্বর্য্যাদি তখন আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় ইংল-

ভীয় জন সাধারণের মনোরঞ্জক ছিল। রো সাহেব হকিন্স্ প্রচারিত লিপিগুলি ও পুস্তকাবলী পাঠে সাতিশয় কৌতুহল পরবশ হইয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও এই মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত অন্য কোন লোক না পাইয়া রো কেই সম্মানের সহিত আহ্বান করিলেন। রো সাহেবও বুদ্ধিমানের ন্যায় "উপস্থিত পরিত্যাগ করিতে নাই" ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

বর্ণনীয় বিষয় ছাড়িয়া আমরা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দুই একটি কথা বলিব। তখন ইংরাজগণ ভারতে কি প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতেন ও তাহাতে তাঁহাদের কতদূর অসুবিধা হইত, এতৎ সম্বন্ধে পাঠক মহোদয়কে দুই একটি কথা বলিব। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম স্থাপনাবধিই যে ভারতের সহিত তাঁহারা বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ও সম্রাটের অনুমতি লইয়া সাধ্যমতে তাঁহারা তৎকালে সমুদ্রের উপকূলে দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সুরাট নগর তৎকালে সমগ্র ভারত মধ্যে প্রধান বন্দর ছিল। সুরাটের সমৃদ্ধিও যে তৎকালীন অন্যান্য নগরী অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইংরাজ এই সুরাটে প্রধান আড্ডা স্থাপন করিলেন। সুরাট সম্রাটের অধিকৃত ও সমুদ্রের বিশেষ সুবিধা-জনক স্থানে সংস্থাপিত বলিয়া সকল জাতীয় বণিকেরাই এইখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি অবতরণ করাইয়া বিক্রয় করিতেন। এই সুরাটে সম্রাটের এত অধিক ধনাগম হইত, যে প্রতি বৎসর নবাব সাহেব ও অন্যান্য রাজকীয় কর্ম্মচারীর যথেষ্ট লাভ হইয়াও রাজ সরকারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হইত। ইংরাজের বাণিজ্য দ্রব্য তথায় অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। আজও যেমন ইংরাজ ছুরী কাঁচি প্রভৃতি চাকচিক্যময় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতের বক্ষশোষণ করত ধনরত্নাদি লইয়া যাইতেছেন, প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা ঠিক সেইরূপ করিতেন। জাহাজ ভরিয়া বন্দুক, তরবারি, ছুরী, কাঁচি ও অন্যান্য নানাবিধ চাকচিক্যময় অস্ত্রশস্ত্রাদি দেশীয় মহাজনদিগকে প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে তাল তাল অপরিষ্কৃত স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা, রেশমীবস্ত্র, রেশম, ও নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া যাইতেন। ইংলণ্ডে গিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বিগুণ মূল্যে লর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়দিগের নিকট ও রাজার নিকট বিক্রয়

করিতেন। তৎকালে ইংরাজের তৈয়ারি দ্রব্যাদিরও ভারতে বিশেষ আদর ছিল। নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার তখন সাধারণের মধ্যে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল; তখন সাধারণ লোকের আত্মরক্ষার্থ অনেক সময়ে অস্ত্রাদি রাখিবার প্রয়োজন হইত। এখনকার ন্যায় তখন কিছু অস্ত্রের আইন প্রচলিত ছিল না। সুতরাং ইংরাজদের এই সকল অস্ত্র শস্ত্র দেশীয় মহাজনেরা কিনিয়া লইয়া উচিত মূল্যে বিক্রয় করিত এবং মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাবলী বাছিয়া বাছিয়া সম্রাট্‌কে বিক্রয় করা হইত। যদিও তখন সম্রাটের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের উপযুক্ত কারখানা ছিল তথাপি তাহাতে কেবল তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহই প্রস্তুত হইত এবং যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহাতে সকলের কুলাইত না। কাজেই ইংরাজের অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রথমত চাকচিক্যতার গুণে, দ্বিতীয়ত মূল্যের স্বল্পতায় অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা (East India Company) এই প্রকারে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মীর মোকারেবের সহিত হকিন্সের বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে ইংরাজের আর শ্রেয় রহিল না। যথোপযুক্ত শুল্ক প্রদান করিয়া যে তাঁহারা নিস্কৃতি পাইতেন এমত নহে, কখন কখনও বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অযথা শুল্ক দাবি করা হইত এবং তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে নবাবের কর্ম্মচারীরা দ্রব্যাদি নামাইতে দিতেন না। এবং কখনও জাহাজ আসিয়া বন্দরে লাগিলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (নবাব) দলবল লইয়া জাহাজস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিতে যাইতেন ও নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের ইংরাজ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। কোন দ্রব্য সেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার চক্ষে সুন্দর লাগিলে তিনি হয়ত বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতেন, না হয় "মূল্য দিব" এই কথা বলিয়া লইয়া যাইতেন। পরে হয় ত মূল্য দিবার নাম ও মুখাগ্রে আনিতেন না। যদিও নিতান্ত ভদ্রতার অনুরোধে মূল্য দিতেন, তাহাতে বণিকদিগের লাভ না হইয়া সম্যক্‌রূপে লোকসান হইত। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা অনুনয় বিনয় করিলে তিনি তাহাতে বধির হইয়া থাকিতেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের অভিযোগ করিবার উপায় ছিল না। কাহার কাছে অভিযোগ করিবেন, যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক; আবার সম্রাটের কাছে গিয়া সাক্ষাৎ লাভ করা বড় দুরূহ ব্যাপার ছিল। ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি অভিযোগে কর্ণপাতও করিতেন না। আবার কখন কখনও বা বাণিজ্য

দ্রব্যাদি নগর হইতে নগরান্তরে লইয়া যাইবার জন্য অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হইত। ইহাতে তাঁহাদিগকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িত হইতে হইত। তখনকার এই নিয়ম ছিল যে সমুদ্রে যদি কোন বাণিজ্য জাহাজ মগ্ন হইত, তাহা হইলে তাহার দ্রব্যজাত সম্রাট্ সরকারে নীত হইত। যদি কোন ইংরাজ বণিকের জাহাজ উপকূলে বা সমুদ্রে মগ্ন হইত, তবে দুর্ভাগ্য বশত এই নিয়মের অধীন হইয়া সেই হতভাগ্য বণিকের সর্ব্বস্ব সমুদ্রোদ্ধৃত হইয়া সম্রাট্ সরকারে নীত হইত। এই প্রকার নানাবিধ অত্যাচার চতুর্দ্দিকে তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। এই প্রকার অসহনীয় অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টমাস রোকে ভারতবর্ষে মোগল সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সামান্য কোম্পানীর নামে দূত পাঠাইলে হয় ত সম্রাট গ্রাহ্য করিবেন না, এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজা জেম্স্কে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিজ নামে দূত পাঠাইতে অনুরোধ করাতে রাজা জেম্স্ সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতের ইংরাজদিগের উপর যে সমস্ত অত্যাচার হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য রাজা একখানি অনুরোধ পত্র সাক্ষরিত করিয়া দিলেন। শুভদিনে ইংলণ্ডাধিপের প্রধান দূত (Lord Ambassador) মোগল সম্রাটের নামে অনুরোধ পত্র ও তাঁহার জন্য নানাবিধ বিলাতি উপঢৌকন, লইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত সুরাট বন্দরে —১৬১৫ খৃঃ অব্দে উপস্থিত হন।

সুরাটে অতি সমারোহের সহিত ইংলণ্ডীয় রাজ-দূত অবতরণ করিলেন। নদীতে যে সমস্ত জাহাজ ছিল, ক্ষুদ্র পতাকাদি ও পুষ্পমালায় তাঁহার সম্মানার্থে তাহা অধিকারীদিগের দ্বারা সুসজ্জিত হইল। তাঁহার সম্মানার্থ ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল। এবং সাধারণ সদাগর, কাপ্তেন ও প্রায় অশীতি জন অস্ত্রধারী পুরুষ শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিল। নবাবের কর্ম্মচারীরা ইংলণ্ডীয় রাজদূতকে প্রকাশ্য সভায় সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। রোর সমভিব্যাহারী লোকদিগের দ্রব্যাদিও এমন কি সম্রাটের উপঢৌকনাদি পর্য্যন্ত মোগল-কর্ম্মচারীরা পূর্ব্ব প্রথানুসারে খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা রোর নিষেধ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না।

রো সাহেবের থাকিবার জন্য সুরাট নগরে একটি বিস্তৃত ভবন স্থির করিয়া দেওয়া হইল। সর্ টমাস্ রো প্রায় একমাস ধরিয়া সুরাটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাদসাহ এই সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং রাজধানী আগরা হইতে আজমীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। এই সংবাদ রো'র কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি বিমল আনন্দনীরে মগ্ন হইলেন। আগ্রায় গিয়া সমস্ত বাধা বিপত্তি, অতিক্রম করত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা যে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, ইহা তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মোগল কর্ম্মচারিরা তাঁহার যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকাতে রো এতদিন তাঁহাদের অপেক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এক মাসকাল বৃথা গত হইয়া যাওয়াতে, ও তাহারা তাঁহার সাহায্যে শিথিল প্রযত্ন হওয়াতে, তিনি অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই কর্ম্মচারিদিগকে পুন পুন এই বিষয়ে উত্যক্ত করাতে, তাহারা তাঁহার আজমীর গমনের জন্য যানবাহনাদি সংগ্রহ করিয়া দিল—রো-উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ের বুরহানপুর সম্রাটের প্রধান সেনানিবেশ স্থান ছিল। কুমার পারবেজ এই সমস্ত সেনার অধিনায়ক হইয়া এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সুরাট হইতে দুই শত পঞ্চাশ ক্রোশ পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া রো-সাহেব, বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে—কুমার পারবেজের সহিত তাঁহার সাক্ষাতেচ্ছা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল। রো—উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে—একজন কোতোয়াল আসিয়া কুমার পারবেজের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে কহিল, যে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষী। রো এই সংবাদে অনতিবিলম্বে পারবেজের সভায় যাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। উপঢৌকনাদি প্রদান দ্বারা তাঁহাকে অনুকূলে আনিতে পারিলে, তাঁহার আজমীর গমনের ও কোম্পানীর বাণিজ্য কার্য্যের অশেষ সুবিধা হইবে—ভাবিয়া তিনি কতকগুলি উপহার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কুমারের সভাগৃহ উদ্দেশে চলিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য পথ পার্শ্বে, একদল অশ্বারোহী অবস্থান করিতেছিল। রো-সভাভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে (পারবেজ) যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অদূরে উপবিষ্ট হইলেন।

তাঁহাদের মধ্যে দ্বিভাষীর সাহায্যে নানাবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কুমার অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বুরহানপুরে ইংরাজ বাণিজ্য বিস্তার করিবার অনুমতি দিলেন ও রো'র শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ও তাঁহাকে আজমীরে লইয়া যাইবার জন্য বিংশতি জন শরীররক্ষক প্রদান করিয়া ইংলণ্ডীয় রাজদূতকে সম্মানে বিদায় দিলেন।

এক মাসের পর—সেই দুরধিগম্য ও বিপজ্জনক পথ অতিবাহন করিয়া রো সাহেব, ১৬১৫ খৃঃ অব্দ ২৩শে ডিসেম্বর নির্ব্বিঘ্নে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি পর বৎসর ১০ই জানুয়ারিতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভার্থ প্রথম গমন করেন।

রো'র অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন বলিয়া তিনি প্রথম সন্দর্শনেই সম্রাটের করুণা-নয়নে পতিত হন। রো সাহসে বুক বাঁধিয়া দলবল পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট্ দরবারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সুপ্রশস্ত সভা ভবনের উচ্চতম স্থলে ভারতবর্ষের সম্রাট্ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নানাবিধ মণি-খচিত, মুক্তা-বিনির্ম্মিত সিংহাসন, বহুমূল্য পারস্য দেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত হইয়া সম্রাটের ভার বহন করিতেছে। সিংহাসনের চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত চারিটি স্বর্ণ দণ্ডের উপর, মণিখচিত চন্দ্রাতপ ঝকমক করিয়া দোদুল্যমান হইতেছে। সম্রাটের দুই পার্শ্বে সেই উন্নত স্থানের (Plat form) উপরে রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ নৃপতিগণ বহুমূল্য বসনে শোভিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহার দুই হাত নীচে আমীর ওমরাহগণ সুন্দর-রূপে সজ্জিত হইয়া সম্রাট্ সদনে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাহার দুই হস্ত নীচে রাজ্যস্থ বর্দ্ধিষ্ণু ও ক্ষমতাশীল প্রজাবর্গের নির্দ্দিষ্ট স্থান। তন্নিম্নে সাধারণ প্রজাবর্গ অবস্থান করিতেছে। রো এই দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় মোহিত ও স্তম্ভিত হইলেন। উক্ত দিবস (১০ই জানুয়ারি ১৬১৬ খৃ) তিনি বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে যে—"মোগল রাজের সভাকে লণ্ডনস্থ একটি সর্ব্বপ্রধান নাট্যশালার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সম্রাট্ যেস্থলে বসিয়াছেন তাহাকে রঙ্গমঞ্চ বলা যাইতে পারে। আমীর ওমরাহ ও বাদসাহ যেন বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া অভিনয় করিতেছেন,এবং সর্ব্বনিম্নস্থ সাধারণ প্রজাবর্গ যেন দর্শক মণ্ডলী-রূপে অবস্থান করিতেছে। ইংলণ্ডের রাজা নাট্যশালায় গমন করিলে সেইদিন যেমন তাহার শোভা হইয়া থাকে,মোগল সভার শোভা চিরকালই সেইরূপ।"

রো সাহেব প্রচলিত নিয়মানুসারে, সম্রাট্‌কে তিনবার অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব কথিত উচ্চ ও নিম্নস্থলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিরোহণী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। রো, প্রত্যেক অধিরোহণীর নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তকাবনত করিয়া সম্রাটকে সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। অদূরে তাঁহার বসিবার জন্য স্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। দ্বিভাষীর দ্বারা তাঁহাদের নানাবিধ কথোপ-কথন চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রো উপঢৌকন দ্রব্যগুলি সযত্নে সম্রাট্‌ সমক্ষে রক্ষা করিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে পিয়ানোর ন্যায় যে বাদ্য যন্ত্র ছিল—তাহা সম্রাটের আদেশ ক্রমে, তাঁহার কৌতূহল নিবারণার্থ রো সাহেবের একজন সঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন। বিলাতি শকটখানি, বিলাস-প্রিয় সম্রাট, নিজে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে অসম্মত হইয়া একজন পার্শ্বচরকে দেখিতে বলিলেন, সে আসিয়া, তাঁহার নিকট যথাযথ বর্ণন করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিল। যদিও সম্রাট্‌ এই সকল দ্রব্য পাইয়া ইংলণ্ডাধিপের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যদিও রো সাহেবকে তিনি যতদূর সন্তোষ দেখাইতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি ইংলণ্ডাধিপ, মণিমুক্তাদি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া একজন সভাসদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর জানিতেন না যে ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও এমন মণিমুক্তা জন্মে না। আর মণিমুক্তাদি ভারত হইতে রপ্তানির জিনিশ ভারতে, আমদানির জিনিশ নহে।

রো সাহেব প্রথম দিবসেই সম্রাটকে রাজা জেম্‌সের অনুরোধ পত্র ও লিপি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ইংরাজী লিপির অনুবাদও তাহার সহিত সংযুক্ত ছিল। জাহাঙ্গীর দ্রব্যাদি পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এই লিপি দৃষ্টেও তদ্রূপ সুখী হইলেন। বিদেশীয় দূত, এইরূপে জাহাঙ্গীরের সভায় যতদূর সম্মান লাভ করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন। ভারত সম্রাট্‌ রো'কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে "আপনার ন্যায় কোন বৈদেশিক রাজদূত এতদূর আদৃত ও সম্মানিত হন নাই"। রো সেই দিবসের মত অসুস্থতা নিবন্ধন সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসুস্থতা শুনিয়া আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে থাকিতে সম্রাট্‌ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রো নম্রতার সহিত সে অনুরোধ কাটাইয়া দেন।

একণে টমাস্‌ রোর কথিত কাহিনীর, অনুসরণ করিয়া—রাজপ্রাসাদের [illegible] চিত্র আমরা পাঠকবর্গের সমুখে ধরিব।

সম্রাটের প্রাসাদ চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর মালা দ্বারা বিশেষরূপ পরিবেষ্টিত ছিল। দ্বার অতিক্রম করিয়া সভাভবনে উপস্থিত হইলে—তাহার দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার পরিদৃশ্যমান হয়। এই দ্বার দিয়া গোসলখানা (স্নানাগার) যাইবার পথ। গোসলখানা ঠিক সভাগৃহের পার্শ্বেই স্থাপিত। এই স্থানে একটি বহুমূল্য প্রস্তর রচিত সুন্দর স্নানাগার আছে। গোসলখানা যে কেবল স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। প্রতিদিবস রাত্রে, রাজকার্য্যাবসানের পর সম্রাট নগরস্থ সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ ও সভাসদগণকে নিমন্ত্রণ করেন। একটি নিয়মিত সময়ে তাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হইলে মদ্যপান আরম্ভ হইয়া থাকে। আকবরের জীবিতাবস্থায় কেহই এই গোসলখানার ভিতর মদ্যের নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না—এই নিয়ম বস্তুত বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া অধিকাংশ সময় এ নিয়ম মানিতেন না। রো সাহেব তাঁহার পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন—"একদিন সমস্ত আমীর ওমরাহ এই গোসলখানায় সমবেত হইয়াছেন, সম্রাট অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। "মদ্যপান আরম্ভ হউক" সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন; পরক্ষণেই সম্রাট মদিরা তেজে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কে মদ্যপানের আজ্ঞা দিল—" বলিয়া উচ্চপদস্থ আমীর ওমরাহদিগকে অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; আমি তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম"। রো প্রতি রজনীতেই এই গোসলখানায় উপস্থিত হইতেন; এই স্থলে সম্রাটের সহিত তাঁহায় নানা বিষয়েকথোপকথন হইত। রাজসভায় যে সকল বিষয়ে মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব সম্রাট সেই সকল বিষয়ে টমাস রোকে এই স্থানে জিজ্ঞাসা করিতেন। যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ রো সাহেব, মোগলরাজের এত উপাসনা করিতেছিলেন, সে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গই সম্রাট কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইত না। এক দিন কথাক্রমে বিলাতি ঘোটকের কথা মনে হওয়াতে সম্রাট রোকে তাঁহার জন্য ইংলণ্ডজাত কয়েকটি ঘোটক আনাইতে অনুরোধ করেন। রো তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—যে স্থল-পথে আনিতে গেলে বড় অসুবিধা—কারণ ইউরোপে এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে—এবং জলপথে যদিও উপায় আছে, তথাপি তাহা অনায়াস সাধ্য নহে, কারণ ইউরোপ হইতে ভারতে আসিতে অনেক বিলম্ব ও ঝটিকা ভোগ করিতে হইবে সুতরাং এই পথেও ঘোটক

আনা অসম্ভব। সম্রাট নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন—তিনি বলিলেন 'তোমরা পাঁচ ছয়টি ঘোড়া একাবারে পাঠাইও। তাহাদের মধ্যে একটি যদি জীবিত থাকে, ত আমি তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইব।' রো সম্রাটের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বদেশে এইজন্য পত্র লেখেন। এই প্রকারে তাঁহার সহিত অন্যান্য নানা বিষয়ে কথা উপস্থিত হইত, কিন্তু কাজের কথা ভ্রমেও উত্থিত হইত না। রো নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। অন্য সময়ে সম্রাটের সহিত তাঁহার সুবিধামত সাক্ষাৎ হইত না।—প্রাতে সম্রাট, বাতায়নে বসিতেন, এই স্থানে বসিয়া তিনি নিম্নস্থ সমস্ত কার্য্য ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন। বাতায়নের অদূরে—নিম্নে প্রশস্ত ক্ষেত্রে, প্রজাবর্গ উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে আবেদন ও অভিযোগপত্র দিতেন ও সময়ে সময়ে আমীর ওমরাহগণ উপহার দ্রব্য দিয়া সম্রাটকে দর্শন করিতেন। সাধারণের পক্ষে রাজসন্দর্শনের এই প্রধান ও সুবিধাজনক সময়। প্রজাদিগের সহিত কার্য্য শেষ হইলে সৈন্যদিগের সমাবেশ-শিক্ষা (Parade) ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সমাবেশ-শিক্ষা দেখিতেন।০ নয়টা বা দশটার সময় প্রাতরাশ শেষ করিয়া বেগম মহলে প্রবেশ করত তাঁহাদের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া একটু নিদ্রা দিতেন। একদিন বাতায়নে রো সাহেব দুইটি বেগম সাহেবকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন—যে "এ প্রকার রূপমাধুরী আমি কখনও নিরীক্ষণ করি নাই। একদিন আমি বাতায়নপথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎলাভ মানসে গিয়াছিলাম, দুইটি অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রূপসী বাতায়ন নিকটে পার্শ্বস্থ পরদা ছিন্ন করিয়া আমাকে কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিলেন। হঠাৎ বাতাসে সেই পরদা ঈষৎ দোদুল্যামান হওয়াতে—আমি তাঁহাদের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলাম—তাঁহাদের বর্ণ অতি গৌরবর্ণ ও এক কথায় তাঁহারা দেখিতে অতি সুন্দরী। মস্তকের উপর, সেই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজির উপর অনেকগুলি হীরকখণ্ড শোভিতেছে—কর্ণে নানাবিধ অলঙ্কার দুলিতেছে। বহুমূল্য বসনে তাঁহাদের মস্তকের অর্দ্ধভাগ আবৃত রহিয়াছে। তাঁহারা বোধ হয়, আমাকে দেখিতে সম্রাটের অনুমতি পাইয়াছিলেন—আমার বোধ হয় এই দুইটির মধ্যে একটি নুরমহল। সম্রাট বাতায়ন ত্যাগ করিবামাত্র সেইটি তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।"

মধ্যাহ্নকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়া জাহাঙ্গীর জালালায় বসিয়া

সিংহ ব্যাঘ্রাদির ক্রীড়া দেখিতেন। এবং বেলা ৩।৪ ঘটিকার সময় সভায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য করিতেন। এ সময়ে কাজের এত ভিড় হইত, যে কোন কথা পাড়িবার যো ছিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রো বিলাতে আর কতকগুলি উপঢৌকন পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। জাহাঙ্গীরকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে সুরা অধিক পরিমাণে চাই সুতরাং তিনি এই বলিয়া বিলাতে পত্র লেখেন—"There is nothing more welcome here, nor did I ever see men so fond of drinking as the king and the princes are of red wine. * * * the king has ever since solicited for more, I think four or five casks of that wine will be more welcome than the richest jewels in Cheapside. * রোর অভিমত দ্রব্যাবলি আসিয়া উপস্থিত হইল। রো' এই দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত সময়ে সম্রাট্কে সেই নূতন উপঢৌকনগুলি প্রদান করিলেন। এবার কার উপঢৌকন মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ছিল। সেই চিত্রগুলির মধ্যে এক খানি চিত্র দেখিয়া সম্রাট অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা দায় হইয়া উঠিল। তিনি রো'র প্রতি ঘন ঘন রোষপূর্ণ কটাক্ষ পাত করিতে লাগিলেন। রো' স্তম্ভিত ও ভীত হইয়া কি উপায়ে পরিত্রাণ পাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই চিত্রে একটি সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি একটা বিকটাকার দৈত্যকে নাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল— ইহা চিত্রিত ছিল। সেই সুন্দরী মূর্ত্তি গ্রীসীয় দেবী, সৌন্দর্য্যের ঈশ্বরীকে লক্ষ্য করিয়া চিত্রিত হইয়াছিল,—রো জানিতেন না যে, এই সামান্য চিত্র হইতে এত বিভ্রাট ঘটিবে। সম্রাট বলিলেন এ চিত্র আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তিতে আমাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ও ঐ সুন্দরী মূর্ত্তি নূরজাহান। আমি নূরজাহানকে অত্যন্ত ভাল-বাসি ও তাঁহার বাধ্য বলিয়া, আমার প্রতি এইরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিছুতেই রো, সম্রাটকে বুঝাইতে পারিলেন না যে এই চিত্রে কোন দুষ্যভাব নাই। অবশেষে রো নিরুপায় হইয়া সেদিনকার মত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিবস অন্যান্য সভাসদবর্গের সাহায্যে সম্রাটকে এই প্রকার অযথা অনু-

---

* Vide—Row's Letters to the E. I Company and also G. W. Clene's Papers on the Court of Jehangir or The Great Mogul.

হাত হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন। এই প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া রো যতশীঘ্র কার্য্যসিদ্ধ করিয়া মোগল-রাজ-সভা হইতে অবসর পাইতে পারেন, এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন দরবারে সম্রাটকে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বাণিজ্যের অনুরোধ-পত্র দিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট ও ফারমানের সমস্ত আয়োজন করিয়া কি প্রকারে অনুরোধপত্র ও ফারমান প্রস্তুত হইবে ও কি প্রকারে সন্ধি করিতে রো'র ইচ্ছা—এই বিষয়ে টমাস্ রো'র মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রো সাহেব কোম্পানীর দিকে সম্পূর্ণ টানিয়া এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। ইংরাজদ্বেষী আসফ্ খাঁ, কুমার সাহজাহান ও অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গ তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়াতে রো সেইবার অকৃতকার্য্য হয়েন। তৎপরে আসফ্‌খাঁকে এক বহুমূল্য হীরক উপহার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া ও পাকেপ্রকারে কুমার সাহজাহানকে বশে আনিয়া রো সন্ধিপত্র প্রস্তুত করেন। সুবিধামত সম্রাট তাহাতে শীল-মোহর করিয়া দিলেন। সন্ধির প্রধান চুক্তিগুলির মধ্যে (১) ইংরাজদিগকে নিরাপদে, বাঙ্গলায় ও মোগলরাজ্যের সুবিধাজনক স্থানে বাণিজ্যাদি করিতে দেওয়া হইবে—(২) তাঁহাদের প্রতি কোন শাসনকর্ত্তা অযথা পীড়ন করিতে পারিবেন না—(৩) তাঁহাদিগকে দ্রব্যাদি স্থানান্তর করিবার শুল্ক দিতে হইবে না—(৪) যে সকল শাসনকর্ত্তা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন তাঁহারা সম্রাট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবেন—ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান ছিল। এই প্রকারে অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া স্বীয় চতুরতা ও কার্য্যকুশলতা গুণে টমাস্ রো কোম্পানির কার্য্য সিদ্ধিকরত রাজা জেম্‌সের পত্রের উত্তর লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। স্বদেশে সম্মানের সহিত চিরকাল তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আমরা আবশ্যক বিবেচনায় সম্রাট্ রাজা জেমসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের সার মর্ম্ম পাঠক মহাশয়দের জন্য তুলিয়া দিতেছি। "যখন মহারাজ এই পত্র, পাঠার্থ প্রথম খুলিবেন, আশা করি, আপনার অন্তঃকরণ ইহার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া নিতান্ত প্রফুল্লিত হইবে। আপনার সম্মান ও ক্ষমতা শতগুণে বৃদ্ধি হউক, শত শত বিদেশীয় রাজা আপনার পদানত হউন, আপনার দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বহুল প্রচার হউক, ও সমস্ত পার্শ্ববর্ত্তী সহযোগী রাজন্য বিপদে সম্পদে আপনার উপদেশ গ্রহণে ব্যগ্র হউন। আপনি টমাস্ রোকে

উপযুক্ত রূপেই নির্ব্বাচিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন—ইহার ব্যবহারে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি—আপনার শ্রদ্ধা ও প্রণয়চিহ্ন স্বরূপ উপহার দ্রব্য গুলি বড়ই সুন্দর—আমি তাহা দেখিতে সর্ব্বদাই বাসনা করি।”

আমরা টমাস রোর কথিত ও দৃষ্ট সমস্ত ঘটনা এস্থলে বিবৃত করিলাম না। তাহা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সুতরাং সারগুলি এইস্থলে গ্রথিত হইয়াছে।

তেত্রিশকোটি দেবতা।

জগৎ এবং জগদীশ্বর এই দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ, এ বিষয়ে মনুষ্য মধ্যে প্রধানত দুইটি মত আছে। একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং সেই জন্য জগদীশ্বর হইতে পৃথক। মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ানের এই মত। আর একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নয়, জগদীশ্বরের রূপ, বিকার, বা বিকাশ মাত্র, অতএব জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ নয়। হিন্দুর এই মত। হিন্দু যে সৃষ্টির কথা একেবারেই মানেন না এমন নয় এবং খৃষ্টীয়ান যে জগদীশ্বরকে জগৎ বলিয়া বুঝেন না তাও নয়। হিন্দু যখন বলেন—‘সকলই তিনি করিয়াছেন’—তখন তিনি জগদীশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন বৈ কি; এবং খৃষ্টীয়ান যখন বলেন—‘In Him we live and move and have our being’—তখন তিনি জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া ভাবেন বৈ কি। ফল কথা, জগদীশ্বর সম্বন্ধে সকলেই সকল কথা মানিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন। জগদীশ্বর যথার্থই এমনি সর্ব্বময়, এমনি সর্ব্বরূপ, এমনি সর্ব্বস্ব যে তাঁহাকে সকল সংজ্ঞাই অর্পণ করা যায় এবং সকল রকমেই ভাবা যায়। তথাচ এক একটি জাতি বা সম্প্রদায় জগদীশ্বর সম্বন্ধে এক একটি ভাব বা প্রণালীকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি যে হিন্দু প্রধানত জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না, খৃষ্টীয়ান করেন। কোন্ মতটি ভাল কোন্‌টি মন্দ, তাহা এস্থলে মীমাংসা করা যাইতে পারে না এবং মীমাংসা করিবার বড় আবশ্যকও নাই। এখানে কেবল ইহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে, মত দ্বয়ের বিভিন্নতার সহিত পৌত্তলিক-

তার কি সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ বেশ পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। যিনি জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করেন না জগৎ তাঁহার কাছে নীচ বা অধম জিনিস নয় এবং কাজেই তিনি জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাকে অপকর্ম্ম মনে করেন না। তাই হিন্দুর কাছে পৌত্তলিকতা দোষশূন্য। এ কথা যিনি বুঝেন, হিন্দু জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তিনি কখনই হিন্দুকে নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন, জগৎ তাঁহার পক্ষে অধম জিনিস বলিয়া বোধ হওয়া সম্ভব এবং সেই জন্য তিনি জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাকে দুষ্কর্ম্ম মনে করেন। তাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকে পৌত্তলিকতা প্রকৃত পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলে ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাই ইউরোপ মনে করে যে নিকৃষ্ট জড়েরদ্বারা উৎকৃষ্ট জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অতি গর্হিত কার্য্য। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয় যেন এ সংস্কার বড় ভাল নয়। জগদীশ্বরের সহিত কিছুরই তুলনা হয় না, অতএব জগতেরও তাঁহার সহিত তুলনা হয় না। সেইজন্য হিন্দুও জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়া বুঝিয়াও উহা জগদীশ্বরের ক্ষণিক মায়াজ্ঞানে অতি অসার বলিয়া জগন্মুক্ত হইতে কামনা করেন। কিন্তু জগৎ সৃষ্ট পদার্থ বশত স্রষ্টা জগদীশ্বরের সহিত তাহার তুলনা হয় না বলিয়া জগৎ যে অধম জিনিস এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? ম্যাকবেথ সেক্ষপীয়রের সৃষ্টি, কুমার কালিদাসের সৃষ্টি। তাই বলিয়া সেক্ষপীয়র এবং কালিদাসকে উৎকৃষ্ট পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া ম্যাকবেথ এবং কুমারকে কি অপকৃষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে? তা যদি না হয় তবে জগৎ সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া কেন অপকৃষ্ট হইবে? এবং জগৎ যদি অপকৃষ্ট না হয় তবে জগতের দ্বারা জগদীশ্বর কেনই না প্রকাশিত বা বিজ্ঞাপিত হইবেন? জগদীশ্বরের সহিত তুলনায় জগৎ অতি ক্ষুদ্র জিনিস বটে; জগদীশ্বর এই জগতের মতন কোটি কোটি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্র বা সামান্য বলিয়া জগৎ কি জন্য জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বা অযোগ্য হইবে? আমরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারি, এমন একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নামিয়া দেখ দেখি। সেক্ষপীয়র ৩৭ খানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় যে মনে করিলে তিনি আরো ৩৭ খানি নাটক লিখিতে পারিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার মানসিক শক্তি এবং প্রতিভার পরিমাণ বুঝিয়া লও। কিন্তু সেক্ষপীয়র এতগুলি নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া বা আরো এতগুলি লিখিতে

ক্ষম ছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন এক খানি নাটক—ম্যাকেবেথ বা হ্যামলেট বা ওথেলো—কি তাঁহার পরিচয় প্রদানে অযোগ্য? তাঁহার এক খানি নাটক তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বলিয়া এক খানি নাটক তাঁহার যতটুকু পরিচয় প্রদান করিতে পারে, ততটুকু পরিচয় প্রদান করিতেও কি অযোগ্য? শক্তিপ্রসূত পদার্থ শক্তি অপেক্ষা কি এতই নিকৃষ্ট জিনিস যে সে শক্তির পরিচয় দিতে একেবারেই অযোগ্য? যদি তাহাই হয়, তবে মানুষ কেমন করিয়া মানুষের কার্য্য বা কীর্ত্তিকে মানুষের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে? কেমন করিয়া রণলব্ধ তরবারি বা পতাকা রণজয়ীর প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শিত হয়? কেমন করিয়া মহাকবির স্মরণার্থ মহোৎসবে মহাকবির মহাকাব্য তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত, পূজিত এবং প্রদর্শিত হয়? কথায় বলে 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।' কীর্ত্তিতেই মানুষ জীবিত। এখন বল দেখি, মানুষের সৃষ্ট পদার্থ যদি সৃষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট এবং মানুষের পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য না হয়, তবে জগদীশ্বরের সৃষ্ট জগৎ সৃষ্ট বলিয়া কেন অপকৃষ্ট হইবে এবং জগদীশ্বরের পরিচয়ার্থ ব্যবহৃত হইবার কেন অযোগ্য হইবে? অতএব জড় সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া অতি অপকৃষ্ট এবং সেই জন্য জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা মহাপাপ বা অপকর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপের এই সংস্কার নিতান্তই ভ্রান্ত। এবং যে সকল এ দেশীয় লোক এই ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা আপনাদিগকে সংস্কৃত মনে করিয়া এ দেশের পৌত্তলিকতাকে মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরো ভ্রান্ত। কেন না তাঁহারা আপনাদের সত্যকে ভ্রান্তি বলিয়া পরিত্যাগ করত অপরের ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া সম্মান করিতেছেন।

অতএব হিন্দুর ন্যায় জড়জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়াই ভাব বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় জড়জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক বলিয়াই ভাব, কোন প্রণালীতেই জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নিম্মাণ দূষণীয় নয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে—জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ যদি প্রসিদ্ধ কাজই হইল, তবে তাঁহার কিরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন নয়। মানুষের সম্বন্ধে জগতেই জগদীশ্বরের বিকাশ। জগৎ না থাকিলে মানুষের জগদীশ্বরও থাকেন না। অতএব জগদীশ্বর কি, বুঝিতে হইলে জগৎ বুঝিতে হইবে।

খৃষ্টধর্ম্মে জগদীশ্বরের স্বরূপ গ্রন্থে নির্ণীত আছে। তথাপি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা জগতে জগদীশ্বরের অন্বেষণ অবৈধ কাজ মনে করেন না এবং তাই Natural Theology তাঁহাদিগের মধ্যে একটি অমূল্য এবং উৎকৃষ্ট শাস্ত্র বলিয়া গণ্য। ফল কথা, জগৎ দেখিয়াই জগদীশ্বরের রূপ বল, গুণ বল সকলই নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ জগতের রূপই জগদীশ্বরের রূপ, জগতের গুণই জগদীশ্বরের গুণ। কিন্তু বল দেখি জগতের রূপ কি? জগতের গুণ কি? জগতের কি একটি রূপ? কেমন করিয়া তা হবে? বল দেখি একটি প্রজাপতির কয়টি রূপ? প্রজাপতি প্রথমে এক রকম, তার পর আর এক রকম, তার পর আর এক রকম—প্রাতে এক রকম, মধ্যাহ্নে আর এক রকম, অপরাহ্ণে আর এক রকম—অন্ধকারে এক রকম, আলোতে আর এক রকম—খেলাবার সময় এক রকম, খাইবার সময় আর এক রকম, আবার ক্ষুধার্ত্ত পক্ষী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যখন তাহার ঠোঁঠের ভিতর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে তখন আর এক রকম। অতএব যদি প্রজাপতির মূর্ত্তি বুঝিতে হয় তবে কতগুলি মূর্ত্তি দেখিতে ও বুঝিতে হইবে! বল দেখি একটি মানুষের মূর্ত্তি বুঝিতে হইলে কতগুলি মূর্ত্তি দেখিতে হইবে? মানুষ শৈশবে এক রকম, বাল্যে আর এক রকম, যৌবনে আর এক রকম, প্রৌঢ়াবস্থায় আর এক রকম, বার্দ্ধক্যে আর এক রকম, মৃত্যুকালে আর এক রকম। মানুষের রাগে এক রূপ, শোকে আর এক রূপ, ঘৃণায় আর এক রূপ, ঈর্ষায় আর এক রূপ, স্নেহে আর এক রূপ, আরো কত অবস্থায় আরো কত রকম রূপ। অতএব একটি মানুষ বুঝিতে হইলে কতই মূর্ত্তি দেখিতে হইবে, কতই মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে! বল দেখি. একখানি মেঘের, একটি নদীর কয়টি রূপ? কয়টি, তা কি ঠিক করিয়া বলা যায়? তবে অনন্ত জগতে অনন্ত জগদীশ্বরের কয়টি রূপ কেমন করিয়া বলা যাইবে? অনন্ত জগতে অনন্ত জগদীশ্বরের কয়টি গুণ কেমন করিয়া বলা যাইবে? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত রূপ তাহা কে নির্ণয় করিবে? প্রাতে এক রূপ, মধ্যাহ্নে আর এক রূপ, রাত্রে আর এক রূপ—সমুদ্রে এক রূপ, পর্ব্বতে আর এক রূপ, মরুভূমিতে আর এক রূপ—স্থির বায়ুতে এক রূপ, ঝড়ে আর এক রূপ, ঝঞ্ঝাবাতে আর এক রূপ—অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ। পৃথিবী যখন জলময় ছিল তখন তাহার এক রূপ, যখন অরণ্যময় তখন আর এক রূপ, যখন হিমময় তখন আর এক রূপ, যখন ভীষণ অসীমকায় ম্যামথ ম্যাস্তদনে পরিপূর্ণ তখন আর এক রূপ, যখন বিকটদর্শন

বিষমায়তন সরীসৃপে পরিবৃত তখন আর এক রূপ, যখন মানবপূর্ণ তখন আর এক রূপ—অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ। আর রূপ ভেদে গুণ ভেদ এবং গুণ ভেদে রূপ ভেদ হয় বলিয়া পৃথিবীর অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গুণ অশেষ, অনন্ত, অগণ্য। অতএব জগতে জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ দুইই অশেষ, অনন্ত, অগণ্য। জগতের জগদীশ্বর যথার্থই দয়ালু, নিষ্ঠুর, সুন্দর, ভীষণ, উগ্র, শান্ত, উৎকট, কমনীয়—সর্ব্বরূপ সম্পন্ন, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন। তাই সূক্ষ্মদর্শী হিন্দু জগদীশ্বরকে নির্গুণ এবং নিরাকার বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। যাঁহার রূপ বা আকার সর্ব্ব রকম, অর্থাৎ যাঁহার রূপের বা আকারের স্থির নির্দ্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নিরাকার; এবং যাঁহার সকল গুণই আছে, অর্থাৎ যাঁহার গুণের স্থির নির্দ্দেশ হয় না তিনি প্রকৃত পক্ষে নির্গুণ।

জগতের জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ যখন অসংখ্য হইতেছে, তখন জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে অসীমকে সসীম করা হইবে, অনন্তকে সান্ত করা হইবে, এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তি খর্ব্ব এবং অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। অতএব প্রকৃত পৌত্তলিকতায় জগদীশ্বর অসংখ্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত—অনন্ত পুরুষ অনন্ত আকার বিশিষ্ট। তাই হিন্দুর ব্রহ্মারূপ, বিষ্ণুরূপ, রুদ্ররূপ, গণেশরূপ, কৃষ্ণরূপ, বরাহরূপ, কূর্ম্মরূপ, মৎস্যরূপ, কালীরূপ, জগদ্ধাত্রীরূপ, তারারূপ, ছিন্নমস্তারূপ—অনন্ত অগণ্য রূপ। তাই হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা মানুষের দেবতা-জ্ঞান পূর্ণ না হইলে, অনন্ত পুরুষ কাহাকে বলে মানুষ তাহা প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা হয় না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার অর্থ এই যে পৃথিবীর অসংখ্য মনুষ্য জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুর মনে অনন্ত পুরুষের অনন্তত্ব প্রকৃষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—সে অনন্তত্ব আর কাহারো মনে প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি হয় নাই। হিন্দুর মন যেমন পূর্ণায়তন তেমন পূর্ণায়তন মন পৃথিবীতে আর কেহ কখন পায় নাই। আর হিন্দুর মনের উপলব্ধি শক্তি (power of comprehensive realisation) যেমন পূর্ণায়তন, তেমন পূর্ণায়তন উপলব্ধি শক্তি আর কাহারো মনে কখন লক্ষিত হয় নাই।

তেত্রিশ কোটি দেবতা একটি অমোঘ অমূল্য সত্য, তেত্রিশ কোটি দেবতা অত্যুৎকৃষ্ট মানব প্রকৃতির অনিবার্য্য ফল। যেখানেই মানুষ অনন্ত

জগদীশ্বরের অনন্তত্ব বুঝিয়াছে সেইখানেই মানুষ অসংখ্য জগদীশ্বর, কোটি কোটি দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ কথার একটি চমৎকার প্রমাণ আছে। খৃষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর এক এবং সে ঈশ্বর একটি নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন। সে প্রকৃতি বাইবলে কসামাজা, সীমানা-সহর্দ্দ বিশিষ্ট। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে সেই সীমানাসহর্দ্দ বিশিষ্ট এক ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দেয় না। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র এক, মানবপ্রকৃতি আর। ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কীর্ণ হইলে মানবপ্রকৃতি তাহাতে আবদ্ধ থাকিবে কেন? খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিল, সৃষ্টি-কর্ত্তা বই সৃষ্টপদার্থের কাছে পূজার্থ প্রণত হইও না। কোল্‌রিজ উচ্চ মণ্ট-ব্লাঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইলেন।

> 'Thou too again, stupendous Mountain ! thou
> That as I raise my head, awhile bow'd low
> In adoration, upward from thy base. *"

খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিল জগতের একমাত্র দেবতা এবং সে দেবতা জগৎ হইতে পৃথক, জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষ সে কথা মানিলেন না। তিনি সেই উচ্চ দেবতাকে নীচে নামাইলেন, সেই এক দেবতাকে অসংখ্য করিয়া তুলিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সাহিত্য দেখ। কোল্‌রিজ একটি কাব্যে † বলিতেছেন—

> "O what a goodly scene ; Here the bleak Mount,
> The bare bleak mountain speckled thin with sheep ;
> Grey clouds, that shadowing spot the sunny fields ;
> And River, now with bushy rocks o'erbrow'd,
> Now winding bright and full, with naked banks ;
> And Seats, and Lawns, the Abbey, and the Wood,
> And Cots, and Hamlets, and faint City-spire :
> The Channel there, the Islands and white Sails,
> Dim Coasts, and cloud-like Hills, and shoreless Ocean—
> It seem'd like Omnipresence ! God, methought,
> Had built him there a Temple ; the whole world
> Seem'd imaged in its vast circumference."

---

* Hymn before Sun-rise in the Vale of Chamouny নামক কাব্য দেখ।

† Reflections on having left a Place of Retirement নামক কাব্য দেখ।

উচ্চ স্বর্গের ঈশ্বর নিম্নে পৃথিবীতে নামিলেন! যে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে পৃথক্ এবং সেইজন্য পৃথিবী অপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ, সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন— যে জড়ের দ্বারা মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে তিনি খৃষ্টীয়ানের মতে অপমানিত হন, সেই জড়-নির্ম্মিত পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া তাঁহার একত্ব পরিত্যাগ করিয়া বহুত্ব প্রাপ্ত হইলেন:—

———"Fair the vernal Mead,
Fair the high Grove, the Sea, the Sun, the Stars,
True Impress each of their creating Sire! *"

স্বর্গের এক ঈশ্বর পৃথিবীতে নামিলেন। নামিয়া শুধু অসংখ্য হইলেন তা নয়। তখন সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বর হইল, পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর হইল:—

————"Early had he learned
To reverence the volume that displays
The mystery, the life which cannot die;
But in the mountains did he *feel* his faith.
All things, responsive to the writing, † there
Breathed immortality, revolving life,
And greatness still revolving; infinite:
There littleness was not; the least of things
Seemed infinite; and there his spirit shaped
Her prospects, nor did he believe,—he *saw*." ‡

পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থই ঈশ্বর—অসীম, অনন্ত। আবার পৃথিবীতে নামিয়া ঈশ্বর শুধু সংখ্যায় অসংখ্য নন। পৃথিবীতে তাঁহার রূপও অসীম। বাইরণ সমুদ্র দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাহাতে ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পাইলেন। আহা! কতই রূপ!—

"Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,—
Calm or convulsed, in breeze, or gale, or storm,
Icing the pole, or in the torrid clime

---

* Coleridge-এর Religious Musings নামক কবিতা দেখ।

† সাংখ্য দর্শনে বেদের দোহাই যেমন, এখানে বাইবলের দোহাইও তেমনি।

‡ Wordsworth এর Excursion নামক কাব্যের প্রথম সর্গ দেখ।

Dark-heaving—boundless, endless, and sublime,
The image of eternity, the throne
Of the Invisible."

আর কত উদাহরণ দিব? ইংরাজি সাহিত্যজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে ইংরাজ কবির বাহ্য জগৎ বর্ণনা জগদীশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ থাকে, ইংরাজ কবি বাহ্য জগতের প্রত্যেক পদার্থে জগদীশ্বর দেখিয়া থাকেন—প্রত্যেক পদার্থে জগদীশ্বর খুঁজিয়া থাকেন, ইংরাজ কবির দেবতা একটি নয়, দেবতা তেত্রিশ কোটি। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে একটি বই দেবতা দেয় না বলিয়া, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কাব্যে কোটি কোটি দেবতার সৃষ্টি করেন। যে ধর্ম্ম মানুষকে কোটি কোটি দেবতা দেয় সে ধর্ম্মের সেবক বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখে না, ঈশ্বর খোঁজে না, কাব্যে কোটি কোটি দেবতা সৃষ্টি করে না। হিন্দুর ন্যায় ঈশ্বরপ্রিয়, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরোন্মত্ত জাতি আর কখনও কোথাও হয় নাই। কিন্তু হিন্দুর সাহিত্য দেখ—কোথাও দেখিবে না হিন্দু কবি ইউরোপীয় কবির ন্যায় বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখিতেছে, ঈশ্বর খুঁজিতেছে, কোটি কোটি ঈশ্বর পূজিতেছে। হিন্দু কবি বাহ্য জগৎ বর্ণনা করিতে বড়ই ভাল বাসেন এবং তিনি যেমন বাহ্য জগৎ বর্ণনা করিয়াছেন তেমন আর কেহ কোথাও করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার বাহ্য জগৎ বর্ণনায় ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি শ্রীহর্ষ, ভারবি সকলেই বাহ্য জগৎ লইয়া উন্মত্ত, বাহ্য জগতের মোহে মুগ্ধ, বাহ্য জগতের প্রাণে গাঢ় প্রবিষ্ট। সকলেই বাহ্য জগতকে যত রকমে দেখিতে হয় তত রকমে দেখিয়াছেন, যত রকমে বুঝিতে হয় তত রকমে বুঝিয়াছেন। সকলেই বাহ্য জগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জীবন, মন,, প্রাণ, হৃদয়, আত্মা, সকলই দেখিয়াছেন। কিন্তু কেহই বাহ্য জগতে ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর খোঁজেন নাই, কোটি কোটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকলেই বাহ্য জগতের বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম পদার্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই কিছুতে ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর খোঁজেন নাই, কোটি কোটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকল পদার্থের কথা এখন বলিতে পারিব না—বলিবার স্থান নাই। কেবল দুইটী পদার্থের কথা বলিব। জগতের পর্ব্বত এবং সমুদ্র দেখিলে জগদীশ্বরের কথা যেমন মনে পড়ে, আর কিছু দেখিলে সে কথা তেমন মনে পড়ে না। ইউরোপে মহাকবি

বাইরণ সমুদ্রে জগদীশ্বরের কি পরিষ্কার এবং অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই দেখিলেন! কিন্তু ভারতে কবিগুরু বাল্মীকি সমুদ্রে জগদীশ্বরের চিহ্নমাত্রও দেখিলেন না। অগাধ অসীম সমুদ্র দেখিয়া তাঁহার মনে ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বর-ভক্তি উথলিয়া উঠিল না। রাম বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়াছেন—

সা মহার্ণবমাসাদ্য হৃষ্টা বানরবাহিনী।
বায়ুবেগসমাধূতং পশ্যমানা মহার্ণবম্॥
দূরপারমসম্বাধং রক্ষোগণনিষেবিতম্।
পশ্যন্তো বরুণাবাসং নিষেদুর্হরিযূথপাঃ॥
চণ্ডনক্রগ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে।
হসন্তমিব ফেনৌঘৈর্নৃত্যন্তমিব চোর্ম্মিভিঃ॥
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভূতং প্রতিচন্দ্রসমাকুলম্।
চণ্ডানিল মহাগ্রাহৈঃ কীর্ণন্তিমিতিমিঙ্গিলৈঃ॥
দীপ্তভোগৈরিবাকীর্ণং ভুজঙ্গৈর্বরুণালয়ম্।
অবগাঢ়ং মহাসত্ত্বৈর্নানাশৈলসমাকুলম্॥
সুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমসুরালয়ম্।
মকরৈর্নাগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ॥
উৎপেতুশ্চ নিপেতুশ্চ প্রহৃষ্টা জলরাশয়ঃ।
অগ্নিচূর্ণমিবাবিদ্ধং ভাস্বরাম্বুমহোরগম্॥
সুরারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদা।
সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্॥
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্ব্বিশেষমদৃশ্যত।
সম্পৃক্তং নভসাপ্যম্ভঃ সম্পৃক্তঞ্চ নভোঽম্ভসা॥
তাদৃগ্রূপে স্ম দৃশ্যেতে তারারত্নসমাকুলে।
সমুৎপতিতমেঘস্য বীচিমালাকুলস্য চ॥
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরস্যাম্বরস্য চ।
অন্যোঽন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ সম্বনুর্ভীমনিঃস্বনাঃ॥
ঊর্ম্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভের্য্যইবাম্বরে।
রত্নৌঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বায়ুনা॥
উৎপতন্তমিব ক্রুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্।
দদৃশুস্তে মহাত্মানো বাতাহতজলাশয়ম্॥
অনিলোদ্ধূতমাকাশে প্রলপন্তমিবোর্ম্মিভিঃ॥ (যুদ্ধ কাণ্ড,৪র্থ সর্গ।

"উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিকে অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীর দর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তু সকল প্রচণ্ড বেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়, সাগরবক্ষ যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীমরব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

(হেমচন্দ্রের অনুবাদ)

জর্ম্মনির ফ্রেদরিকা ব্রুণ, ইংলণ্ডের কোল্‌রিজ ক্ষুদ্র মণ্ট্‌ব্লঙ্ক শৃঙ্গে জগদীশ্বর দেখিয়া নতশিরে তাঁহার স্তুতি গান করিলেন। ভারতের কালিদাস গিরিশ্রেষ্ঠ হিমাচল দেখিয়াও একবার জগদীশ্বরের নামও করিলেন না। কুমারে হিমালয় বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ, অতএব এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন সে বর্ণনা অতুল কবিত্বে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরমোহের চিহ্ন মাত্র নাই। সংস্কৃত কবির সকল জগদ্বর্ণনাই এইরূপ। তাহাতে সবই আছে, কেবল ঈশ্বর নাই। সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রই এ কথা জানেন।

এ আশ্চর্য্য প্রভেদ কেন হয়? এ আশ্চর্য্য প্রভেদের অর্থ কি? হিন্দু কি ইউরোপবাসীর অপেক্ষা কম ঈশ্বরপ্রিয়? এবং সেইজন্যই কি হিন্দুর জগদ্বর্ণনায় ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায় না? তাহা ত নয়। হিন্দু যে ইউরোপবাসী অপেক্ষা শতগুণে ঈশ্বরপ্রিয়। তবে এ আশ্চর্য্য প্রভেদের অর্থ

কি? ইহার অর্থ এই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপবাসীর ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত পুরুষকে নির্দ্দিষ্ট সীমানা-সরহদ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাসীর হৃদয়-স্থিত অনন্তের-ভাব চাপিয়া রাখে বলিয়া এবং ইউরোপবাসীর ঈশ্বর-পিপাসা মিটায় না বলিয়া ইউরোপবাসী বাহ্য জগতে, প্রত্যেক বাহ্য পদার্থে—সমুদ্রে, সরোবরে, প্রস্তরে, পর্ব্বতে, গাছে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে—ঈশ্বর খোঁজেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর পূজা করেন। আর হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্তপুরুষকে অসংখ্য মূর্ত্তিতে দেখাইয়া হিন্দুর হৃদয়স্থিত অনন্তের-ভাব ভরাইয়া তুলে বলিয়া এবং হিন্দুর ঈশ্বর-পিপাসা মিটাইয়া দেয় বলিয়া হিন্দুর বাহ্য জগতে—সমুদ্রে, সরোবরে, প্রস্তরে, পর্ব্বতে, গাছে, পাতায়, লতায় ফলে, ফুলে,—ঈশ্বর খুঁজিবার, ঈশ্বর দেখিবার, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিবার, ঈশ্বর পূজা করিবার প্রয়োজন হয় না। ইউরোপীয় কবির জগদ্বর্ণনা এবং হিন্দু কবির জগদ্বর্ণনার মধ্যে যে আশ্চর্য্য প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে মানুষ ধর্ম্মশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা না পাইলে, কাব্যে তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি করে। সে কথার অর্থ এই যে, যেমন করিয়াই হউক মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা না হইলে চলে না। মানুষ এক অনন্ত পুরুষ ধারণা করিতে পারে না। তাই এক অনন্ত পুরুষকে কোটি কোটি পুরুষে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পুরুষের অনন্তত্ব উপলব্ধি করে। একে অনন্ত—এ বড় বিষম ধারণা, এক অনন্তেরই আয়ত্তাধীন। অনেকে অনন্ত অথবা অনন্তে অনন্ত—এ কিছু সহজ ধারণা, মানুষের আয়ত্তাধীন। মানুষ সংখ্যার দ্বারাই পরিমাণ বুঝিয়া থাকে। দুইখানি সমতেজ-সম্পন্ন বাষ্পীয় যন্ত্রের মধ্যে যদি একখানি অল্প সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়, আর একখানি অধিক সংখ্যক গাড়ি টানিয়া লইয়া যায় তবে প্রথমোক্ত খানিকে দ্বিতীয়োক্তাপেক্ষা কমতেজসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। সেক্ষপীয়র যদি দুই খানি মাত্র নাটক লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে এত বড় মনে হইত না। পৃথিবীতে অনেক পদার্থ, আকাশে অনেক নক্ষত্র না থাকিলে মানুষের মনে অনন্তের ভাব উদয় হইত কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন জগৎ অনেক না হইলে, জগতে অনেক না থাকিলে মানুষের মনে অনন্তের ভাব উঠিত না। সেই অনেকে-অনন্তের, সেই অনন্তে-অনন্তের নামই তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাই হিন্দুর পৌত্তলিকতায় তেত্রিশ কোটি দেবতা। মনে করিও না, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা তেত্রিশ কোটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা—সকলে

সেই এক অনন্তপুরুষ নয়। যে হিন্দু প্রত্যেক দেবতাকে বলেন—'তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই মহেশ্বর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধ্যা, ইত্যাদি—সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেক দেবতাই সেই এক অনাদি অনন্ত জগদীশ্বর।

অতএব প্রকৃত পৌত্তলিকতায় অনন্ত পুরুষের এক মূর্ত্তি নয়, দুই মূর্ত্তি নয়, দশ মূর্ত্তি নয়—কোটি কোটি মূর্ত্তি, তেত্রিশ কোটি মূর্ত্তি গড়িতে হয়। অতএব, আইস, তেত্রিশ কোটি দেবমূর্ত্তি গড়িয়া অনন্তের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া আবার সেই অপূর্ব্ব হিন্দু নামের অধিকারী হই।

জগদীশ্বরের জগৎ দেখিয়া তাঁহার তেত্রিশ কোটি মূর্ত্তি গড়িলে অনেকগুলি মূর্ত্তি যে ভীষণ, অনেকগুলি যে বিকট, অনেকগুলি যে উগ্র হইবে? হইলই বা। তাহাতে ক্ষতি কি? দোষ কি? তুমি বলিবে, জগদীশ্বর যে প্রেমময়, অতএব কেবল শান্ত এবং সুন্দর, তাঁহাকে ভীষণ বা বিকটদর্শন করা বড়ই গর্হিত কার্য্য হইবে। আমি বলি, তিনি প্রেমময় বটে, কিন্তু আমি যে তাঁহাকে অনেক সময় ভীষণ দেখি। প্রেমময়কে ভীষণমূর্ত্তি দেখিলে আমার মন যে এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আমি কি সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিয়া আমার ঈশ্বর-পিপাসা মিটাইব না? প্রেম কি শুধুই হাসায়, প্রেম কি ভয় দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভয় দেখান? আচ্ছা বল দেখি, সে কুঞ্চিত ভ্রূ কি কেবলই ভীষণ, সুন্দর নয়? আহা! সে কুঞ্চিত ভ্রূ বড়ই সুন্দর, কেন না বড়ই স্নেহে সে ভ্রূ কুঞ্চিত। জগদীশ্বরও তাই। তিনি প্রেমে ভীষণ; কেন তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিব না? প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই সুন্দর নয়? আর যদি তাঁহাকে সকল সময়ে প্রেমময় বলিয়া নাই বুঝিতে পারি, যদি তাঁহাকে কখনও কেবল ভীষণ বলিয়াই বুঝি, তাহা হইলে কেনই না তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিব? তিনি যদি আমাদের আদরের সামগ্রী হন, তবে তাঁহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিলেও কি আমাদের আনন্দ হইবে না? স্নেহের এবং আদরের জিনিসের গুণ ভাবিতে যত সুখ হয়, দোষ ভাবিতে যে তদপেক্ষা বেশী সুখ হয়। জান না কি মানুষ আপন আপন পিতা পিতামহের বিষম রাগের কথা বা অহঙ্কারের কথা কহিতে কত ভাল বাসে? আর ভীষণ ভাবিয়া তাঁহাকে না ভজিলেই বা তাঁহার ধ্যান সম্পূর্ণ হইবে কেন? অনন্তত্ব এবং ভীষণত্ব যে একই জিনিস। অতএব তাঁহার যে মূর্ত্তি তুমি বুঝিতে পার না সে মূর্ত্তি বা

দিয়া তাঁহাকে দেখিলে তোমার দেখা ত পূর্ণ দেখা হইবে না। আর পূর্ণ দেখা না হইলে দেখিয়া সুখ কি?

আরো এক কথা। এমন হইতে পারে যে তুমি পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় দেখিতেছ। অতএব জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দরই মনে কর এবং সুন্দর দেখিতেই ভালবাস। তুমি আজিকার পৃথিবীতে বাস করিতেছ বলিয়া এইরূপ ভাবিতে পারিতেছ। আজিকার পৃথিবীতে মানুষ সর্ব্বপ্রধান—স্বয়ং প্রকৃতিই অনেকাংশে আজ মানুষের অধীন। মানুষ আজ পৃথিবীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত—মানুষের আজ অতুল সম্পদ। অতএব মানুষ আজ জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিবে ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে যখন পৃথিবী অরণ্যময় ছিল, অরণ্য বৃহদাকার হিংস্র পশুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্য বস্ত্রহীন, অস্ত্রহীন, আবাসহীন, সংখ্যায় দুই চারিটি, তখনও কি মানুষ পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় এবং পৃথিবীর পতি জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিয়াছিল? তখন কি মানুষ জগদীশ্বরকে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, ভীষণ দেখে নাই? আর জগদীশ্বরের সে মূর্ত্তি কি আমাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে না? মনুষ্য জাতির জাতীয়-জীবনের শৈশবে জগদীশ্বরের যে মূর্ত্তি ছিল সে মূর্ত্তি ভুলিলে, সে মূর্ত্তি ছাড়িলে, মনুষ্য জাতির-জাতীয় জগদীশ্বরের মূর্ত্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে? অথচ সেই জাতীয়-জগদীশ্বরের মূর্ত্তি অক্ষুণ্ণভাবে দেখিতে না পাইলে ত জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে পারা যায় না। যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন হিংস্র জন্তুর ভয়ে, অস্ত্রাভাবে, বস্ত্রাভাবে, গৃহাভাবে, খাদ্যাভাবে, অশেষ অভাবে যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছে সেই পৃথিবীতে মানুষ আজ রাজা, রাজসম্পদের অধিকারী। বল দেখি জগদীশ্বরের কি পৃথিবী কি হইয়া উঠিয়াছে, আবার যুগযুগান্তর পরে আরো কত চমৎকার হইয়া উঠিবে। জগতের এই অপরূপ ক্রমোন্নতি—নরকতুল্য অবস্থা হইতে স্বর্গতুল্য অবস্থায় পরিণতি—দেখিলে জগদীশ্বরের প্রেমের এবং সৌন্দর্য্যের যে ভাব মনে উদয় হয়, জগতের একটি মাত্র অবস্থা দেখিলে সে ভাব হৃদয়ে উদয় হয় না। ঐতিহাসিক জগদীশ্বরকে না দেখিলে, মানব জাতির জগদীশ্বরকে না দেখিলে, জগদীশ্বরের প্রেম মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্যের কিছুই দেখা হয় না, কিছুই বুঝা হয় না। তাই বলি জগদীশ্বরের কোন মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিও না। কেন না তাহা হইলে জগদীশ্বরকে দেখা হইবে

না। আর জগদীশ্বরকে না দেখিলে জগদীশ্বরের পূজা করিয়াও সুখ হইবে না। হিন্দু জগদীশ্বরের এত মূর্ত্তি দেখে বলিয়া জগদীশ্বরের পূজায় এত পাগল।

অতএব, আইস, জগদীশ্বরের সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া—নিষ্ঠুর, ভীষণ শান্ত, সুন্দর, প্রেমময়—তেত্রিশকোটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তেত্রিশকোটি দেবতাতে অনন্তের পূজা পূর্ণ করি। তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা হিন্দু বই আর কেহ কখনও করে নাই। অনন্তের অনন্তত্ব হিন্দু বই আর কেহ কখনও প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করে নাই। অনন্তের অনন্ত পূজার পত্তন হিন্দু বই আর কাহারও কর্ত্তৃক কোথাও স্থাপিত হয় নাই। পরশ্ব প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব ব্যঞ্জক একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছিলাম—তুষানল। কাল প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছি—ষোড়শোপচারে পূজা। আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ডত্ব ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম—তেত্রিশকোটী দেবতা। আইস, আমাদের আজিকার দুর্দ্দিনের তুষানলসম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা করিয়া আবার সেই প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ড নাম এবং প্রবল সম্পদ পুনঃ সঞ্চয় করি।

সুখ।

গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি যথা ভক্ত্যাদি অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সে গুলিও অধিক সম্প্রসারণের সক্ষম, সে গুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্য সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন, যে কামাদির অধিক স্ফূরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তিপ্রীতি দয়া,

এসকলের উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না, এইজন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক স্ফূরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতেই সহজেই বুঝা যায়, যে সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অনুশীলন সাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্ত্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি (Energy) (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান (object)। এখন, আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয়ই সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয়, যে যে বৃত্তি অনুশীলন সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলন সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সময় টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তি গুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি টুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকা নির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনুশীলনে নিয়োগ করিলে, অন্য বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় কিছু থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়ত স্বতঃস্ফূর্ত্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির

অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাসিনী মণ্ডলমধ্যবর্ত্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তিগুলি, শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষ পরম্পরাগত স্ফূর্ত্তি জন্যই হউক, বা জীব রক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অনুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফূর্ত্তির কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সে গুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু উপাদান বিরোধ হেতু, তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা—কিম্বা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব বৃত্তি গুলির এককালীন ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়?

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্ম্মের নহে, সন্ন্যাস ধর্ম্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম। ভগবান স্বয়ং কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কর্ম্মাত্মক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্ত্বের স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম, যে যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genius) কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী হইলেই তাহাকে প্রতিভা বলা যাইতে পারে। এখন প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন

করিব? কোন্ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, এইটি পিতল।

গুরু। আমি বলিয়াছি যে সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর সুখেরই উপাদান মনুষ্যত্ব। অতএব সুখই সেই কষ্টি পাতর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা। আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না সুখ কি তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টি পাতর কোন্‌টা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টি পাতর।

শিষ্য। এত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন আমি ছবি আঁকিতে পারি। কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের পরিমার্জ্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে সেই বৃত্তিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্ত্তব্য কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন "সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্র বিদ্যার অনুশীলন কর।" অর্থাৎ আমার তুলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে, যে ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ,—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা—কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য?

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্ম্মাচরণ ছেলে খেলা নহে। ধর্ম্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার কারণই তাই। ধর্ম্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াস-লভ্য, সাধনা অতি দুরূহ। দুরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী হওয়াই উচিত।

গুরু। ধর্ম্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, তা না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত, সখের জিনিস গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধর্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম্ম ঐশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্ম্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন সেইরূপই আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ্চ দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলি, সুখের উপায় ধর্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে? উহাও বৃত্তির স্ফূরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব্ব করিব, কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে, যে ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা—কিন্তু তদুত্তরে আমি যদি বলি যে ধ্বংস হয় হউক, আমি ইন্দ্রিয় সুখ বঞ্চিত হই কেন?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলি, তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছ। যাহা হউক তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সুখ? ভাল, তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না,—যদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে "আর ইহাতে সুখ নাই" বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোন রূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্ব্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ?

গুরু। আমরা মনে করি বটে এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই—যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয় পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,—দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে অগ্নি দগ্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দ্রিয় বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতে চায় না

গুরু। একে একে বাপু। আগে "ছাড়ে না" কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না এটি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে Dipsomania বলেন। ইহার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। "ছাড়িতে চায় না"—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে মদ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে একদিন মদ খায়, সেই আজিও বলে "মদ ছাড়িব কেন?" তাহার মদ্য পানের আকাঙ্ক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই।

এ সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকাল মৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এ জন্য লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকট একজন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে দুষ্পচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই, তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সম্বরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। এখন বুঝিয়াছি কি?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সব টুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক?

গুরু। প্রথমত, সমগ্র জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর

কতক্ষণ? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে চাহি না। কেন না অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ব্বত্র বলবান্ হয় না। আজিকার দিনে বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম্ম বড় বলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংস-পূতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্লোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় যত পারি পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্ম্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম-ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্ম্মমূলক, ইহ-কালের দুঃখও কেবল অধর্ম্মমূলক। এখন, ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্ববাদী সম্মত, এবং পরকাল সর্ব্ববাদী সম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু "স্থায়ী সুখ কি?" যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয়, যে অনন্তকাল স্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি

তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকাল পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—এক জাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। যখন পরকাল স্বীকার করিলে তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী বৃত্তি নিচয় জনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে আমি স্বর্গ বলি, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলি। অন্য প্রকার স্বর্গ নরক আমি মানি না।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্ম্মব্যাখ্যায় বর্জ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না সুখের উপায় যদি ধর্ম্ম হইল, আর ইহকালের যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ধর্ম্ম নিত্য। ধর্ম্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান ধর্ম্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন—কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন?

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে সে সকল প্রমাণ গুলি

বিবাদের স্থল। প্রমাণ গুলিরত এমন কোন দোষ নাই, যে সে সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এইজন্য বলিতেছি, যে আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্ম্মাত্মা হও। তাহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব, যে এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি *। তুমি পরকাল যদি নাও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পর লোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা না মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্ম্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। এক্ষণে, আমরা স্থূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, যে ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহ জীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহ জীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির এক না একটি কারণে অবশ্য, অবশ্য, তাহার সে

* সকল কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতিভোগ জনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতি-তৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তি জনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এসকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সে গুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহ জীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মনে কর, দয়া বৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীব্র সুখ আছে, যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্ব্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঔদরিক দিবসে দুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণ কালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, ধার্ম্মিক (Christian) কেমন সুখে মরে!"

তার পর পরকালের কথা বলি, মান না মান সেটাও শুনিয়া রাখ। আমার বিশ্বাস যে পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং এ দয়াবৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। আমার বিশ্বাস আছে যে সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ-স্বপ্ন মাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্মমাত্র। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম; সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব?

গুরু। কথাটা কিছু নির্ব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম—কর্ম্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং। কর্ম্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্য। কোথাও আমরা দেখি নাই যে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য যে, সে কর্ম্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা।

পরলোকে (conditions of Existence) জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law of Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খৃষ্টীয়, বা ইস্‌লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ। যদি পরকাল থাকে, তবে

পরকাল আমার বর্ণনানুরূপ হওয়াই সম্ভব। আন্দাজি কথাটির দাম এই। বিশ্বাস কর, না কর, তোমার প্রবৃত্তি।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে, এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতিটা গিলিতে পারি, তবে হাতির কাণের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসন কর্ত্তৃত্ব কই?

গুরু। যাহারা (Tyrant of Heavens) স্বর্গের বজ্রধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসকতা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্য জীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্ম্মের যে স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জনষ্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, সে পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদ্বৃত্তিগুলি মার্জ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে স্বদ্বৃত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্বৃত্তিগুলি স্ফূরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। আমি এইরূপ স্বর্গ নরক মানি। কৃমি-কীট-সঙ্কুল বিষ্ঠামূত্রের হ্রদরূপ নরক, বা অপ্সরোকণ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত, উর্ব্বসী মেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুসুম-সুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের "বখামি" গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা

কহিলেও, কোন কোন সুখকে স্থায়ী, আর কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম, কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক?

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ, বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দ টুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন জনিত যে সুখ, তাহা স্থায়ী, আর কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন জনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ; (১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখ শূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা অবশ্য বুঝিয়াছ, যে এই বৃত্তি গুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখ শূন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ।

(১) স্থায়ী।

(২) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখ শূন্য।

(৩) ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখ শূন্য। আমি যখন বলিয়াছি, যে সুখের উপায় ধর্ম্ম, তখন এই অর্থেই সুখশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না যাহা বস্তুত দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহা ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতা বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,

"এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, এইটি পিতল?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্ত্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যে গুলির অনুশীলনে ক্ষণিক সুখ তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কেন না এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম দুঃখ, সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে—কেন না তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যে রূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টি পাতর।

বৈষ্ণব কবির গান।

মর্ত্ত্যের সীমানা।

এক স্থানে মর্ত্ত্যের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে দাঁড়াইলে মর্ত্ত্যের পর পার কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সঙ্কট স্থানে অবস্থিত, যে উহাকে মর্ত্ত্যের প্রান্ত বলিব, কি স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায় না—অর্থাৎ উাহাকে দুইই বলা যায়। সেই প্রান্তভূমি কোথায়! পৃথিবীর আপিসের কাজে শ্রান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু সেবন করিতে যাই।

স্বর্গের সামগ্রী।

স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্য্য কল্পনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ছাড়া এখানে মানুষ এমন আর কিছু দেখে নাই, যে তাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গের জিনিষ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে, সৌন্দর্য্যকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্য সুন্দর জিনিষ যখন ধ্বংশ হইয়া যায়, তখন কবিরা কল্পনা করেন—দেবতারা স্বর্গের

অভাব দুর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া গোঁজা মিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জন্য, অজ ও ইন্দুমতী সুরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত।

মিলন।

তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রান্তটিই যেন সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে চিরবিচ্ছেদ হইত। সৌন্দর্য্যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে—সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যই তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়।

স্বর্গের গান।

শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কাণের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।

মর্ত্ত্যের বাতায়ন।

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্যকে এত ভালবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য্য তাহা করে না—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দুর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহু তুলিয়া সূর্য্যকিরণে উড়িতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের

আরম্ভ কোথায়, তাহারই অন্বেষণে ঐ সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেঁকে না। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়।

সাড়া।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য।

যাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই। আর সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর কিছুই করে না। সৌন্দর্য্যের কি অসামান্য ধৈর্য্য! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভূত হইত। তাহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা দেখিত মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল। ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীরা আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্য্য খানি লইয়া ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল সৌন্দর্য্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্ব্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা মাত্রের পূজা করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্ম-বিসর্জ্জন, এই

মধুর সৌন্দর্য্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য হৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।

জ্ঞানদাসের গান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্ত্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস কহে হাসি হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী॥

বাঁশীর স্বর।

সৌন্দর্য্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন স্বর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী। কদম্ব ফুল তাঁহার বাঁশির স্বর, বসন্ত ঋতু তাঁহার বাঁশির স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশির স্বর। সে বাঁশির স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!" এই জন্য, আমাদের চরিদিকে যখন সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন-

কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চির বিরহে কাল কাটাই। কাণে একটি বাঁশির শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক্ না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

এই বাঁশির ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্য্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যের উত্তর প্রত্যুত্তর হয়।

বিপরীত।

আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে। তাঁহার বাঁশী লইয়া তাঁহাকেই ডাকে।

আজ্ কে গো মুরলী বাজায়!
এ ত কভু নহে শ্যামরায়,
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল,
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী,
নীল উয়লি নীলমণি॥

বিবাহ।

জগতের সৌন্দর্য্য অসীম সৌন্দর্য্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্য্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয়, তবে তিনি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন?

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্য্যের মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিবাহ নিবন্ধন।

নবজীবন।

১ম ভাগ। } অগ্রহায়ণ ১২৯১। { ৫ম সংখ্যা।

ব্রততত্ত্ব।

৩। নিয়ম।

জগৎ নিয়মাধীন। দিন রাত্রি অপ্রতিহত নিয়মে ফিরিতেছে; জল বায়ু অগ্নি আদি পদার্থের মধ্যে নিয়মের কখনই কোন ব্যত্যয় হয় না; এই সমস্ত পদার্থের পরমাণু সকল আবার আর এক প্রকার—যথা রাসায়নিক—নিয়মের বশবর্ত্তী। ফলত যে দিকে দেখ, মনুষ্য ব্যতীত, কোথাও স্বেচ্ছাচারিতার চিহ্ন মাত্রও পাইবে না। আমাদিগের দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্যক্ চালনা হয় নাই বটে; আমরা জলের শক্তি আয়ত্ত করিয়া কখন দমকল বা হাইড্রলিক প্রেস রচনা করিতে পারি নাই, বাষ্পের নিয়ম জানিয়া কখন কোন রথ বা পোত নির্ম্মাণ করিতে পারি নাই; এবং আলোক বা তড়িতের সাহায্যেও কখন কোন অমানুষিক চিত্রকর কি বার্ত্তাবহ নিযোগ করিতে পারি নাই। তথাচ এতদ্দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ উপলক্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলীভূত কথাটি চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। "কারণ" বলিতে "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা" ভিন্ন আর কিছুই গণ্য হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে উহা কেবল নিয়মেরই লক্ষণ এবং নিয়মের কারণ কি তাহা মনুষ্যের জ্ঞানাতীত। হিন্দুশাস্ত্র মতে কার্য্যকারণ সমস্তই নিয়মানুবর্ত্তী। এতদ্দেশে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য স্বীকৃত হয় বটে কিন্তু পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যের সহিত সে গুলির অনেক বিভেদ। আমাদিগের স্বীকৃত ঐশ্বর্য্য যতই

অনৈসর্গিক হউক তাহার বিন্দুমাত্রও নিয়ম বহির্ভূত নহে। স্বয়ং নারায়ণও নিয়মাধীন। শিহ্লন বলিতেছেন।—

নমস্যামো দেবান্ নন্থ হতবিধেস্তেপি বশগাঃ
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

দেবতাদিগকে নমস্কার! উঁহু! তাঁহারাও হতবিধির অধীন। তবে বিধিই বন্দনার পাত্র?—বিধাতাও কেবল কর্ম্মের নিয়মিত ফল প্রদান করিতে সক্ষম! ফল? উহাও কর্ম্মায়ত্ত! তবে অমরগণই কি আর বিধিই বা কি এত! আমি সেই কর্ম্মকেই নমস্কার করি, যাঁহার প্রভাব স্বয়ং বিধিও অতিক্রম করিতে অক্ষম!

অতএব হিন্দু হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি উপেক্ষা করা অবিধেয়। গ্রহচক্র সমভিব্যাহারে স্বয়ং বসুন্ধরা নিয়মাধীন। ভূতময় পদার্থ সমূহ এবং পদার্থের পরমাণুগুলিও তদনুরূপ, সকলেরই নিয়ম আছে। উদ্ভিদ এবং চেতন পদার্থ ঘটিত জীববিজ্ঞান, আবার আর এক শ্রেণীস্থ নিয়মের পরিচায়ক। ইহাতে এইমাত্র মতভেদ দেখা যায় যে কেহ কেহ—অর্থাৎ যোগ বা থিয়সফি বাদীরা—বলেন, মনুষ্যের জীবন স্বেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে। কিন্তু এ কথাটা এখন এক পাশে ফেলিলে বড় ক্ষতি হইবে না। এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি বস্তু নিয়মাধীন বলিয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল নিয়মাবলির ভেদ লক্ষ্য করিয়া এক এক শ্রেণীস্থ নিয়মের অধীন বস্তুগুলিরও বিভিন্নতা স্বীকৃত হয়। নতুবা বস্তুর বস্তুত্ব ও পার্থক্য লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। যে অভিনব আবিষ্কৃত নিয়মাবলির কথা বলিয়াছি তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং তৎসংসৃষ্ট পদার্থ—সমাজ এবং ব্যক্তি। আপাতত ব্যক্তি জীব হইতে পৃথক বোধ হয় না, আর সমাজ নামক পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মনে করাই কঠিন। কিন্তু এরূপ সন্দেহ এখন কেবল বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে মাত্র। এইসকল বিভিন্ন বিষয়ের পৃথক পৃথক নিয়ম সমস্তই অলঙ্ঘনীয়। এমন কি ঐ সকল নিয়ম আবিষ্কার ও সপ্রমাণিত করিবার নিয়মও জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। শেষোক্ত নিয়ম ত্রিবিধ,—যথা ঈক্ষণ (observation), পরীক্ষণ (experiment) এবং পর্য্যবেক্ষণ (comparison)। এই ত্রিবিধ প্রণালীতে যেসকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হয় তাহা সকলের পক্ষেই প্রামাণ্য। উহা ঈশ্বর প্রণীত কি না তাহার মীমাংসা করা দূরে থাকুক এরূপ আলোচনাই অপ্র-

সিদ্ধ হইয়াছে; কেন না কার্য্যের কারণ বলিলে ঈক্ষিত ঘটনা সমূহের মধ্যে নিয়ম মাত্র উপলক্ষিত হয়; সেই নিয়মের কারণ জানিবার উপায় ঈক্ষণাদি ত্রিবিধ ক্রিয়ার বহির্ভূত। ফলত ঈশ্বর বিষয়ক কোন স্বতন্ত্র জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারিলেও তদ্দ্বারা প্রাগুক্ত নিয়মের কিম্বা নিয়মিত ঘটনার রূপান্তর করিবার প্রত্যাশা কোন বিবেচক ব্যক্তিই করেন না।

নিয়ম কেমন অব্যর্থ তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্যক্ত করা গেল। কিন্তু নিয়ম মানিলেই যে অদৃষ্ট মানিতে হয় তাহা নহে। কিছুই মনুষ্যের স্বেচ্ছাধীন হইতে পারে না, কিন্তু স্বস্ব কার্য্যের উপরে স্বেচ্ছার যথেষ্টই স্থল আছে। কূপ হইতে জল আমার হাতে আসিবে না; কিন্তু আমি জল তুলিতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তুলিতে পারি। দড়ি দিয়া, কপিকল দিয়া এবং হাপিস করিয়া তুলিতে পারি। ফলত শিহ্লনের প্রমাণ পরিত্যাগ করিলেও বৈজ্ঞানিক এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ অনায়াসে উপলব্ধ হইবে। প্রথমত বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার ও সপ্রমাণ করিবার কোন নিয়ম নাই। আর স্বেচ্ছাচার বিবর্জ্জিত শক্তিকে ঐশী শক্তি বলিলে আর কোন ক্ষতি না হউক, সংজ্ঞা প্রয়োগের বিশৃঙ্খলা হয়। এ দিকে, জ্যোতিষের নিয়ম মানিলে স্বয়ং জগদীশ্বরকেই উপেক্ষা করিতে হয়। আর গ্রহগণের পূজাদ্বারা যদি কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে জ্যোতিষের অব্যর্থ নিয়ম স্বেচ্ছানুবর্ত্তী গ্রহগণের অনুপযোগী, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম কেবল মনুষ্য বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত; মনুষ্য ব্যতীত আর কেহ উক্ত নিয়মাবলী স্বীকার করিবে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। মনুষ্য উল্লিখিত ত্রিবিধ বিচার প্রণালী দ্বারা যেখানে অন্যথা সিদ্ধিশূন্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা দেখিতে পান, সেইখানেই নিয়ম অবধারিত করেন। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় জীব এবং এক শ্রেণীস্থ নিয়মের বশবর্ত্তী; সেই জন্যই এই সকল নিয়ম সর্ব্ববাদী সম্মত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্রে একবাক্যতা জন্মিবার আর কোন হেতু নাই। আর এই সকল নিয়ম যে মনুষ্য পরম্পরায় গ্রাহ্য হইয়া থাকে অথচ অন্য জীবের গ্রাহ্য এ কথা বলা যায় না, তাহার হেতু এই যে, মনুষ্যগণ ভাষা এবং দ্বিভাষীর সাহায্যে মনোগত অভিপ্রায় পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে ও অবগত হইতে সক্ষম; কিন্তু অন্যান্য জীবগণের সহিত এতাদৃশ সম্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে মনুষ্য মাত্রেই এক বুদ্ধি ও এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট; আর সেই বুদ্ধি ও ধর্ম্মানুসারে যে সকল বৈজ্ঞানিক নিয়ম

অবধারিত হয়, তাহা কেবল প্রাগুক্ত মানবী একতার পরিচায়ক মাত্র। ইহাতে বিধি, বিধাতা কি অন্য কাহারও সংশ্রব নাই। কিন্তু যাঁহাকে অদৃষ্টাধীন নিয়ম বলা যায়, তাহা কোন অমানুষিক অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন করে এবং সর্ব্বভূতের উপরে তুল্যরূপে বিস্তার করে। এইরূপ বিধি জানিতে কিম্বা আয়ত্ত করিতে পরিলে অনেক সুবিধা হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আয়ত্ত করা দূরে থাকুক, অদৃষ্টের অব্যর্থ বিধি আছে কি না, তাহারই স্থিরতা নাই। সে যাহা হউক, তৃতীয় স্থলে বৈজ্ঞানিক এবং অদৃষ্টাধীন নিয়মের মধ্যে প্রধান বিভেদ এই যে, প্রথমোক্ত নিয়ম বহুবিধ, শেষোক্ত নিয়ম একায়ত্ত। যে যে স্থলে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেখানে ঐ সকল নিয়ম অদ্বিতীয় বিধাতার শক্তিজাত বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্ট মানিলে, প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক নিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃষ্টি বহির্ভূত নিয়ম (বা অনিয়ম !) লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। প্রাক্তনের উপরে নির্ভর করিলে যে পুরুষকারকে এককালীন বিদায় দিতে হয়, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম বহুবিধ এবং পুরুষকারের অধীন। অতএব, উহার সমবায়ী একত্ব স্থাপন করিবার অভিলাষ করিলে পুরুষকার প্রবর্ত্তন করাই বিধেয়; স্বভাবজাত ঘটনাবলির উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নহে।

তরল পদার্থ স্বধর্ম্ম এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সমতল-পৃষ্ঠ হইয়া থাকে। আর অন্যান্য নিয়মানুসারে ভূপৃষ্ঠে খাত প্রণালী আদি নির্ম্মাণ করা যায়। এই সকল বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্য পুরুষকার দ্বারা জলাশয় ও জলপ্রণালী সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। এস্থলে যাহারা অদৃষ্টাধীন থাকিয়া জলকষ্ট ভোগ করিত, তাহারা পুরুষকারের সাহায্যে দুর্ব্বিসহ শুষ্কতা হইতে অব্যাহতি পায়। ইতিপূর্ব্বে কূপ হইতে জল তুলিবার উদাহরণেও এই কথা বলা হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্তানুযায়ী অগণ্য ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই একটি অপূর্ব্ব নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘনীয় বটে কিন্তু তাহা পুরুষকার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তবে জানা আবশ্যক যে, যে পুরুষকার দ্বারা উল্লিখিত নৈসর্গিক ব্যবস্থার রূপান্তর সিদ্ধি হয়, তাহাও নিয়মানুবর্ত্তী। নিগূঢ় কথা, নিয়মগুলি বিভিন্ন ; মনুষ্য কেবল এক প্রকার নিয়ম দ্বারা অন্য নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় করিতে পারেন।

অতএব এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সমাজ-উদ্ধারিত

কর্ত্তব্য সাধনের নিয়ম এবং ব্যক্তি ধর্ম্মানুযায়ী সুখসাধনের নিয়ম—এই নিয়ম দ্বয়ের বিরুদ্ধ ভাব মোচনার্থ পুরুষকার জনিত অন্য কোন নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না। পুরুষকার দ্বারা নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় হয় বটে কিন্তু নিয়ম অন্যথা করিবার বাসনা কখনই পুরুষকারের পরিচায়ক নহে। এক নিয়ম দ্বারা নিয়মান্তরের ব্যত্যয় হইতে পারে, কিন্তু অনিয়ম কার্য্য বা যথেচ্ছাচারের দ্বারা কখনই কোন উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব নৈসর্গিক নিয়মহইতে কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অন্য নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। নিয়মের নিয়ামক হইবার জন্য নিরন্তর বিনীত ভাবে নিয়মাশ্রয় করাই বিধেয়। পুরুষকার বলিলে নিয়ম লঙ্ঘনকারী যথেচ্ছাচার বুঝায় না। পুরুষকার কেবল প্রগাঢ় বিনয়ই—বিশিষ্ট-নিয়ম পালনই—ব্যক্ত করে। কর্ত্তব্য ও সুখসাধন বিধানের মধ্যে যে সঙ্কট প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ বিনীত ভাব ব্যতীত, তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া কখনই সম্ভবে না।

সমাজধর্ম্মানুসারে জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিতে হইবে অর্থাৎ ব্যক্তিগণের স্বকীয় স্বার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা পরার্থপর বৃত্তিকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে। সুখসাধন বিধান মতে চিত্তবৃত্তি অবরোধ করিলেই দুঃখ এবং চরিতার্থ করিলেই সুখ উদয় হয়। সমাজ ধর্ম্ম সুখসাধন বিধানের বিপরীত নহে। কিন্তু অনন্যরূপে সুখসাধন বিধানের উপাসনা করিলে সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করা দুষ্কর হয়। অতএব স্বার্থপর চিত্তবৃত্তিকে দমন এবং পরার্থপর চিত্ত-বৃত্তিকে চরিতার্থও পরিবর্দ্ধিত করাই পুরুষকারের লক্ষ্য স্থল হওয়া উচিত।

উল্লিখিত ব্যবস্থা অভিনিবেশ পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ইহাতে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইলে কখনই কার্য্যোদ্ধার হইবে না। এবং প্রাকৃতিক নিয়ম যে ভঙ্গ হইবে না, তাহা সপ্রমাণিত না হইলে, এই নিয়ম কখনই সর্ব্ব-সাধারণের গ্রাহ্য হইবে না। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে পরার্থপর চিত্তবৃত্তি মনুষ্যের প্রকৃতিগত বটে, কিন্তু তাহা স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা হীনবল। অতএব দেখা যাইতেছে যে যদি সমাজ-ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্যবিধান পালন করা যায়, তবে স্বার্থপর চিত্তবৃত্তির ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু পরার্থপর বৃত্তি সন্তৃপ্ত হয়। আর যদি ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুসারে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করা যায়, তবে তাহার প্রবলতা নিবন্ধন পরার্থপর চিত্তবৃত্তি এবং সমাজ ধর্ম্ম উভয়েরই ব্যাঘাত হয়। যে দিকে যাও একটা নিয়মকে সংকীর্ণ করিতেই হইবে। মনুষ্য

ব্যক্তিগত ধর্ম্ম এবং আভ্যাসিক নিয়মানুসারে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা উভয়কেই সঙ্কীর্ণ করিতে পারেন বটে কিন্তু সমগ্র সমাজ ব্যতীত সমাজাশ্রিত নিয়মের অন্যথা কেহই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমাজগত পরার্থপরতা খর্ব্ব হইলে সমাজের আত্মরক্ষারও ব্যাঘাত হয়; সেই হেতু সমাজ-দ্রোহী স্বার্থপর ব্যক্তি অবশ্যই সমাজ কর্তৃক শাসিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে ব্যক্তিগত সুখাভিলাষ, পরার্থপরতা নিয়মের অধীন হইলেই উভয় কূল রক্ষা হয়; ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা চরিতার্থ হয় এবং সমাজও সন্তুষ্ট থাকেন।

সমাজগত নিয়মানুসারে পরস্পরের যে হিতসাধন হয়, তাহাতে সচরাচর ব্যক্তিগত সংকল্প দৃষ্ট হয় না। লোকে অর্থলালসা প্রযুক্ত শ্রম করে, এবং সেই শ্রম নিবন্ধন অন্যের মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং সমাজগত পরার্থপরতা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি এতদ্বিষয়ক নিগূঢ় চৈতন্য লাভ হইলে শ্রমসাধ্য পরোপকারই মুখ্যকল্পে লক্ষিত হয়, তবে বেতন সম্বন্ধীয় স্বার্থসাধন, পরিশ্রমকারীর গৌণ চেষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে স্বার্থপর সুখের কিছু কিছু বিঘ্ন হইতে পারে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত বিধানে দ্বিবিধ সুখই কিয়ৎ পরিমাণে লব্ধ হইবে এবং সামাজিক নিয়মটিও রক্ষিত হইবে। ও দিকে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিলে, অর্থলোলুপ শ্রমকারী নানা কুকার্য্যে রত হইতে পারে। শ্রমসাধ্য কার্য্যে চাতুরি করিতে পারে; অন্য শ্রমকারীর প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ক্ষতি করিতে পারে এবং শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারাও অনেক কুৎসিত স্বার্থপর কার্য্য করিতে পারে। এইজন্য বলা গিয়াছে যে পরার্থপর সুখাভিলাষকে অগ্রগণ্য করিলে উভয় কূল রক্ষা হইতে পারে।

উল্লিখিত ব্যবস্থার পোষক বলিয়া একটি গূঢ়তত্ত্ব এখানে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত ধর্ম্মে পরার্থপর চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ হইলে, তদনন্তর স্বার্থপর বৃত্তি পরিতোষেরও যথেষ্ট স্থল থাকে; কিন্তু বিপরীত বিধানে পরার্থপরতার স্থল প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। তোমার উদরপূর্ত্তি না হইলে, তুমি তোমার পরিবার পোষণ করিবে না. এরূপ সংকল্প স্থলে, আপনার উপযোগী খাদ্য আহরণের পরে তোমার পরিশ্রম করিবার বাসনা নিতান্ত খর্ব্ব হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু পরিবারবর্গের উদরপূর্ত্তি করিবার পর তোমার আত্ম ক্ষুধা তৃপ্তির কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। স্বার্থপরতার আতিশয্য বশত শেষোক্ত গৌণ কল্পটি প্রতিনিয়ত সুসিদ্ধ হয়, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে তাদৃশ শৈথিল্য জন্মিতে পারে না। আর এই প্রণালিতে পুরুষকার এবং

সমাজের হিত উভয়েরই যথেষ্ট পথ থাকে। ফলত এই গূঢ়তত্ত্ব এমন বিচিত্র, যে গৌণভাবে সর্ব্ব প্রকার স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অথচ তাহার অতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, অথচ পরার্থপরতার যথাযোগ্য পরিবর্দ্ধন হইতে থাকে। কিন্তু মুখ্য কল্পে স্বার্থপরতার পরিপোষণ হইলে নানা বিপ্লব উপস্থিত হয়। যতিগণ কেবল মোক্ষ সাধন বিষয়ে স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া পরার্থপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ সমাজধর্ম্মমতে পরার্থপরতা আশ্রয় করিলে আপন পরিবার এবং যতি উভয়কেই আশ্রয় দান করেন। ইহার উপরে গৃহস্থ যদি যতির আদর্শ মতে স্বার্থপর সুখে বিরাগী হন অথচ পরার্থপরতার সংকল্প বলবৎ রাখিতে পারেন, তবে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইবে; হইলে পুণ্য এবং সুখ উভয় বিষয় সঞ্চয় করিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা জন্মিবে। অতএব সুখাভিলাষ সমাজগত পরার্থপরতার অধীন করাই বিধেয়, ইহা স্থির করা গেল। কিন্তু এই নিয়ম কে প্রচলিত করিবে, কিসের বলে উহা প্রতিপালিত হইবে?

কতকদূর পর্য্যন্ত সমাজ স্বয়ং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া থাকেন। গুরু পদার্থ যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বশত নিম্ন স্থান অধিকার করে, সমাজও সেইরূপ স্বীয় বলদ্বারা ব্যক্তিগণের গুরুতর স্বার্থপরতা নিবারণ করিয়া রাখেন। জগতে ধর্ম্মশাসন থাকুক আর নাই থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানুক আর না মানুক, মনুষ্যকে সমাজে থাকিতেই হইবে এবং থাকিয়া সমাজ শাসনের অধীন হইতেই হইবে। দস্যু, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী ব্যক্তিরা সকল সমাজেই দণ্ডার্হ হয়।

মনুষ্য ব্যক্তিভাবে স্বানুবর্ত্তী এবং সমাজাধীন বলিয়া পরানুবর্ত্তী হয়। যে পরের বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া পরানুবর্ত্তী হয়, তাহার দ্বারা সমাজের জমাট ভাব পরিবর্দ্ধিত হয়; তাহার কার্য্যগতিতে ব্যক্তিরূপ পরমাণু সকল পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে সুবোধ বলিয়া মানিতে হইবে। যে আপন বুদ্ধির ন্যূনাতিরেক বিচার করিতে অক্ষম, সে ইচ্ছাক্রমে হউক আর অনিচ্ছাক্রমেই হউক, অগত্যা পরানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। তাহার চিত্তে স্বার্থপর বৃত্তির উদ্রেক হইলে সে আপন যূথপতিকে আশ্রয় করে। নতুবা তাহার স্বার্থপরতা হেতু গৃহধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম উভয়ই উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে। এতাদৃশ ব্যক্তির গুরুতর দোষগুলি সমাজ কর্তৃক অবাধে নিবৃত্ত হয়। বিশেষ অত্যাচার করিলে ইহারা সমাজ কর্তৃক নানাবিধ উপায়ে উৎপীড়িত হইয়া

থাকে। অতএব সমাজ শাসন দ্বারা প্রবল স্বার্থপরতা স্বভাবতই খর্ব্বীকৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যক্তিগণের সামান্য দোষ বহুতর। সমাজ তাহা স্বীয় পরার্থপরতা গুণেই সহ্য করিয়া থাকেন। সমাজ তস্করকে শাসনে রাখেন কিন্তু পরভাগ্যোপজীবি কৃমিগণের কিছুই করেন না। ব্যভিচারী গৃহস্থকে আক্রমণ করিলে সকলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, কিন্তু লম্পট ও বেশ্যার উৎপাত দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে। সমাজ এইরূপ নানা অপরাধ ক্ষুব্ধ চিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন। সহ্য করেন বটে কিন্তু কেবল কালের উন্নতি সাপেক্ষ হইয়াই এইরূপে সহ্য করেন। এই সকল কীটগণের দংশন হেতু সমাজ কেবল আত্ম দেহ কণ্ডূয়নেই ব্যাপৃত থাকেন এবং এইরূপ পীড়া না হইলে যে সমস্ত মহৎকার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন, তাহার প্রতি নিরুদ্যম হইয়া পড়েন। সুতরাং এই সকল কারণ বশত সমাজ শরীরের ক্রমোন্নতি কেবল মন্দগামী হইয়া উঠে।

সমাজের কার্য্য এবং ব্যক্তির কার্য্য মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ইতিপূর্ব্বে হীনবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা গিয়াছে, অতঃপর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিব আচরণ বিবেচনা কর। এতাদৃশ ব্যক্তি স্বার্থপর হইলে ছলে বলে অন্যের উপরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে। কিন্তু তাহাব পরেও যদি তাহার স্বার্থপরতা পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকে, তবে তাহার অধীন ব্যক্তিরা নিরাশ্রয় হইয়া তাহার বৈরসাধন করিতে চেষ্টা করে; সুতরাং প্রধান এবং অধীন মধ্যে পরস্পরের জমাটভাব চূর্ণ হইয়া যায় এবং অন্য ব্যক্তি প্রভুত্ব স্থাপন করিবার পথ দেখিতে থাকে। আব যদি সেইব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থপরতা দমন করিয়া আশ্রিতবর্গের পালন করিতে থাকে, তবে তাহার প্রাথমিক দোষের অনেক অপনয়ন হইয়া যায়। সচরাচর এইরূপ ঘটনাই দৃষ্ট হয়; সমাজের নিয়মই এই যে শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার পরে সতত শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে মনুষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নিবন্ধনই প্রথমত প্রবৃত্ত হন, অনন্তর সমাজ ধর্ম্মানুসারে পরার্থপর আচরণে ব্যাপৃত হন। এই সকল মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতি পরার্থপর হইলে মঙ্গলের পরিসীমা থাকে না। তাঁহাদিগের বিশিষ্ট পরার্থপর প্রভুত্ব হইতে সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ সাধন হয় এবং তাঁহারা সত্য সত্যই নারায়ণের অবতার স্বরূপ হইয়া উঠেন। অতএব প্রভুভাবে হউক অথবা ভৃত্যভাবে হউক

উভয় স্থলেই ব্যক্তিগত গুরুতর অত্যাচার সমাজ কর্তৃক নিবারিত হয় এবং উভয় স্থলেই সামাজিক পরার্থপরতা দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়; হীনবুদ্ধি ব্যক্তি, যূথপতির অনুবর্ত্তী হইয়া এবং স্বানুবর্ত্তী প্রভু, বিপ্লবের আশঙ্কা বশত আশ্রিত পালন করেন। তাহাতেই সমাজ রক্ষা পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নতি অর্থাৎ স্বানুবর্ত্তিতার পরিবর্দ্ধন সহকারে কখন স্বার্থপরতা কখন বা পরার্থপরতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। তবে সুখসাধন বিধান মতে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে যে স্বার্থপর বা যথেচ্ছাচারী হইতেই হইবে এমত নহে। আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি সমাজধর্ম্মানুসারে উন্নতি লাভ করুক এই অভিপ্রায় হইলে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে স্বভাবতই নিয়মানুবর্ত্তী হইতে হইবে। কেন না তদ্ভিন্ন হয় ব্যক্তিগত সুখসাধনের ব্যাঘাত, নচেৎ ব্যক্তি ও সমাজ বিধানানুযায়ী পরার্থপরতার পথ রোধ হইবে।

ব্যক্তিগণের স্বধর্ম্মই স্বানুবর্ত্তিতা। স্বানুবর্ত্তিতা ব্যতীত সুখ সাধন হয় না। কিন্তু স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তি সমাজের নিকট এবং সমগ্র প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট বিনয়াবনত না হইলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ করিতে পারেন না। আর তিনি নিয়মানুসারে পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী না হইলে সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন হইতে পারে না। অতএব বিবেচ্য এই যে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম কি? স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তির নিয়মও স্বানুবর্ত্তিতা; কেবল নূতন কথা এই যে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তি পরার্থপর হইলেই পুরুষকার সুসিদ্ধ হয়। তাদৃশ ব্যক্তির নিয়ম স্বকৃত, স্বীয় মনোবৃত্তির ফল, এবং যাবতীয় বৈজ্ঞানিক নিয়মের অনুবর্ত্তী। পরানুবর্ত্তী ব্যক্তি অগত্যা পরার্থপর হইয়া থাকে। তাঁহার পক্ষে এতদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভই স্বানুবর্ত্তীতার পরিসীমা। আমার দ্বারা পরের মঙ্গল সাধন হইতেছে, এইরূপ চৈতন্য স্থলে পরের দাসত্ব সত্ত্বেও স্বানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। অতএব কি স্বানুবর্ত্তী কি পরানুবর্ত্তী উভয়ের স্বকৃত বা স্বীকৃত পরার্থপর নিয়ম অবলম্বন দ্বারাই কর্ত্তব্যসাধন ও সুখসাধনের সমবায়ী ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হয়। এরূপ প্রতি-ব্যক্তি-কৃত স্বীয় জীবনব্যাপী নিয়মই জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত রচনা করিবার বিধানকেই ব্রততত্ত্ব নামে ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতে জগতের সকল নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আবার স্বীয় পুরুষকারের উপরে নির্ভর করিয়া ঐ সকল নিয়মের রূপান্তর করিতে হয়। পুরুষকারের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিকৃত মঙ্গলের ন্যূনাতিরেক হয়। কিন্তু ব্রত ব্যতীত পুরুষকারের স্থল কুত্রাপি থাকে না।

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম; এবং সমস্ত জগৎও নিয়মের অধীন। উভয়ের মধ্যে

ভেদ এই যে নৈসর্গিক নিয়ম মনুষ্যের আবিষ্কার; ব্রত ব্যক্তির স্বকৃত আ
সম্বন্ধীয় নিয়ম। জ্ঞান, নৈসর্গিক নিয়মের দর্শন স্বরূপ। ব্রত, দূরদৃষ্টি এব
পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। পরার্থপরতা, জীবন ব্রত; আর ধর্ম্মোপাসন
তাহার অবান্তর ব্রত। যেরূপ দর্শন, যেরূপ জ্ঞান এবং জীবনব্রত যেরূপ, তদনু
সারে সেই সকল অবান্তর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাস সহকারে সেই
সকল ব্রত নিবন্ধন ব্যক্তিগণ অন্যান্য বস্তুর ন্যায় নিয়মাধীন হইয়া উঠেন।

নিয়ম ধরিলে তাহার অনুসরণ কার্য্যই অবিরোধী জীবনযাত্রা-পদে
বাচ্য হয়। কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে থাকিলেই ক্রিয়াগত সুখের
উদ্দীপন হয়। স্বার্থপরতা পদে পদে অন্যের নিকট ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়;
সুতরাং স্বার্থপর ব্যক্তির নির্ব্বিরোধী কার্য্য এবং তজ্জনিত সুখ অসম্ভাবিত।
নিজের নিয়ম নিজে করিলেই তাহাকে ব্রত বলে। স্বকৃত নিয়মে একবারে
স্বার্থপরতা থাকিবে না, এরূপ মনে করা ভুল; কিন্তু সঙ্কল্পস্থলে পরার্থপরতাকে
অগ্রগণ্য করাই ব্রতের বিধান, আর পরার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিবার জন্য
স্বার্থপরতাকে সতত দমন করিবার চেষ্টাই পুরুষকারের প্রধান অঙ্গ।
ব্রত স্বকৃত এবং স্বীকৃত হইলেই সতত ক্রিয়াসুখের উদ্দীপন করিয়া থাকে।
আর উহার উদযাপন স্থলে নানাবিধ কাম্যসুখেরও উৎপত্তি হয়। অতএব
স্বার্থপরতা দমন ব্রত হইতে যেমন ক্রিয়াগত সুখের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ
আবার অভ্যাস দ্বারা ঐ বিষয়ে যত সিদ্ধি লাভ হয়, ততই পরার্থপরতার
প্রভাব এবং কর্ত্তব্য বিধানের উন্নতি হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তি
পরিতোষের সুখলাভ হয়। এতদ্ভিন্ন ব্রত পরার্থপর হইলে ব্যক্তিগত এবং সমাজ-
গত নিয়ম, সমস্তই প্রতিপালিত হয়। ব্রতের সংকল্প কালে সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক
নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। সুতরাং ইহার জন্য সর্ব্বপ্রকার নিয়ম
পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

অতএব জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি ব্যক্তিচরিত্রের এই ত্রিবিধ
শক্তিই ব্রতের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। কেবল সঞ্চালিত হয় তাহা নহে।
ব্যক্তিচরিত্র ব্রতনিষ্ঠ হইলে তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে ঐকান্তিক ভাব নিব-
র্ত্তিত হয়। সেই একাগ্রতা হেতু উল্লিখিত ত্রিবিধ শক্তি একত্রিত হইয়া
উঠে। জগতের নিয়ম বহুবিধ। তাহা কেবল ব্যক্তির মনেই একত্রিত
হইতে পারে কিন্তু এতাদৃশ একত্ব কেবল চৈতন্যের আকারে পরিণত
হইলে ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির সঞ্চালন অথবা পুরুষকারের স্থল থাকে না।

প্রাগুক্ত সর্ব্বব্যাপার বিস্তৃত চৈতন্য, ব্যক্তি চরিত্রে ব্রতাকারে পরিণত হইলে একপ্রকার অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হয়। ফলত কেবল এই উপায় দ্বারাই ব্যক্তি ও সমাজের অদ্বৈত ভাব স্বতন্ত্র এবং অভিন্ন ভাবে বিকাশিত হইতে পারে। এবং বিচার করিলে প্রকাশ হইবে যে এইরূপ উপায় ব্যতীত নিশ্চয়াত্মক অদ্বৈত ভাব কখনই চৈতন্য গোচর হইতে পারে না।

এখন একবার ব্যক্তিকৃত ব্রত, অর্থাৎ সমাজধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্যতা ও ব্যক্তিগত সুখসাধন এতদ্বয়ের সমবায়ী নিয়ম, এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য নিয়ম, এই দ্বিবিধ নিয়ম মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলনা করিয়া দেখ। দেখিয়া বিবেচনা কর যে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য ঐক্য সংস্থাপিত হইল কি না; এবং তাহাতে হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ব্রত সমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব কি অসাধারণ প্রতিভা ব্যক্ত করিতেছে।

আমরা বস্তুর বস্তুত্ব কি, তাহা জানি না, কেবল phenomena, ফিনমিনা, অর্থাৎ গোচর বিষয় উপলব্ধ করিতে পারি; 'গোচর' বলিতে যাহা ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে তাহাই বুঝায়; বস্তুর বস্তুত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর। নিয়ম কেবল সেই গোচর বিষয়ের মধ্যে অন্যথাবিহীন পূর্ব্ববর্ত্তিতা ব্যক্ত করে। ঐরূপ নিয়মই বিজ্ঞান শাস্ত্রের একমাত্র সম্বল। পরন্তু বস্তু কি, তাহার বিষয় কোন স্থিরবুদ্ধি করিতে হইলে, আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক প্রতি নিয়মাবলীর আধেয় ভাবিয়া এক একটি বস্তু কল্পনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু নানা নিয়মাবলীর মধ্যে এত বিভেদ যে এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার অদ্বৈত আধেয় কল্পনা করিতে পারেন নাই। কেহই এরূপ কল্পনা করিতে কৃতকার্য্য হন নাই যে অমুক অমুক নিয়মগুলি একটি বস্তুতে একত্র বিদ্যমান আছে এবং কেবল তাহা হইতেই অবস্থা ভেদে অন্যান্য সমস্ত নিয়মের সঞ্চালন হয়। এই প্রণালী মতে তত্ত্বানুসন্ধান যার-পর নাই সংক্ষেপ করিয়া আনিলেও, মনুষ্য এবং বহির্জ্জগত বিষয়ক, দ্বিবিধ নিয়মাবলী এবং তাহার আধেয় দ্বিবিধ বস্তু, বলিয়া এক প্রকার দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে হয়। এই দুই মহাবস্তু ঘটিত দ্বৈতবাদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। অদ্বৈতবাদ কেবল মনুষ্যের অন্তরেন্দ্রিয় মধ্যে বিরাজ করে। মনুষ্য, বহির্জ্জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না কিন্তু সেই সকল নিয়ম জানিয়া বহির্জ্জগতের উপরেও প্রভুত্ব করেন। মনুষ্যের উপরে বহির্জ্জগতের প্রভুত্ব একেবারে অপ্রতিহত হইলে পুরুষ-কারের স্থল থাকিত না।

বহির্জ্জগতে গণিত এবং পদার্থ বিষয়ক দ্বিবিধ নিয়মাবলী। এক একটি নিয়মাবলী ধরিয়া একটি এক শাস্ত্র। গণিত শাস্ত্র ত্রিবিধ, যথা;—সংখ্যা গণিত, ক্ষেত্র গণিত এবং গতি-গণিত। পদার্থ শাস্ত্রের দ্বিবিধআধেয়—নভোদেশ এবং পৃথিবী। পার্থিব পদার্থ আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক শ্রেণির নিয়মাবলিতে মনুষ্যের চেতনা ভেদে তৌল, তাপ, শব্দ, আলোক এবং তড়িৎ এইরূপ অবান্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রগুলির একত্রিত নাম ভূতবিজ্ঞান (Physics proper)। পার্থিব পদার্থের দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ নিয়ম রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্গত। আপাতত রাসায়নিক নিয়মের সহিত জীবতত্ত্বের বিশেষ নৈকট্য অনুমান হয়। কিন্তু জীবন অতি বিচিত্র বিষয়। রাসায়নিক নিয়মে কখন যে উদ্ভিদ কি প্রাণীর জীবন বিষয়ক মূলতত্ত্ব ব্যাখাত হইবে, এতাদৃশ প্রত্যাশা করা ভুল। এইজন্য দ্বিবিধ মহা বস্তুর মধ্যে সমগ্র জড় বিভাগ একত্রিত করা গিয়াছে; এবং সর্ব্ব-প্রকার সজীব পদার্থ দ্বিতীয় সংখ্যাতে মানবী শাস্ত্র নামে গণ্য করাই বিধেয়।

এই মানবী শাস্ত্র নামক শ্রেণিতে প্রথমত উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্মিলিত জীবতত্ত্ব, দ্বিতীয়ত নরপুঞ্জাবলী বা রাজ্য উপলক্ষে সমাজতত্ত্ব, এবং সর্ব্ব শেষে ব্যক্তিতত্ত্ব, এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের নিয়মাবলি দৃষ্ট হইবে। এই সমস্ত নিয়মাবলি বা তাহার আধেয় বস্তুর পর্য্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভূতবিজ্ঞানের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, সমাজ বিষয়ক নিয়মের সহিত ব্যক্তি বিষয়ক ব্রতের সম্বন্ধও তদনুরূপ। ভূত বিজ্ঞানোক্ত তৌল তাপাদি বিষয়ক নিয়ম, সমস্ত পদার্থেই বিদ্যমান, কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্ত্তন তদনুসারে সুসিদ্ধ হয় না। রাসায়নিক নিয়মে কেবল পদার্থের পরমাণু সমস্ত পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়। আর মানবী শাস্ত্রাদি মধ্যেও দৃষ্ট হইবে যে ব্যক্তি-গণ পরমাণুর সদৃশ। সমাজ, সেই ব্যক্তিরূপ পরমাণুর জমাট অবস্থা, আর তাহা ভৌতিক পদার্থের ন্যায় বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ব্যক্তিগণের নিয়মই ব্রততত্ত্ব এবং উহা রাসায়নিক নিয়মের ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম। ব্যক্তিগণ প্রধানত স্বকৃত এবং স্বীকৃত ব্রত দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সেই সকল নিয়ম বা ব্রত সুপ্রণালি বিশিষ্ট হইলে সমাজের যেরূপ রমণীয় ভাব উদয় হয়, কুপ্রণালী বিশিষ্ট হইলে তাহা কোন মতেই সম্ভবে না। সমাজ স্বকীয় নিয়মানুসারে কালস্রোতে, প্রবাহিত হয়। সমাজের নিয়ম ভূত-বিজ্ঞানের অনুরূপ। এতদ্দ্বারা ব্যক্তিরূপ পরমাণ, ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা

অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, নিরন্তর শাসিত হয়। এবং যেমন উহার আদর্শ তাপ তৌলাদির নিয়ম, রসায়ন শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্ববিধ পরমাণু সমষ্টিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে; সেইরূপ জমাট-সমাজের নিয়ম পরমাণুরূপ ব্যক্তি সংক্রান্ত নিয়মকেও অতিক্রম করে। তুমি যদি জল ও দ্রাবক একত্র করিয়া দমকল চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার প্রক্রিয়া নিবারিত হইবে না বটে কিন্তু যন্ত্রটি অবিলম্বে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। সমাজেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। সমাজে বিভিন্নব্রত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বাহ্যত একত্রিত কার্য্য করিতে পারে। এবং একত্র থাকিয়া স্ব স্ব ব্রত মতে এবং পরার্থপর কার্য্য ও স্বকীয় সুখসাধন উভয়ই নির্ব্বাহ করে বটে, কিন্তু ব্রতের বিশৃঙ্খলতা হেতু এই ফলোদয় হয় যে যুগে যুগে সমাজ যন্ত্র বিকল হইয়া নানা উৎপাত ঘটিয়া থাকে। এই কথা কেবল কাব্যালঙ্কার স্বরূপ নহে। ইহার প্রমাণস্থল সমগ্র জগতের পুরাবৃত্তে বিদ্যমান।

ফিনিসিয়া ও কার্থেজ দেশের সমাজ উপরোক্ত কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। গ্রাসের সমাজ, ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশের গুণগ্রাম স্বায়ত্ত করিয়া আপন শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু রোম আবার গ্রীসের চিন্তামার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়ামার্গে প্রবিষ্ট হন। অনন্তর রোমের যুদ্ধ ও শাসন প্রণালী ইদানিন্তন ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ অধিকার করিয়াছে। ইহাতে গ্রীসের বুদ্ধি এবং রোমের চেষ্টা, উভয়ই প্রকারান্তরে সজীব রহিয়াছে। ফিনিসিয়া ও কার্থেজ নির্ব্বংশ হইয়াছে; কিন্তু রোম ও গ্রীস দেশস্থ সমাজের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। ঊর্দ্ধ সংখ্যা বলিতে পার যে গ্রীস এবং রোম গুটিপোকার ন্যায় রূপান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপতি হইয়া সমগ্র ইউরোপে বিচরণ করিতেছে। ফলত আদ্যোপান্ত লক্ষ্য করিলে মানিতে হইবে যে, মিসর হউক, কি ফিনিসিয়া হউক, এইরূপ কোন বীজসম্ভূত হইয়া ইউরোপ প্রথমত এথেন্স গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, করিয়া এখন এত দিগন্তব্যাপী হইয়াছেন। ইউরোপের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় দিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই চরিত্রে কার্য্য কুশলতা এবং ক্রিয়া বিষয়ে ব্যক্তিগত ব্রতের অনুষ্ঠান ও পালন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইউরোপের জীবনযাত্রা সবিস্তরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, মধ্যকালীন ও বর্ত্তমান ইউরোপের পুরাবৃত্তে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং তাহাতেও এতদ্বিষয়ক আলোচনা সমাপ্ত হইবে না। কেন না ইউরোপের

এখন পূর্ণবয়স। তথাকার ভাবী অবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত কথা কাহারো বলিবার সাধ্য নাই। এবং ইউরোপের ভাবী অবস্থা কল্পনা করিয়া তথাকার বর্ত্তমান ক্রিয়া কলাপ হইতে উপদেশ গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি ইউ-রোপের জীবন ক্ষয় হয় তবে এরূপ উপদেশ বৃথা হইবে। সুতরাং ইউরো-পের পথে চলিলেই সমাজ শরীরের সর্ব্বাধিক দেহ পুষ্টি হইবে, একথা অবধারণ করাও অসাধ্য।

জড়পদার্থে জীবনের সংস্রব নাই। সজীব পদার্থের জীবনান্তে দেহ ক্ষয় হয়। কিন্তু সমাজের জীবন আর এক প্রকার। উহা কখন সজীব বস্তুর ন্যায় বিলুপ্ত হয়, কখন গুটিপোকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানা অবস্থা ধারণ করে এবং কখন বা নিতান্তই অমরতা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। ফলত যে কারণে সমাজে ব্যক্তিগত দোষ সমূহ প্রশ্রয় পায়, তাহাই সমাজের গুণগ্রামের বিঘ্নকারক এবং তাহাতেই সমাজদেহ ক্ষত,লুপ্ত অথবা বিনষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিতে অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে ইউরোপেই সভ্যতার সীমা শেষ হইয়াছে, ইউরোপের প্রকৃতিতে দোষ নাই, ইহাই জগদ্বিস্তীর্ণ হইয়া নরচরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত অমরতা লাভ করিবে, তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। আর যে কোন বিষয়ে দ্বিধা থাকুক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, গ্রীসে প্রথমত ইউরোপ ও এসিয়া উভয় মধ্যে যে ভয়ানক যুদ্ধকাণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে, উহা কখনই সর্ব্বতোভাবে মাঙ্গলিক নহে এবং আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, সেই বৈরভাব এপর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইল না। ঐ যুদ্ধে এসিয়ার দোষ স্বীকার করিতে সম্মত আছি। ঐ যুদ্ধ না হইলে হয় তো গ্রীস বিনষ্ট হইয়া এসিয়ার কুচরিত্র ইউরোপ ব্যাপী হইতে পারিত। কিন্তু গ্রীসের গুণে তাহা হইতে পারে নাই বলিয়া যে আলেকজন্দর ও সিলিউকসের মদগর্ব্বের এখনও প্রশংসা করিতে হইবে, এবং গ্রীসের নানাবিধ মহদ্গুণ ছিল বলিয়া যে সেই সমরানল অধুনাতন ইউরোপীয় বাণিজ্যের অঙ্গ হইয়া উঠিবে, ইহা কখনই জগতের মঙ্গলজনক হইতে পারে না। ইউরোপ যদি একথা বুঝিতে পারেন তবে তদ্দেশের সমাজ শরীরে আর একবার গুরুতর পরিবর্ত্তন হইবে। এবং অন্তত সেই পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষাতে ইউরোপের অনুকরণ কার্য্যে আমাদিগের কিছুদিন বিরত থাকা আবশ্যক হইতেছে। সে যাহা হউক যে পর্য্যন্ত বলা গেল তাহাতে বুঝা

যাইবে যে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষগুণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রতের ফলাফল অনুসারে, সমাজ-জীবনের কত অবস্থান্তর হয়। তাহা পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে ব্যক্ত হইয়া আছে।

অনন্তর এসিয়ার প্রতিদৃষ্টি করা যাউক। এসিয়ার কথা বলিলে আমাদিগের ভারতের কথাই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইউরোপের কুচরিত্র দেখিয়া অনেকে ব্রাহ্মণের ঔদার্য্য ভুলিয়া যান; এমন কি, ব্রাহ্মণের পৌরুষ ব্যক্ত করিবার জন্য আর্য্যজাতিকে ইউরোপীয়ের ন্যায় জিগীষা পরবশ না মনে করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। এরূপ কথার প্রতিবাদ করাও কঠিন। ভারতে যে প্রণালীতে সমাজ জীবন সঞ্চালিত হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহার বিচার করা দুর্ঘট, কেন না আমাদিগের দেশের পুরাবৃত্ত নাই। এমন কি যে প্রণালিতে সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে ক্রমশ পুরাবৃত্তের উদয় হয়, হইয়া সমাজতত্ত্ব রচনা করিবার পথ গঠিত হয়, সেই প্রকার record রিকার্ড করিবাব প্রণালিও এতদ্দেশে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। ফলত এ কথাতে বোধ করি কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না, যে আমরা যদি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইতাম তবে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের তপকামনার প্রতি এত হন্তারক হইতেন না, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের বিরোধ এত প্রবল হইত না, এবং ব্রাহ্মণ শিক্ষিত রাজধর্ম্মাবলম্বীরাও এত অকর্ম্মণ্য হইতেন না। ইদানিন্তন সুশিক্ষিত মহাশয়েরা আর্য্যজাতির কল্পিত জিগীষার বৃথা আন্দোলনে ব্যাপৃত না হইয়া যদি হিন্দু ও রোমক উপদেশগুলি একত্রিত করিতে চেষ্টা করেন, এবং যদি এইরূপ সংযুক্ত প্রণালীতে ধর্ম্মাত্মিক সমাজ শাসন সংস্থাপন করিতে অনুরক্ত হন, তাহা হইলে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অমরতা পাইতে পারিবে। আমার স্থূল কথা এই যে ব্যক্তিচরিত্র নিবন্ধন ইউরোপীয় বা রোমক শাসনে ধর্ম্মকরে নাই, হিন্দুদিগের ধর্ম্মে রাজ্য শাসনের সুকৌশল উদ্ভাবিত হয় নাই। হিন্দুদিগের এই দোষ হেতু এসিয়ার সমাজে রাজ্যও রাজ্যের মধ্যে সুকৌশল সম্পন্ন প্রীতি জন্মে নাই। এসিয়ার কথা দূরে থাকুক, এই দোষেই ভারত মধ্যে এত রাজভেদের আতিশয্য এবং বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান উভয়ে এক কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন না। ফলত দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই সেলামিসের (Salamis) সংগ্রামে গ্রীস যে পারসিক নবাড়া ধ্বংশ করিয়াছেন, সেই অবধি আমাদিগের রাজধর্ম্মের হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা যতই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের গর্ব্ব করি, সেই শাস্ত্র যখন রক্ষা করিতে পারি

নাই—যখন আজি ইংরাজের নিকট ঋণ স্বীকার পূর্ব্বক সেই শাস্ত্রের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন আর রাজ-গর্ব্ব আমাদিগের শোভা পায় না। প্রস্তাবিত দোষ আমাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রে সর্ব্বত্র ব্যক্ত রহিয়াছে। রাজায় রাজায় যেমন; জ্ঞাতিবর্গ, গ্রাম্যদল এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে সর্ব্বত্রই সেইরূপ আত্মবিচ্ছেদ। সর্ব্বত্রই এক প্রণালীর দূষিত শাসন।

এই ভারতের মাহাত্ম্য কিসে উৎপন্ন হইয়াছে? ভারত ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াই এত বড় হইয়াছিলেন। তাহার একটি প্রধান অঙ্গ বৈরাগ্য। আর হিন্দুগণের বৈরাগ্য মধ্যে সার কথা ব্রততত্ত্ব। আমরা কোন ব্রত করিলে তাহার উদ্যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্যচিত্তে সেই ব্রত পালন করিতে পারি। ব্রতের মর্ম্ম বুঝি না। বালিকাগণ শৈশবকালে সাঁজতি পূজার ব্রত করে; পতি শোকাতুরা বিধবা ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ ব্রত করেন এবং পরমহংসেরা জিহ্বা হইতে দোষ বিশিষ্ট কথা নিষ্ক্রান্ত করিলেই অমনি মৌন ব্রত করিয়া স্বস্ব চরিত্র সংস্কার করেন। ব্রতের তত্ত্ব যেরূপ হউক আমরা ব্রত করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। এবং এই নিমিত্ত ভারত বা এসিয়ার ব্যক্তি চরিত্র এমন মনোহর। অন্তত আমাদিগের চক্ষে এমন চিত্তরঞ্জক দেখায়, যে তাহার ধ্বংশ কদাচ সম্ভাবিত মনে হয় না। হিন্দুগণ নির্ব্বংশ হইতে পারেন কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তি জীবনের নিমিত্ত যে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম এবং যে সমস্ত পুণ্যগর্ভ ব্রত পদ্ধতি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার নহে। নরসমাজের অমরতা নিবন্ধন এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কৌশল চিরস্থায়ী হইবে। নবদ্বীপ,ভাটপাড়া এবং বারাণসির যতি, দণ্ডি এবং অধ্যাপক মহাশয়েরা এ বিষয়ে স্তম্ভিত চিত্ত হইতে পারেন। তাঁহারা আর্য্য বংশ কলঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্র সকল বাণিজ্যোন্মত্ত ইউরোপের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্ম বিনষ্ট হইবে না; একান্ত পক্ষে ভারত ঋষিগণ দেশান্তরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, করিয়া জগদ্বিস্তীর্ণ নরসমাজের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করিবেন। বলিতে দুঃখ হয় যে ব্রতের এই সকল মাহাত্ম্য একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি, যাঁহারা এই প্রাচীন দেশে ব্রতের নিয়ম উদ্ভাবন করেন তাঁহাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হইবার বস্তু নহে। উহা দ্বারা ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জিত না হউক, উহা হিন্দুসমাজকে আশ্রয় করিয়াছে বলিতে হইবে। এবং আমরা যদি হিন্দু রক্ত ও হিন্দুধর্ম্ম শরীরে ধারণ

করি তবে আর অর্ব্বাচীনের মত হিন্দু শাস্ত্রাবলিকে পুত্তলির ন্যায় সোহাগ করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিসে এসিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম্ম স্বায়ত্ত করিতে পারেন সেই চেষ্টাতে ব্যগ্র হইব না। কিসে ইউরোপ এসিয়ার মাহাত্ম্য চিনিতে পারেন তাহার সহায়তা করিব এবং কিসে ইউরোপ এবং এসিয়া উভয়ে সমবেত হইয়া, কিসে হিন্দু বৌদ্ধ, মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে সমবেত হইয়া নিষ্কণ্টকে সমগ্র নর সমাজের দেহ পুষ্টি করিতে সক্ষম হন, সেই চেষ্টা করিব।

সিংহল যাত্রা।

১২৯০।১৪ই ফাল্গুন—গত কল্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির দেখিয়া আসিয়া আমার দৈনিকে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়াছি। সিংহলে শৈব, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প; বৌদ্ধদের সংখ্যাই অধিক। এজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিলে অনধিকার চর্চ্চা হয় না।

(১) বৌদ্ধদের ধর্ম্মশাস্ত্র তিন কাণ্ডে; এজন্য তাহা পিটকত্তয় (ত্রিপিটক) নামে খ্যাত। এই তিন কাণ্ডের নাম সুত্ত (সূত্র), বিনয় ও অভিধম্মো (অভিধর্ম্ম)। সূত্রে গৌতমের অর্থাৎ শাক্যসিংহের বচন প্রকটিত থাকায়, সূত্রই ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়াছে। সূত্র ও বিনয় ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ। অভিধর্ম্ম বৌদ্ধদিগের দর্শন বলিলে বলা যায়। অভিধর্ম্মকার পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্মা অথবা ঈশ্বর * জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। স্বভাব হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্বভাবে তাহার স্থিতি এবং স্বভাবেই তাহার লয় হইয়া কল্পান্তরে পুনর্ব্বার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইবে। বুদ্ধই পুরুষোত্তম, বুদ্ধ হইতে উচ্চতর কেহ নাই। অভিধর্ম্মের মতই বৌদ্ধদিগের অধিকাংশের মত; এজন্য অনেকেই বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলেন। তাঁহারা যে নিরীশ্বর তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা পরলোক ও কর্ম্মফল মানে, যাহাদের

* অভিধর্ম্মে "শিব" অর্থে "ঈশ্বর" শব্দের প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধদের মঙ্গলসূত্র অভিধর্ম্মের ন্যায় নিরীশ্বর।

মতে 'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ', যাহাদের ধর্ম্মনীতি অত্যুৎকৃষ্ট, তাহারা নিরীশ্বর হইলেও তাহাদিগকে নাস্তিক বলা উচিত নহে।

যাহারা চার্ব্বাক, যাহারা পরলোক ও কর্ম্মফল মানে না, যাহাদের মতে ইন্দ্রিয় সুখই পরম পুরুষার্থ, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। কপিল, শাক্যমুনি ও অগস্ত কোম্‌ৎ নিরীশ্বর হইয়াও নাস্তিক নহেন।

অধিকাংশ বৌদ্ধ নিরীশ্বর বটে; কিন্তু নেপালে একটি সম্প্রদায় আছে তাহারা আদি বুদ্ধ মানে। তাহাদের মতে আদি বুদ্ধ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বরে এবং হিমবন্ত প্রদেশের আদি বুদ্ধে কোন ভেদ নাই। বৌদ্ধরা মানব শাক্যমুনিকে দেবতাদের অপেক্ষা মহান্ বলিয়া মান্য করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে মর্ত্তালোকের উপর দেবলোক, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি অরূপ ব্রহ্মলোক, সর্ব্বোপরি নির্ব্বাণ। ললিতবিস্তরের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মায়াদেবী প্রসূতী হইলে, ব্রহ্মা এবং দেবরাজ শক্র নবজাত শাক্যকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলেন। * সুত্তপিটকে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বরুণ ও বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের এবং যক্ষরাজ কুবেরের উল্লেখ আছে। স্থানবিশেষে ব্রহ্মা পিতামহ নামে; বিষ্ণু নারায়ণ, জনার্দ্দন ও উপেন্দ্র নামে; শিব, শঙ্কর নামে এবং ইন্দ্র, সচীপতি নামে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যে মাননীয় এ কথা সুত্তপিটকে স্বীকৃত আছে; কিন্তু বুদ্ধই কেবল পরম পূজনীয়। যাঁহারা স্বভাব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মা বা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন, অভিধর্ম্মকার তাহাদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু অভিধর্ম্মে ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রূপ নাই।

বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, শাক্যমুনি প্রথম বা একমাত্র বুদ্ধ নহেন। প্রতি মহাকল্পে এক বা তদধিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সকলেরই জন্ম জম্বুদ্বীপে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে। সকলেই উরুবিল্ব বা উরুবেলার জনপদে (বুধ গয়ায়) এক একটি বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। যিনি যে বৃক্ষতলে

---

* গগনতলে হি স্থিত্বা ব্রহ্মোত্তমঃ শক্র দেবোত্তমঃ
সুচিরুচির প্রসন্ন গন্ধোদকৈর্ব্বিস্নপী বিনায়কম্।

ললিতবিস্তর, ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ, ১০৬ পৃষ্ঠা। আমরা গণেশকে এবং গুরুকে বিনায়ক বলি, বৌদ্ধরা বুদ্ধকেই বিনায়ক বলেন।

বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বোধিদ্রুম। গৌতম অর্থাৎ শাক্যসিংহের পূর্ব্বে ২৪ জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পরে মিত্তেয় (মৈত্রেয়) নামে এক মহাপুরুষ বুদ্ধ হইবেন।

শকাব্দা প্রারম্ভের ৭০১ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মঙ্গলবারে শাক্যসিংহ কপিলবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন ললিতবিস্তর গ্রন্থে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু বস্তুত তিনি সামান্য রাজা ছিলেন বোধ হয়। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থোক্ত অনেক সসাগরা ধরণীর অধিপতির রাজ্য কুচবিহার অপেক্ষা বড় বিস্তৃত ছিল না। রাজা দশরথ প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র বনবাসিত হইয়া প্রথম রাত্রি তমসাতীরে থাকিয়া, পরদিন বেদশ্রুতি পার হইলেন। তাহার পরদিন কোশলের অন্ত্যসীমা অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র দ্রুতগামী রথারোহণে বনগমন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অযোধ্যাকাণ্ডের ৪৮,৪৯ এবং ৫০ সর্গ পাঠ করিলে, তাঁহার পিতার কোশল রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রতীত হয় না। শুদ্ধোদন দূরে থাকুন, ভারত, রঘু, যুধিষ্ঠির ও অশোক ব্যতীত কেহই ভারতবর্ষে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

পুরাকালে মহাসমারোহে লাঙ্গলোৎসব হইত। উৎসবের দিন রাজা স্বহস্তে হল ধারণ করিতেন। কথিত আছে যে শুদ্ধোদন রাজা বালশাক্যকে উৎসব দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। শিশু নিরাধার আকাশমার্গে উঠিয়া আপন অতিমানুষী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই অলৌকিক ক্রিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের রচনা মাত্র। কৈশোর গতে যশোধরা গোপা নাম্নী একটি রূপসীর সহিত শাক্যের বিবাহ হইল; শাক্য কিছুকাল আমোদ প্রমোদে রত রহিলেন। পরে একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, একজন কুষ্ঠ-রোগী, একটি শব ও একজন সন্যাসী দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল এবং তিনি তপস্বী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। শাক্যের রাহুল নামে একটি পুত্র জন্মিবার পর আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে, তিনি গৃহত্যাগী হইলেন। কয়েকটি তাপস ও তাপসীর আশ্রম দর্শন করিয়া এবং বৈশালী নগরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া, তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র আনন্দ ছিলেন। পরে এই আনন্দ শাক্যের একজন প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। রাজগৃহ

এক্ষণে বিহার প্রদেশে রাজগির নামে খ্যাত। নগরে প্রবেশ করিলে, নগরবাসীরা তাঁহার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, 'ইনি কি অনঙ্গ? তবে ইহাঁর শরীরে মহেশ্বরের কোপানলের চিহ্ন কেন নাই?' কেহ বলিল, 'ইনি কি শক্র? তবে ইহার সহস্র লোচন কোথায়?' পুরবাসীরা মগধরাজ বিম্বসারের নিকট গিয়া কহিল, যে একটি অদ্ভুত পুরুষ আসিয়াছে; সে যক্ষ কি দেব, ব্রহ্মা কি বিষ্ণু, তাহা কেহই বলিতে পারে না। রাজা শাক্যকে তাপসব্রত হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শাক্যসিংহ উরুবিল্ব বা উরুবেলার অরণ্যে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এমন কঠোর তপস্যা করিলেন, যে নিকটবর্ত্তী জনপদ বাসীরা মনে করিল যে অনশনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে। ঐ সময়ে সুজাতা নাম্নী একটি ভদ্রকুলোদ্ভবা রমণী * তাঁহার নিমিত্ত পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাওয়াইতেন; নতুবা শাক্য নিশ্চয় কালগ্রাসে পতিত হইতেন। শাক্য এমন কঠোর তপস্যাতেও সিদ্ধার্থ হইতে পারিলেন না, অর্থাৎ তাঁহার বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। পরে অনশন ব্রত ত্যাগ করিয়া নদীতীরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে নূতন প্রণালীতে পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে লাগিলেন। শাক্যের পরম শত্রু বশবর্ত্তী মার নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল এবং তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে যত্নবান্ রহিল। 'মার' যে কে, ইহা নিরূপণ করা সুকঠিন। পণ্ডিতরত্ন মূলর বলেন 'মার' পাপ-প্রবৃত্তি-দাতা (tempter); অর্থাৎ যে অর্থে য়িহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ 'সয়তান্' শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রায় সেই অর্থে বৌদ্ধরা 'মার' শব্দ প্রয়োগ কবিয়া থাকেন। বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ বলেন "মার" কন্দর্পের একটি নাম। অমর সিংহের ব্যাখ্যাই ঠিক্ বোধ হয়; কারণ ললিত বিস্তরে লিখিত আছে যে মার আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন,—

"কামেশ্বরোঽস্মি বসিতা ইহ সর্ব্বলোকে
দেবাশ্চদানবগণা মনুজাশ্চতীর্য্যা।"

মারকে জয় করিয়া শাক্য মারজিৎ নামে খ্যাত হইলেন। যুবা তাপসের পক্ষে ক্রোধ লোভাদি জয় অপেক্ষা কামজয় অধিকতর দুরূহ ব্যাপার।

* দয়াই রমণীকুলের পরম রমণীয় গুণ। কঠোরতপা শাক্যের শীর্ণ ও বিবর্ণ কলেবর দেখিয়া কৃষক ও গোপবালকেরা বিদ্রূপ করিত। সুজাতা ও তাঁহার কয়টি সঙ্গিনী তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

এজন্যই পুরাণে লিখিত আছে যে যোগীন্দ্র মহাদেব কর্ত্তৃক তাপসারি কামদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, এবং মেনকা অপ্সরা মহাতপা বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন পুরাণের রচয়িতা মানব প্রকৃতি কেমন বুঝিতেন। বুদ্ধচরিতে মারজয়ের যে উপাখ্যান আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে শাক্যসিংহ অন্যান্য রিপু সহজে বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু কামজয় করিতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। বস্তুত মার যে কোন পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন সে কথা উপকথা মাত্র। পরিশেষে শাক্য তপস্যাবলে এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে সমুদায় বিষয়প্রবৃত্তি জয় করিয়া, জিন এবং শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করিয়া, বুদ্ধ হইলেন। তাঁহার বয়স তৎকালে ৪০ বৎসরের ন্যূন ছিল। তিনি বারাণসী নগরে গিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী ঋষিপট্টন বিহারে (তাপসাশ্রমে) নির্ব্বাণ মুক্তির মার্গ প্রদর্শনাভিপ্রায়ে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিপট্টনাশ্রমে অনেক মৃগ ছিল; এ জন্য তাহার একটি নাম মৃগদাব। এক্ষণে তাহা শারনাথ নামে খ্যাত। ঐ স্থানের বিহারের প্রস্তরময় ভগ্নাবশেষ কাশী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এমন চিন্তাশীল শিক্ষিত হিন্দু কেহই নাই, যাঁহার হৃদয়ে ঐ আশ্রমচিহ্ন দেখিয়া দুঃখের সঞ্চার না হয়। ঐ স্থলে আর্য্যকুল চূড়ামণি বুদ্ধ আপন অক্ষয় কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। আমরাও সেই আর্য্য বংশোদ্ভব; কিন্তু আমরা প্রকৃত ধর্ম্মভ্রষ্ট, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভ্রষ্ট, স্বাধীনতাভ্রষ্ট ও পৌরুষভ্রষ্ট হইয়া পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছি। কে আমাদিগকে শাক্যের ন্যায় শিখাইবে যে প্রকৃত ধর্ম্ম হৃদয়গত, তাহা মুখগত বা আচারগত নহে? শাক্য ৪০ বৎসরের অধিক কাল ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। ধর্ম্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রাবস্তি প্রদেশে জেত বন বিহারেই অধিক কাল অবস্থিতি করিতেন। কোসম্বী প্রদেশে কোসম্বী নগরে ও ঘোষিতরাম বিহারে, মগধ প্রদেশে রাজগৃহ নগরে ও বেণুবন বিহারে এবং বৈশালী প্রদেশে কুশী নগরেও ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। মহাবংশ নামে সিংহলের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভগবান গৌতম বুদ্ধ দুইবার সিংহলে গিয়াছিলেন; একবার সুমানকূট (আদমগিরি) পর্ব্বতে, আর একবার যক্ষ রাজধানী কল্যাণী নগরে। কিন্তু ভারতবর্ষ, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ বা চীনের

কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে মহাবংশোক্ত সিংহলযাত্রার প্রমাণ নাই। শাক্যের যখন অশীতি বর্ষ বয়স তখন তিনি সশিষ্য কুশী নগরে যাত্রা করিতেছিলেন পথশ্রান্ত হইয়া তিনি একটি আম্রকাননে বিশ্রাম করিলেন। উপবনস্বামী চণ্ড তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। শাক্য বরাহমাংস ভক্ষণ করিয়া উদরাময় রোগগ্রস্ত হইলেন। সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইল। শাক্য এমন মহাত্মা ছিলেন, যে তাঁহার মতবিরোধী হিন্দুরাও তাঁহাকে পুরুষোত্তম এবং ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মান্য করেন। (৩) স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া অসুর এবং পাষণ্ডদিগের নিপাত জন্য কাশী ধামে মোহধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রভাবে দেবতারা কাশীত্যাগ করিলেন। মনোনিবৃত্তি ব্যতীত শান্তি নাই; ধর্ম্ম মনোগত, আচারগত নহে; কেবল বর্ণবিশেষের ধর্ম্মাধিকার নাই, মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্মাধিকার আছে; এই সমস্ত শিক্ষা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ, মোহধর্ম্মের শিক্ষা নহে। স্কন্দ পুরাণের রচয়িতা ভ্রম জ্ঞানে পতিত হইয়াছেন। লোকপাল বিষ্ণু পাষণ্ডদিগকে ধর্ম্মপথে না আনিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিলেন, এমন কথা বলিয়া পুরাণকার বিষ্ণুর অবমাননা করিয়াছেন। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। নিরীশ্বরতা যে গুরুতর দোষ তাহাব সন্দেহ নাই; কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সর্ব্বত্রেই লোকে মুখে ঈশ্বরের নাম লইয়া কার্য্যদ্বারা আপনাদের নিরীশ্বভাব পরিচয় দেয়। যে সমস্ত আর্য্য ঋষিগণ উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম, উপধর্ম্ম হইয়া পড়িল। জনসাধারণের বিশ্বাস হইল যে, দেবতা বিশেষের নামোচ্চারণ, তীর্থ বিশেষ দর্শন, নদী বিশেষে অবগাহন প্রভৃতি উপায়দ্বারা পাপমুক্ত হইবে। এই সময়ে শাক্যসিংহ আবির্ভূত হইয়া লোক সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে ধর্ম্ম সঞ্চয় জন্য মনকে নিবৃত্ত ও পবিত্র করিতে হইবে, কেবল আচারে ও বাহ্যাড়ম্বরে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না, আর কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধাচার অনেক সময়ে ধর্ম্মের সহায় হইয়া থাকে কিন্তু শুদ্ধাচার ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম হৃদয়ের ধন। তাহা বাহ্য ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ পৃথক পৃথক পদার্থ। এই সমস্ত উপদেশে এমন নূতন কথা কিছুই নাই, যাহা আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। তথাপি বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য,

চৈতন্য, নানক, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; নতুবা হৃদয়গত সনাতন ধর্ম্ম, মুখগত এবং আচারগত উপধর্ম্মে পরিণত হয়। জন সাধারণের চৈতন্যোদয় জন্য অনেক সময়ে পুরাতন কথা নূতন করিয়া বলিতে হয়।

শাক্য এক সময়ে প্রাচীন মার্গের দোষ দিয়া বলিয়াছিলেন—

'অজ্ঞান পূর্ব্বং কুতপঃ ঋষিভিঃ প্রতপ্তম্
ক্রোধাভিভূতমতিভির্দিবলোককামৈঃ।
তে তত্ত্বতোঽর্থরহিতাঃ পুরুষং বদন্তি
ব্যাপিং প্রদেশগতং শাশ্বতমাহুরেকে।
মূর্ত্তমমূর্ত্তমগুণং গুণিনং তথৈব
কর্ত্তা নকর্ত্তা ইতি চাপাপরে ব্রুবন্তি।'

প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেই যে কুতপা ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্বামিত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া বশিষ্ঠের এবং আপন সন্তানদিগের যাবপরনাই অনিষ্ট করিলেন। দুর্ব্বাসা অতি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজ হইতে অতি সামান্য মানুষ পর্য্যন্ত সকলকেই অভিশাপ দিতেন। জমদগ্নি রোষপরবশ হইয়া স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন এবং আপন পুত্রকে মাতৃহন্তা করিলেন। বুদ্ধ এই সকল ঋষিদিগকে কুতপা বলিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন; কারণ যাঁহারা ক্রোধ বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাপস নামের অধিকারী নহেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির দোষে সকলকে কুতপা বলা অন্যায়। রত্নাকর মহাপাপী ছিলেন, তপোবলে ধার্ম্মিক চূড়ামণি বাল্মীকি হইলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাতপা অনেক ঋষি আর্য্যভূমিকে পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছিলেন। নন্দনকাননশোভিত, গন্ধর্ব্বগীতনিনাদিত, অপ্সরাসেবিত স্বর্গকামনা তাপসের উচিত নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া কি মোক্ষ কামনা, পরমাত্মায় লীন হওয়ার কামনা দূষণীয়? যখন শাক্য মুনি তপস্যারম্ভ করিলেন, তখন কি তাঁহার নির্ব্বাণ মার্গ জানিবার কামনা ছিল না? কোন কোন ঋষি ঈশ্বরকে মূর্ত্তিমান ও সগুণ বলিয়াছেন, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে অমূর্ত্ত ও নির্গুণ বলিয়াছেন, বলিয়া বুদ্ধ স্থির করিলেন যে ঈশ্বরের বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি না; অতএব যে তাপস তাঁহার ধ্যান করে সে কুতপা। তিনি এইরূপে অজ্ঞেয়বাদের * সৃষ্টি করি-

* Agnosticism.

লেন এবং কোমৎ, মিল ও স্পেন্সারের আদিগুরু হইলেন। অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষও ভ্রমে পতিত হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধরা পরলোক মানে না। এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। বৌদ্ধমতে পাপী নিরয়ে, পশুলোকে, প্রেতলোকে, অথবা অসুরলোকে দুঃখভোগ করিয়া পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। পুণ্যবান-ব্যক্তিরা তুষিতাদি ছয় প্রকার দেবলোকে, ধ্যানাদি ষোড়শ প্রকার ব্রহ্মলোকে, অথবা চারি প্রকার অরূপ ব্রহ্মলোকে বাস করে; কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্ত না হইলে তাহাদের মর্ত্ত্যে পুনর্জ্জন্ম হয়। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ যে কি, তাহার নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। অমাদের মতে পরমাত্মায় জীবাত্মা লীন হইলে জীবাত্মা নির্ব্বাণমুক্ত হয়; কিন্তু যাহারা পরমাত্মা মানে না তাহাদের নির্ব্বাণমুক্ত কি? অভিধর্ম্মমতে নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব; কিন্তু ধর্ম্মপদের রচয়িতার মতে নির্ব্বাণ পরম শান্তি, অর্থাৎ যে অবস্থায় অস্তিত্ব মাত্র থাকে, কিন্তু চিন্তা, বাসনা ও সুখদুঃখানুভূতি থাকে না। পণ্ডিতবর মূলর বলেন, শেষোক্ত মতই শাক্য মুনির মত। তবে জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন যে, নির্গুণ অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে কিছুই ভেদ নাই। পুনর্জ্জন্ম-জনিত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্দেশ্য। সুত্তপিটকে লিখিত আছে যে গৌতম পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অমরাবতী নগরে ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন, মধ্য-দেশে চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, নাগরাজ ছিলেন, পশুরাজ সিংহ ছিলেন, যক্ষ-রাজ ছিলেন, রমাবতী নগরে ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইত্যাদি। দশরথজাতক নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যে বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ছিলেন। ললিতবিস্তরের রচয়িতা বলেন যে শাক্য মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব * অবস্থায় তুষিতলোকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বৌদ্ধরা যে কেবল পরলোক মানে এমন নহে; তাহারা সাধারণ হিন্দুদের ন্যায় জীবাত্মার দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমণ মানে।

---

* যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রাপ্ত হইবার কতক পরিমাণে উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে বোধিসত্ত্ব বলে।

কাশীস্তোত্র।

জয় জয় কাশী অর্দ্ধচন্দ্রকায়, বেণী সুসজ্জিত অসি বরণায়।
পদতলে শোভে সুরধুনী ধার, কটিদেশে কোটি সোপানের হার।
নবদিবাকর-কিরণ-মালা, মন্দির-মুকুট-দেউলে-ঢালা।
দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী॥

জ্ঞানতত্ত্বময় পুরাণের ক্ষেত্র, চির-উন্মীলিত জগতের নেত্র।
আর্য্যহৃদিগত-মাধুরীতে ভরা, ত্রিযুগব্যাপক স্রোত ধারা-ধরা।
ভুবন-সংক্ষেপ ভারত-সার, ধরাতে সুধন্য মহিমা যার।
পুণ্যাত্মা পাপীতে যার প্রত্যাশী। জয় অন্নপূর্ণাপুরী জয় কাশী॥

জয় অন্নপূর্ণা আনন্দ-অবনী, ইহ-পরকাল-দারিদ্র্য-দাশিনী।
হিন্দুহৃদিক্ষেত্র-উৎসাহের গতি, ব্রত-দান-ধর্ম্মে নিত্য স্রোতবতী।
ধনিক ধার্ম্মিক ধীরাজগণ, দেহে মিশাইতে করে আকিঞ্চন।
না থাকে পরশে পাতকরাশি। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী॥

জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী।
শিবমোক্ষপুরী পরমার্থধাম, ধরাধন্য ভূমি ত্রিভুবনে নাম।
ধনী জ্ঞানী মূঢ়ে নাহি যাহে ভেদ, কোলে এসে যার সবে ভুলে খেদ।
সদা সুখময় মহাশ্মশান, মরিলে মোক্ষ তখনি দান।
ভব যার ভাবে সদা উল্লাসী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী॥

সর্ব্ববিদ্যা, কলা, শাস্ত্র, দরশন, চিরদিন যার দেহের ভূষণ।
অতুল্য ভুবন এ মহীমণ্ডলে, জ্ঞানের কৌস্তুভ-মণি-বক্ষস্থলে।
জগতের চক্ষে জ্যোতিদায়িনী, যোগী-মহর্ষি-মানস-জননী।
ভারতের ফুল্ল প্রতিভাময়। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় জয়।

ত্রিপাতকতারা পুনর্জ্জন্মহরা, ক্ষিতি মোক্ষক্ষেত্র একদেহেধরা।
যার কোলে মিশে শূকর ব্রাহ্মণ পূর্ণদেহে ব্রহ্মহৃদে সংস্থাপন।
জীবাত্মা ঈশ্বরে যুগল যায়, শিবময়পুরী ধরণী-গায়।
ভারতভুবন যার বিলাসী। জয় কাশি জয়, জয় বারাণসী॥

জয় কাশী জয়, জয় বারাণসী॥

মহামহাপ্রাণ জীবগণ যায়, দিন-অনুদিন মিশাইছে কায়।
চির প্রজ্জলিত মহাপ্রাণশিখা, যার প্রতিরেণু-বেণুভাগে লিখা।
যে ভূমি অমৃতমন্দির সার, অনাদি অনন্ত প্রভাব যার।
মোক্ষতীর্থচূড়া ভুবন কাশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী॥

মহাশবক্ষেত্র-মহী-ধরাতলে, এ মহিমা কোথা কার অঙ্গে জ্বলে?
কোথা মৃতদেহে দিয়ে পুষ্পজল, পূজা করে তারে মানবমণ্ডল।
অন্তরে যাহার অন্তর্জলি ছেদ, দেহমুক্ত জীব শিবে অভেদ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাপহারিণী। জয় জয় বিশ্বজীব-নিস্তারিণী॥

জয় মোহহরা চৈতন্যধারিণী, জ্ঞানদা সুখদা মোক্ষবিধায়িনী।
বক্ষস্থলে যার ত্রিকোটী অমর, অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ জাগে নিরন্তর।
জগত-জননী অন্নদা আপনি, যেখানে খুলেছে আনন্দ-বিপণি।
পূর্ণব্রহ্মরূপ যাহে বিদ্যমান, শিব যেথা জীবে দেন আত্মদান।
আনন্দ যাহার সচ্চিতের হাসি। মহাকালপুরী জয় জয় কাশী
জয় কাশী জয়। জয় বারাণসী॥

মর্ম্মকথা।

২।

অতীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কাল সহকারে জিতজাতির তিন প্রকার মাত্র পরিণাম সম্ভব হইতে পারে।

প্রথমত, জিত জাতির একেবারে সমূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। যখন জেতা ও জিতজাতির মধ্যে সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ থাকে, যখন জিত জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল থাকে, যখন অসভ্য জিতজাতি,—স্থিতিশীলতা বশত তাহাদের চিরন্তন প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অধিকতর আস্থা ও পক্ষপাতিতা জন্যই হউক—অথবা প্রকৃতিগত প্রভেদবশত জেতৃ-জাতির উন্নত ও পরিবর্দ্ধমান অবস্থা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াই হউক—অথবা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব দৃঢ়ীভূত থাকা বশতই হউক,—স্বীয় অবস্থার

উন্নতির দ্বারা জেতার সমকক্ষ হইতে না পারে, তখন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিণামে তাহারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হিস্পানিগণ যখন সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা জয় করেন, তখন অসভ্য আমেরিকানগণ উৎপীড়িত, নিহত ও ক্রমে ধ্বংশ হইয়াছিল। কথিত আছে, স্পেন সেনাপতি কর্টেজ একা মেক্সিকো জয়ের সময় প্রায় চল্লিশ লক্ষ মেক্সিকোবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। পেরু, ব্রেজিল ও আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জ জয়ের সময় পিজারো প্রভৃতি সেনাপতিগণও অসংখ্য অসভ্য ইণ্ডিয়ানদিগকে তরবারি মুখে অর্পিত করিয়াছিল। কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণ যদি এই হতভাগ্য দিগকে এত উৎপীড়িত ও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট না করিত, তাহা হইলেও সভ্য জাতির সহিত সমকক্ষ হইতে না পারিয়া প্রকৃতির কঠোর নিয়মানুসারে তাহারা পরিণামে ধ্বংশ হইয়া যাইত। কালের পরিবর্ত্তনে অনুন্নত ও নিজ নিজ উদরান্ন পর্য্যন্ত আহরণে অসমর্থ জাতি গুলির ধ্বংশ হইবে, নতুবা তাহারা অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নত ও অন্যান্য সন্নিহিত সভ্যজাতির সমকক্ষ হইবে,—ইহাই প্রাকৃত নিয়ম। এইরূপে আর্য্যপিতৃগণ সর্ব্ব প্রথমে এ দেশে আসিলে এতদ্দেশীয় আদিম অসভ্যজাতি সকল তাড়িত ও প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজাধিকারে কেপকলনি হইতে অসভ্য জুলু প্রভৃতি জাতিরা তাড়িত ও ধ্বংশ হইতেছে। এই নিয়মানুসারে সাক্ষণদিগের অধিকারে অসভ্য ব্রিটন জাতি কতকপরিমাণে বিনষ্ট ও পার্ব্বত্য-প্রদেশে তাড়িত হইয়াছিল।

জিতজাতির উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবার আর একটি কারণ আছে। যখন অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি কোন দেশ আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া লয়, তখন তাহারা আপনাদের স্বীয় অধিকার ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং আপনাদের অপেক্ষা উন্নত জাতির সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার জন্য প্রায়ই জিতজাতিকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে। প্রাচীনকালের মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, সে সময়ে যুদ্ধে পরাজয় হইলে বিজিত জাতি প্রায়ই ধ্বংশ হইত। তখন পাশব বলই সমাজের নিয়ন্তা ছিল। পাশববলের দ্বারা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সভ্যজাতি পরাভূত হইলে প্রায়ই সেই সভ্যজাতিকে বিনষ্ট হইতে হইত। পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই কত উন্নত, কত সভ্য জাতি এই প্রকারে একেবারে ধ্বংশ হইয়া কেবল নামমাত্রাবশেষ হইয়াছে। এইরূপে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ, হুন্ প্রভৃতি

জাতির পাশব বলে ছিন্নভিন্ন ও উৎসন্ন হইয়াছিল। এই নিয়মানুসারে প্রাচীন গ্রীসের অধঃপতন ও ধ্বংশ হইয়াছে। এইরূপ, অসভ্য বর্ব্বর জাতির আসুরিক আক্রমণে প্রাচীন মৈশরী, টায়রিয়, সিডনী, ফিনিসিয় প্রভৃতি মহাসমৃদ্ধিশালী জাতিরা ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কার্থেজও এই-রূপে রোমের পাশব বলের নিকট নতশির ও সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পাশববলও আবার কখন কখন উন্নত ও অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ বিস্তীর্ণ জাতিকে একেবারে ধ্বংশ করিতে পারে না। যখন জগদ্বিজয়ী অসভ্য জেঙ্গিস্ খাঁ চীনদেশ অধিকার করিয়া লন, তখন সভ্যতর চীন জেঙ্গিস্ খাঁর দোর্দ্দণ্ড পাশববলেও বিনষ্ট হয় নাই। তাহার সামাজিক সংগঠন দৃঢ়তর ছিল ও তাহার অন্তর্ভূত শক্তিও প্রবলতর ছিল, সেই জন্যই দুইশত বৎসর পরেও আবার সেই চীন তুর্কদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অধুনা মনুষ্য সামাজের উন্নতি ও মানবজাতির সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত সামান্য পাশববলের আধিপত্য একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে অসভ্যজাতির দ্বারা সভ্যতর সম্প্রদায়ের বিনাশ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ সভ্যতর ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা অসভ্য আমেরিকানদিগের যেমন বিনাশ হইয়াছিল, আধুনিক উন্নত সমাজ সংগঠনে সেরূপ পাশববলের দ্বারা অসভ্যজাতির উচ্ছেদ সম্ভব নহে। এক্ষণে কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাকৃত নিয়মানুসারে জাতি বিশেষের বিলোপই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

এই প্রকারে অসভ্য জাতির বিনাশ সম্বন্ধে আর একটি কথা এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এক্ষণে সভ্যতার উন্নতির সহিত সভ্য দেশগুলির লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই জন্যই ইতর শ্রমজীবিদিগের অন্নাভাবে বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞ রাজনীতিকগণের মতে উপনিবেশ সংস্থাপন ব্যতীত জনবৃদ্ধি স্রোত হ্রাস করিবার ও দেশের সাধারণ লোকদিগের অবস্থা উন্নত করিবার কোন উপায়ান্তর না থাকায়, সেই সকল ঘনসন্নিবিষ্ট জনপদ হইতে ক্রমে ক্রমে অসভ্য অল্প জনপূর্ণ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে। এইরূপে অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্, কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে। কালসহকারে সম্ভবত সমস্ত অসভ্য দেশগুলি এইরূপে সভ্য জাতির উপনিবেশ দ্বারা পূর্ণ হইবে। তখন সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অসভ্য জাতির অস্তিত্ব অধিক দিন সম্ভব হইবে না। তখন যদিও অসভ্য জাতি সভ্য জাতির সামান্য পাশববল দ্বারা বিনষ্ট হইবে না, তথাপি তাহারা উন্নত

হইতে না পারিলেও ক্রমে নিজ উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ হইলে কিছুদিন পরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে, আমেরিকার ইউ-নাইটেডষ্টেটে একটিও ইউরোপীয় ছিল না—সমস্ত দেশই অসভ্য আমেরিকান-দিগের আবাস স্থান ছিল; কিন্তু তথায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির উপনিবেশ সংস্থাপিত হওয়ায় আদিম অধিবাসীগণ অনেকে যুদ্ধে হত ও অধিকাংশ ক্রমে ক্রমে দেশ ত্যাগ করিয়া ঘোর অরণ্যানী আশ্রয় লইয়া পরিশেষে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, আণ্ডামান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য জাতির কাল-সহকারে এই পরিণাম হইবারই সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত—জেতা ও জিত উভয় জাতি কালক্রমে মিলিত হইয়া এক নূতন জাতিতে পরিণত হয়। যেখানে জেতা ও জিত জাতি মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প থাকে অথবা বিজিত দেশ ও বিজেতার স্বদেশ মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ অধিক না থাকে—অথবা অপার সমুদ্র বা অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতাদি দুই দেশকে পরস্পর বিভক্ত না করে—অথবা যেখানে জেতৃজাতি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া জিত দেশে আসিয়া বাস করে ও সেই দেশকে কাল সহকারে আপনা-দের জন্মভূমি মনে করে—অথবা জেতা ও জিত জাতির মধ্যে জাতিগত বা প্রকৃতিগত বৈষম্য বা বিদ্বেষভাব অধিক না থাকে—তাহা হইলে পরিণামে এই দুই জাতি মিলিত হইয়া এক স্বতন্ত্র অভিনব জাতির উৎপত্তি হয়। যখন নরমানেরা সাক্ষণ ইংলণ্ডকে প্রথম জয় করে তখন নরমান ও সাক্ষণদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল,ক্রমে নরমানদিগের স্বদেশ নর্ম্মাণ্ডি হস্তান্তর হওয়ায় ইংলণ্ডই তাহাদের স্বদেশ হইল ও অতি অল্প দিনে নরমান ও সাক্ষণ জাতি সংমিলিত হইয়া ইংরাজ জাতির উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে ফ্রান্সের গল বা কেল্টিক জাতি যথেষ্ট উন্নত ছিল; কিন্তু অধিকতর সভ্য রোম তাহাদিগকে পরাজয় করিলে উভয় জাতির সম্মিলনে তাহাদের ভাষা পর্য্যন্ত লাটিন হইয়া-ছিল। তৎপরে ফ্রাঙ্ক জাতি আবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলে ক্রমে তাহাদের সহিত ফ্রাঙ্ক জাতি মিলিত হওয়াতে ফরাসি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ সারাসেনগণ মহম্মদের মৃত্যুর পর মরক্কো দেশ হইতে তাতারের সীমান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করে এবং ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা সেই সমস্ত দেশের আদিম জাতির সহিত মিলিয়া যায়। তাহাদের তিন চারি শত বর্ষ রাজত্বের পর আবার তুর্কীরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে উভয় জাতির একরূপ সম্মিলন

হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর হইল, ইয়ুরোপের পোলণ্ড দেশকে রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও প্রুষিয়া, বিভক্ত করিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র পোলণ্ডের রীতি নীতি সমস্তই বিজেতাদের মত। পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কারণেই পোলণ্ড বিজেতাদের সহিত এক হইয়া যাইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

জেতা ও জিত উভয় জাতির এই প্রকার সম্মিলনের সাধারণ নিয়ম এই যে, যে জাতির সামাজিক সংগঠন দৃঢ়তর, যাহাদের অন্তর্ভূত শক্তি অধিকতর, এবং যাহারা বিস্তারে ও লোক সংখ্যায় বৃহত্তর, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শিথিল-বন্ধন সমাজকে আকর্ষণ করিয়া লয়। সুতরাং অবস্থা বিশেষে কখন জেতা কখন বা জিত জাতি আসিয়া অপরের সহিত মিলিত হয়। তবে মিলনের সময় জেতা জাতিকে কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া—কতকটা অবনত হইয়া জিত জাতির সহিত মিলিতে হয়, নতুবা জিত জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি দ্বারা অথবা যেরূপে হউক জেতার সমতুল্য হইলেও জেতার সহিত মিলিতে সাহস করে না। নর্‌মান সাক্ষণদিগের মধ্যে নর্‌মানরাই সাক্ষণদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, জেতৃজাতির দ্বারা বিজিত জাতি কতক পরিমাণে ধ্বংশ হয় ও যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহারা অল্পে অল্পে উন্নত হইয়া সভ্য জাতির সহিত মিলিত ও তাহাদের সহিত এক জাতিভুক্ত হইয়া যায়। কারণ, কতক পরিমাণে ধ্বংশ হওয়ায় জিত জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে এবং উপায়ান্তর না থাকায় ক্রমে ক্রমে বিজেতার সহিত মিশিয়া গিয়া অন্তত তাহাদের সমাজের নিম্নস্তরভুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের আর্য্যপিতৃগণ এদেশীয় আদিম জাতিদিগকে তাড়িত করিয়াও একেবারে ধ্বংশ করিতে পারেন নাই। অনার্য্যগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঘৃণিত শূদ্রভাবে থাকিয়াও কালসহকারে আর্য্য জাতির সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উভয়ের রীতিনীতি ও ধর্ম্ম এক হইয়া গিয়াছে। সচরাচর জেতা ও জিত উভয় জাতি এইরূপেই পরস্পরের সহিত সংমিলিত হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়ত—কাল সহকারে জিত জাতি উন্নত হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা পুনর্লাভ করে—যখন জিতজাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতির দ্বারা জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে—যখন তাহারা নিজ বাহুবলে অন্য জাতি হইতে

আত্মরক্ষা করিয়া নিজ স্বাধীনতা বজায় করিবে—তখন নিজ বীর্য্য বলেই হউক, অথবা অন্য জাতির সহায়তা লাভেই হউক, অথবা জেতার উদারতা জন্য তাহাদের সাহায্যেই হউক, তাহারা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইবে। অধীনতা মাত্রেই—মনের স্বাভাবিক গতি, আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায়, ও আমাদের অভিপ্সিত কার্য্যে বাধা দেয়। সুতরাং মনুষ্যের বৈষয়িক উন্নতির সহিত মনের যে স্ফূর্ত্তি হয় ও তাহার সহিত ক্রমবর্দ্ধিত অভাব পূরণের যে ইচ্ছা হয় অধীনতাই তাহার অন্তরায়। অতএব যখন জিতজাতি উন্নত হইয়া জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে তখন কখনই এরূপ অধীনতা সহিবে না। পর্ব্বতে স্রোতস্বতীর বেগ রোধ হইলে কিছুপরে উহা সহস্র গুণ বেগে পর্ব্বত উলঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হয়; কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থকে চাপ দিলে তাহা ক্রমে সঙ্কুচিত হয় বটে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অপ্রতিহত বেগে বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্ব বিস্তৃতি পুনর্লাভ করে। সেইরূপ জিতজাতি অধীনতার পেষণে প্রথমে সঙ্কুচিত হয় বটে,কিন্তু দশ বৎসর পরেই হউক অথবা সহস্র বৎসর পরেই হউক তাহাদের নষ্ট স্বাধীনতা অবশ্যই পুনরুদ্ধার করিবে। পূর্ব্বে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ্ হুন্ প্রভৃতি জাতি দ্বারা ধ্বংশ হইয়াছিল, তথাপি রোমের যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল—প্রচ্ছন্নভাবে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল,—তাহাতেই রোম ধ্বংশ হইয়াও আবার রক্তবীজের মত পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া সেদিন পর্য্যন্তও সমস্ত আধ্যাত্মিক ইয়ুরোপের অভিনেতা হইয়াছিল। তাহার পর অতি অল্প দিন হইল গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্সিনি, কাবুর প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষদিগের যত্ন, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ জন্য ইটালী এক্ষণে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এইরূপে গ্রীকেরা তুর্কীদের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়াছে। স্পেন দেশ নবম শতাব্দীতে আফ্রিকাবাসী মূর জাতির অধীনস্থ হয় এবং আট শত বৎসর ক্রমাগত তাহাদের অধীন থাকিয়া, তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফার্দিনান্ডের রাজত্ব কালে মূরদিগকে একেবারে দূরীভূত করিয়াছে। একদিন সুইজারলণ্ডও অষ্ট্রীয়ার ভীষণ পদাঘাত সহ্য করিয়াছিল—কিন্তু উইলিয়ম টেলের বীর্য্যবলে তাহার সে হীনাবস্থা অধিক দিন থাকে নাই। এইরূপে রুসিয়ার রুমিলিয়া তুর্কীদের অধীনে থাকিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়াছে। সুইডেন অনেক দিন পরাধীনতার পরে ডেন্‌দিগের হস্ত হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে গষ্টেবস্ বেসারের বীর্য্যবলে স্বাধীন

হইয়াছে। ইংলণ্ডও ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয় এক্ষণে ইয়ুরোপীয় তুরস্কে মুসলমানদিগের অধিকারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বোধ হয়, শীঘ্রই সারভিয়া, ওয়ালেসিয়া প্রভৃতি প্রদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবে, অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় নীতিজ্ঞদিগের এইরূপ বিশ্বাস। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এক জাতি কখন চিরকাল অন্যজাতির অধীন থাকিতে পারে না—ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম। জেতৃজিত ভাব কখন চিরদিন থাকা সম্ভব নহে। জিতজাতি হয় ধ্বংশ হইবে, না হয় জেতার সহিত মিলিত হইয়া এক জাতি হইবে, না হয় পুনর্ব্বার স্বাধীন হইবে—ইহা ব্যতীত তাহাদের আর অন্য পরিণাম নাই।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, হিন্দুজাতির বিনষ্ট হইবার বা জেতৃজাতির সহিত সম্মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব আরবারের কথা আবার বলি, এখন অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে হিন্দুরা আবার স্বাধীন হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব পুনর্ব্বার উদ্ভাসিত করিবেন।

আমরা এই স্থলে প্রসিদ্ধ লেখক আর্থর আর্নল্ডের কয়েকটি সার কথা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের মর্ম্মকথা শেষ করিলাম।

A man may be a very sincere defender of British rule in India, he may have the strongest conviction of the benifits which that rule is conferring and has bestowed, and may yet affirm that British rule cannot be permanent over 200,000,000 of people with whom conditions of climate appear to forbid that the British race should be assimilated.

ARTHUR ARNOLD M. P.
Fortnightly, September 1884.

এক ব্যক্তি অন্তরের সহিত ভারতে বৃটীশ রাজত্বের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন, বৃটিশ শাসনে ভারতের যত উপকার হইয়াছে, বা হইতেছে সেই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস থাকিতে পারে, অথচ সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে পারেন, যে, ভারতের জল বায়ুর অবস্থা যেরূপ তাহাতে বৃটিশ জাতি ভারতবাসীদের সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব; সুতরাং বিশ কোটি ভারতবাসীর উপর বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী না হইবারই সম্ভাবনা।

বৈষ্ণবতত্ত্ব।

প্রকৃতি ও পুরুষ।

প্রকৃত বৈষ্ণব দ্বৈত কি অদ্বৈত বাদী তাহা আমরা আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নহি। তিনি দ্বৈতবাদী হইয়াও অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈত-বাদী হইয়াও দ্বৈতবাদী। তাঁহার দ্বৈতবাদ প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া। তাঁহার অদ্বৈতবাদ সেই প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মতা প্রযুক্ত। যদিও তিনি সর্ব্বতো-ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষবাদী, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায়, ঠিক দুই ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নহে। আমাদের বিষয়-দূষিত-দৃষ্টিতে, এই প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ স্বরূপে অনুভূত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে, উভয়ে এক জাতীয় পদার্থ:—একই আত্মা। লীলার্থে দুই,—বস্তুত এক। "জলেতে যেমন মীন, রসকেলি রাত্রি দিন, দোন তনু নহে ভিন, নিত্য লীলা অকারণ।" আত্মা একই; তন্মধ্যে চিদাধার-স্ত্রী ও চিদংশ পুরুষ।

যখন এই স্ত্রী অংশ ও পুমংশ উভয়ে একত্রে—একাত্মভাবে বিরাজিত থাকে, তখন প্রকৃতির চিদ্গত অবস্থা। আর যখন প্রকৃতির কিয়দংশ পুংসংসর্গ-বিমুখ হইয়া বিকৃত হইতে থাকে, তখন সেই কিয়দংশের চিদ্বিমুখ অবস্থা; আর অবশিষ্টাংশ চিরসংসর্গে অবিকৃত থাকে, তাহার চিদ্গত অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে। পুমংশ কদাপি এরূপ কোন অব-স্থার অধীন নহে।

উপরে যে যুগল তত্ত্ব বর্ণিত হইল, তাহা অদ্বৈত তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। একই পরমাত্মা। তাঁহার একাংশ নিত্য নির্ব্বিকার, অব্যক্ত ও চিৎ-স্বরূপ; তাঁহার অপরাংশ বিকারপ্রবণ অর্থাৎ নির্ব্বিকার অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সবিকার ভাব ধারণ করিতে পারে। তাঁহার একাংশ নিত্য প্রশান্ত, নিত্য সুস্থির, নিত্য অচল; তাঁহার অপরাংশ সেই প্রশান্ত, সুস্থির ও অচল অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তনের স্রোতে আন্দোলিত হইতে এবং অশান্ত, অস্থির ও সচল ভাব ধারণ করিতে পারে। তাঁহার একাংশ সর্ব্বদাই সৃষ্টির অতীত; তাঁহার অপরাংশ সৃষ্টির অতীত প্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া

সৃষ্টির মায়িক লীলায় অঙ্গ ঢালিতে পারে। তাঁহার একাংশ অরূপ ও অব্যক্ত; তাঁহার অপরাংশ সেই অরূপ ও অব্যক্ত ধাম পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে।

বৈষ্ণব এইরূপ অদ্বৈতবাদী হইয়াও এই প্রকৃতি ও পুরুষবাদী। তাঁহার প্রকৃতি চিদ্গত অবস্থায় নিত্য নির্ম্মল পরা প্রকৃতি; তাঁহার পুরুষ সেই নিত্য নির্ম্মল আত্মগত পরা প্রকৃতি বিহারী শুদ্ধ চৈতন্য। সেই নিত্য নির্ম্মল প্রকৃতি স্বভাবত অব্যক্ত, অবিকৃত, নির্গুণ, সর্ব্বদেশ ব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, এক এবং অখণ্ড; সেই পুরুষও নিত্য অব্যক্ত, নিত্য নির্ব্বিকার, নিত্য নির্গুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয়, নিত্য অকাম, নিত্য প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গব্যাপী, নিত্য প্রকৃতিরমণ, নিত্য প্রকৃতিমোহন এক এবং অখণ্ড শুদ্ধ চিৎ। সেই পুরুষ যদিও প্রকৃতিরমণ ও প্রকৃতিমোহন কিন্তু এই রমণ ও মোহন ক্রিয়া কেবল মাত্র সেই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়,—সেই প্রকৃতিকে চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী, চিদানন্দময়ী করে; পুরুষের মধ্যে তাহার লেশ মাত্রও প্রকাশ পায় না,—সেই পুরুষকে তদ্দারা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। তিনি তন্মধ্যে অকাম ও নিষ্ক্রিয় থাকেন। প্রকৃতি এই পুরুষ সহবাসে যখন চিন্মোহিত হইয়া ব্যাপক কাল পরমানন্দ সম্ভোগ করেন, তখন তাহার কিয়দংশ খণ্ড ও স্খলিত হইয়া চিদ্গত অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হয়; পুরুষ এই প্রকৃতি সংসর্গে তাদৃশ বা ঈদৃশ কোন প্রকার বিকারের অধীন নহেন। কিন্তু সে অবস্থায় প্রকৃতির এই যে বিকৃতি, তাহা প্রকৃতির একদেশব্যাপী মাত্র, সর্ব্বদেশব্যাপী নহে। প্রকৃতির যে অংশ যখনই চিদ্গত অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা চিদানন্দময়, প্রেমের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সৃষ্টির মলিন ব্যাপারে পরিণত হইতে থাকে, অবশিষ্টাংশ অখণ্ডিত থাকিয়া, চিদ্গত ও চিন্মোহিত অবস্থায় পুরুষের মধুর সহবাসে চিদানন্দ সম্ভোগ করে। সৃষ্টি ব্যাপারের পূর্ব্বে সমগ্র প্রকৃতি এই চিদ্গত ও চিন্মোহিত অবস্থায় স্বভাবত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পুরুষ সহবাসে নিত্য রাস-মহোৎসব সম্ভোগ করিতে থাকে; সৃষ্টি ব্যাপার সাঙ্গ হইলেও সমগ্র বহির্ম্মুখী প্রকৃতি স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া অবশিষ্টাংশের সঙ্গে অখণ্ডিতরূপে সেই মহোৎসব সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। তখন সমগ্র প্রকৃতি পুরুষের অঙ্গগত—স্বকীয় নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত অঙ্গগত এবং স্বকীয় নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত অকাম রমণে, অকারণ লীলায় বিমোহিত। কিন্তু এই অকাম রমণ, অকারণ লীলা

সমগ্র প্রকৃতি নিত্যকাল সহ্য করিতে পারে না। তাহার কিয়দংশ তদ্দ্বারা যথাসময়ে, কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতই হউক, অথবা স্বকীয় স্বভাব বশতই হউক, সেই চিদ্গত পরম অবস্থা হইতে বিকৃত ও স্খলিত হইয়া, স্বকীয় মালিন্য হেতু চিদ্বিমুখ হইতে থাকে এবং নিত্য লীলাধাম পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টিসাধনে বা সৃষ্টি পোষণে নিয়োজিত হয়। নির্ম্মল প্রশান্ত সমুদ্র যদি প্রবল বায়ুপ্রভাবে, ব্যাপক কাল বিতাড়িত হয়, তখন যেমন রাশি রাশি ফেণা সেই সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্গীরিত হইয়া সমুদ্র-বক্ষ আচ্ছাদন করে, এবং স্বীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, সমুদ্র-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তদুপরি ভাসমান হয়; চিদঙ্গ-বিহারিণী লীলাময়ী প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির প্রথম উপকরণ সামগ্রীর উৎপত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথাসময়ে সেই ফেণরাশি যেরূপ, স্বকীয় মালিন্যভাব ও বিকৃতরূপ সম্বরণ করিয়া তদীয় উপাদান কারণ—সমুদ্রদেহে বিলীন হয়; সেই সৃষ্টিসাধন প্রথম উপকরণ সামগ্রীও যথাসময়ে, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি পরিহার ও স্বকীয় চিদ্বিমুখ ভাব প্রত্যাহার করিয়া তদীয় উপাদান কারণ—পরা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াদি হইতে বর্ত্তমান জগতের সপ্তম উপকরণ সামগ্রী পর্য্যন্ত এইরূপে স্বকীয় উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বকীয় উপাদান কারণে বিলীন হইয়া থাকে।

যে ধামে সৃষ্টি নাই, বিকৃতি নাই, মালিন্য নাই; যে ধামে প্রকৃতি নিরন্তর চিদ্গত, চিন্মোহিত, ও চিদঙ্গ-বিহারী; যে ধামে প্রকৃতি নিত্য চিন্ময়ী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী; যে ধামে চিদানন্দের অকাম, অকারণ, নিত্যলীলার নিত্য সংঘটনা; যে ধামে নিত্য রাস মহোৎসবের কস্মিন্ কালেও বিরাম হয় না; সেই ধামই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধাম—তুরীয়ধাম। এই স্থান তাঁহার প্রকৃতি ও পুরুষের সুগুপ্ত বিলাস ভবন, তাঁহার বহু আদরের বৃন্দাবন ধাম। ব্যোম-পরব্যোমের সুদূর উপরে, বিচিত্রা বিজয়ার সুদূর পর পারে, গোলোক ধামেরও সুদূর উপরে এই পরম বৃন্দাবন ধাম প্রতিষ্ঠিত।

এই পরমধাম-চ্যুত, প্রকৃতির মলিনাংশই সৃষ্টির প্রথম পদার্থ—চিদ্বিমুখ মায়া প্রকৃতি। সাঙ্খ্য ইহাকে মহত্তত্ত্ব নামে উল্লেখ করেন, বেদান্ত ইহার নিত্যত্ব কল্পনা করিয়া লইয়া ইহাকে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মায়া প্রকৃতি পরা প্রকৃতির পরিত্যজ্য মলিনাংশ হইতেই সর্ব্বদা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, এবং স্বকীয় পরিত্যজ্য মলিনাংশ দ্বারা,

তদীয় অধস্তন প্রকৃতি—সৃষ্টির দ্বিতীয় পদার্থকে সৃজন ও পোষণ করিয়া থাকে। পরা প্রকৃতি যতকাল তাহার পরম ধামের চিদ্গত অবস্থা হইতে চিদ্বিমুখ হইতে থাকিবে ততকাল তদীয় অধস্তন মায়া প্রকৃতি পুষ্টি লাভ করিতে থাকিবে। কিন্তু পরমধামস্থ পরা প্রকৃতির এই চিদ্বিমুখ প্রচ্যুতি প্রাপ্তির একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে বা প্রকৃতির স্বভাব বশতঃ পরা প্রকৃতির কিয়দংশ মাত্র চিদ্বিমুখ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; অবশিষ্টাংশ চিদ্বিমুখ বিকৃতির অতীত থাকিয়া নিত্যকাল চিদ্গত অবস্থায়, তাহার পরম ধামে অচ্যুত পদে অব্যাহত থাকে। তখনই তদীয় অধস্তন এই মায়া প্রকৃতির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়। সে তাহার সৃষ্টিসাধক পদার্থ—তাহার দেহের উপজীবিকা আর প্রাপ্ত হয় না।

এই মায়া প্রকৃতি, তাহার চিদ্বিমুখ অবস্থা সত্ত্বেও, চিদঙ্গ-বিহারী। কিন্তু পরা প্রকৃতি তদীয় শুদ্ধ চিদঙ্গে বিহার করিয়া যে প্রকার অঙ্গ-কান্তি ও মাধুর্য্য ভাব লাভ করেন, এই মায়া প্রকৃতি স্বীয় দেহ-মালিন্য হেতু সে প্রকার নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হন না। চিৎ-সত্তার কোন প্রকার রূপান্তর সম্ভাবনা না থাকিলেও আধারানুসারে তদীয় রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। আধারের নৈর্ম্মল্য হেতু চিৎসত্তার নৈর্ম্মল্য, আধারের মালিন্য হেতু চিৎসত্তার মালিন্য কল্পিত হইয়া থাকে। আধার-গুণে জ্যোতিঃ-পদার্থের ঔজ্জ্বল্যও এইরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। তাড়িতে জ্যোতিঃ-পদার্থের যে ঔজ্জ্বল্য কল্পিত হয়, বাষ্পের মালিন্য প্রযুক্ত তাহাতে সে পদার্থের সে ঔজ্জ্বল্য কল্পিত হয় না। চিৎসত্তার বাস্তবিক কোন রূপ নাই, প্রকৃতির নির্ম্মল ও মলিন নানাবিধ রূপেই তাহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি অবিকৃতই থাকুন, আর বিকৃতই হউন; চিদ্গতই থাকুন, আর চিদ্বিমুখই হউন; চিৎসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে। তবে পরা প্রকৃতি স্বীয় স্বরূপের নৈর্ম্মল্য হেতু চিৎ-সংসর্গে যেরূপ শুদ্ধ মাধূর্য্য-ভাব—নির্ম্মল চিদানন্দ ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, মায়া প্রকৃতি তাহার অপেক্ষাকৃত মলিন দেহে চিৎ-সংসর্গে অপেক্ষাকৃত মলিন ভাব ধারণ করিয়া অতুল অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়েন। পরা প্রকৃতির ন্যায় মায়া প্রকৃতিরও লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহাকে গোলোকধাম অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরম ধাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রকৃতি এই ভাবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মায়া প্রকৃতি ও তাহার প্রসূতি পরম ধামস্থ পরা প্রকৃতির ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন;—

স্বকীয় চিদ্গত ও স্বকীয় চিদ্বিমুখ অবস্থা অথবা কেন্দ্রগত ও কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা। মায়া যখন তাহার লীলাধামে থাকিয়া চিৎসংসর্গে অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া, অসীম সন্তোষে কালযাপন করেন এবং সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তির আশ্রয় হইয়া ঈশ্বর অভিমানে অনন্ত তৃপ্তি অনুভব করেন, তখন মায়ার স্বকীয় চিদ্গত বা কেন্দ্রগত অবস্থা। গোলোকধামে মায়ার এই অবস্থা অব্যাহত। এই ধামে সমস্ত মায়িক জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত স্ফূর্ত্তি, সমস্ত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের অসীম বিকাশ। কিন্তু তদীয় চিৎ-সংসর্গে এই ঐশ্বর্য্য ভোগে অসহিষ্ণু হইয়া মায়ার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত মলিন ও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, স্বকীয় চিদ্গত বা কেন্দ্রগত অবস্থা হইতে বিচ্যুত ও অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নির্ম্মল ঐশ্বর্য্যের আস্পদ সেই গোলোকধামে, সেই মলিনাংশের তখন আর স্থান নাই। এই দ্বিতীয় চিদ্বিমুখ প্রকৃতিকে সাঙ্খ্য 'অহংতত্ত্ব', নামে, বেদান্ত 'অবিদ্যা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। গোলোকধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রকৃতি এবার এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় বিচ্যুতি। যেরূপ মায়ার পুষ্টিসাধন পরার মলিনাংশ হইতে, এই অহংতত্ত্বেরও পুষ্টি-সাধন সেইরূপ মায়ার মলিনাংশ হইতে। পরা প্রকৃতির যেরূপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ পরম ধামে নিত্যকাল অব্যাহত থাকে; মায়া প্রকৃতির সেইরূপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ গোলোক ধামে সৃষ্টির প্রলয় পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যার লীলা-ধাম আছে এবং পরা ও মায়ার ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন;—স্বকীয় চিদ্গত বা কেন্দ্রগত এবং স্বকীয় চিদ্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা। পরা ও মায়া যে ভাবে ও যে নিয়মে স্ব স্ব মালিন্য প্রযুক্ত চিদ্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ প্রচ্যুতি প্রাপ্ত হয়, এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা প্রকৃতি অবিকল সেই ভাবে ও সেই নিয়মে স্বধাম হইতে প্রচ্যুত হয় এবং অধস্তন প্রকৃতিকে উপাদান প্রদান করিয়া থাকে। এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও, মায়ার ন্যায় সত্ত্ব-প্রধানা নহে, স্বকীয় মালিন্য হেতু রজঃ ও তমঃ প্রধানা। এই জন্য অজ্ঞান ও ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্টা এবং স্বকীয় মালিন্যের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত বহু প্রকার অবস্থাপন্না। এই অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা স্বকীয় মলিনাংশ দ্বারা পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়ম ও প্রণালীর অনুগত হইয়া যাহাকে উপাদান ও পুষ্টি-প্রদান করিয়া থাকে, তাহাই প্রথম তন্মাত্রা আকাশ। ইহাই চিদ্বিমুখ

প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম। এই আকাশের মালিনাংশ হইতে দ্বিতীয় তন্মাত্রা বায়ু পূর্ব্বানুরূপ উপাদান ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ইহাই চিদ্বি-মুখ প্রকৃতির চতুর্থ পরিণাম। এই বায়ুর মলিনাংশ হইতে তদ্রূপ তৃতীয় তন্মাত্রা তেজ উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির পঞ্চম পরিণাম। এই তেজের মলিনাংশ হইতে তদ্রূপ চতুর্থ তন্মাত্রা জল উৎপত্তি ও পুষ্টি লাভ করে। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির ষষ্ঠ পরিণাম। এই জলের মলি-নাংশ সেইরূপ পঞ্চম বা শেষ তন্মাত্রা ক্ষিতিকে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণ করিয়া অস্তিত্ববান্ করে। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির সপ্তম পরিণাম। এই ক্ষিতি স্বতন্ত্র ভাবে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণে অন্য কোন তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ভূত সৃষ্টির কারণ হয় নাই; কিন্তু অন্য চতুর্ব্বিধ তন্মাত্রার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্থূল ভূত সকল উৎপন্ন করিয়াছে। মায়া স্বকীয় ঐশী শক্তি বলে এই স্থূল পঞ্চ হইতে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সৃজন করিয়া জীব জন্তুর আলয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির অষ্টম বা শেষ পরিণাম। এই জগতের মধ্যে প্রকৃতির নানাবিধ পরিণাম ও বিকৃতি দৃষ্ট হয় কিন্তু এই সকল পরিণাম ও বিকৃতিতে প্রকৃতি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আর চিদ্বিমুখ হয় না। প্রকৃতির চিদ্বিমুখ যাত্রার এখানেই বিরাম হইল।

প্রকৃতি যখন এই অষ্টম বিকৃতির অধীন তখন তাহা চিদন্ধ, তখন তাহার চিৎসত্ত্বার অনুভব যতদূর মন্দীভূত হইবার তাহা হইয়াছে সুতরাং তাহার আর অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ হইবার স্থল নাই। চিৎসংসর্গ হইতে প্রকৃতি স্বীয় মালিন্য হেতু যতদূর দূরস্থিত হইতে পারে তাহা হইয়াছে, সেই চিৎসংসর্গ এখন আর অনুভূত না হওয়াতে তাহার আর অসহ্য নহে; তাহার আর তাহা হইতে মুখ ফিরাইতে হয় না। প্রকৃতি চিদন্ধ হওয়াতে তদীয় চিদ্বিমুখ পরিণাম বন্ধ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে এই অষ্টম বিকৃতিই প্রকৃতির শেষ বিকৃতি। প্রকৃতি এই অষ্টম বিকৃতির অবস্থায় কতকাল অবস্থিত থাকিবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানেন, যে, কোন অনির্দ্দিষ্ট নিয়মের বা স্বভাবের অনুগত হইয়া প্রকৃতি যথা সময়ে চিদভিমুখ অবস্থার অধীন হইবে। স্থূল পঞ্চ, সূক্ষ্ম পঞ্চে লয় পাইবে। ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম চিদভিমুখ আকর্ষণে স্ব স্ব উপাদান কারণে প্রবিষ্ট হইয়া লয় পাইবে। অহংতত্ত্ব বা অবিদ্যা, মহত্তত্ত্ব ও মায়াতে অনুপ্রবেশ করিবে; মায়া পরম ধামে

প্রত্যাগত হইয়া পরার নির্ম্মল অঙ্গে আত্ম বিসর্জ্জন করিবে; পরা পূর্ণাঙ্গে চিদ্গত হইয়া পূর্ব্বানুরূপ চিন্মোহিত ভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে। পরম ধামে প্রকৃতি প্রেমানন্দে আত্মহারা, সুতরাং তখন তাহার পরম শান্তির অবস্থা। সৃষ্টির উপক্রম হইতে যতদিন না সৃষ্টির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়, ততদিন তাহার চিদ্বিমুখ অবস্থা। সৃষ্টির স্থিতি কালে, যদিও প্রকৃতি কেন্দ্রগত থাকিয়া অশেষ পরিণামের অধীন থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিদ্বিমুখ পরিণাম বন্ধ হওয়াতে তখনও তাঁহার শান্তির অবস্থা। প্রলয়ের সূত্রপাতে প্রকৃতির চিদভিমুখ অবস্থা। প্রলয় কার্য্য সমাধা হইলে প্রকৃতির আবার পরম শান্তির অবস্থা। জীবের শ্বাস বায়ু প্রকৃতির কতিপয় অবস্থার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। জীবের শ্বাসবায়ু মূলাধার বাসী অপান বায়ুতে সমান বায়ু যোগে আবদ্ধ থাকিয়া দেহাভ্যন্তরে, ফুস্ফুসের মধ্যে বাস করে। পরে স্বভাবত একবার বহির্ম্মুখ হইতেছে এবং বহির্ম্মুখে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, আবার অন্তর্ম্মুখে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে; এবং দেহাভ্যন্তরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আবার বহির্ম্মুখে পুনর্যাত্রা করিতেছে। অপান বায়ুতে আবদ্ধ বলিয়া, শ্বাস বায়ু তাহার বহির্গমন কালে, দেহাভ্যন্তর হইতে সমস্ত বহির্গত হইয়া যায় না কিয়দংশ তন্মধ্যে বদ্ধ থাকে। শ্বাস বায়ু রেচক পূরক কুম্ভক ও জীবের কামনাধীন নহে। অকামে স্বভাবত সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা প্রকৃতির গতিবিধির সম্পূর্ণ অনুরূপ। প্রকৃতিও অবিকল সেই ভাবে একবার পরম ধাম পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টিলীলায় বহির্গত হইতেছে এবং সৃষ্টিলীলায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক আবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, এবং কিয়ৎকাল তথায় যাপন করিয়া আবার সৃষ্টিলীলায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইতেছে।

উপরে যে অষ্টবিধ প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন কয়েকটি শাখা প্রকৃতি আছে;—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি। সাঙ্খ্যমতে ইহারা অহং পদার্থের শাখা; বেদান্ত মতে ইহারা আকাশাদি সূক্ষ্মপঞ্চ হইতে উৎপন্ন।

প্রস্তাবিত বিষয়ে আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের দার্শনিক মত সাঙ্খ্যদর্শনের অনুরূপ। কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ সাঙ্খ্য নহে, তাহাতে বেদান্তেরও ভাঁজ আছে। কপিলের সঙ্গে কয়েক স্থলে তাঁহার মতভেদও দৃষ্ট হয়। কপিলের মৌলিক প্রকৃতি এক, আত্মা অসংখ্য-অনন্ত। ইহাঁর

আত্মাও এক, প্রকৃতিও এক। সাঙ্খ্যের গণনারম্ভ দুই হইতে। ইহাঁর গণনারম্ভ এক হইতে। এবিষয়ে বরং তিনি বেদান্তের সঙ্গে এক মত বেদান্তের গণনারম্ভও এক হইতে। সাঙ্খ্য তাঁহার একমাত্র মৌলিক প্রকৃতির সন্নিধানে অসংখ্য পুরুষ (আত্মা) স্থাপন করিয়া প্রকৃতির সতীত্ব লোপ করিয়াছেন। কপিল শুষ্কজ্ঞানী বা শুষ্ক দার্শনিক মাত্র। তাঁহার দার্শনিক চক্ষু—যারপর নাই সূক্ষ্ম হইলেও, তাঁহার প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রেমলীলা আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই এবং বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিজনিত নির্ম্মল অনুভবের অভাবে সেই উভয়ের মধ্যে সে আত্মীয়তা ও মধুর সম্বন্ধ দেখিতে পান নাই, যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব ভক্তি ও প্রেমযোগে উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ রস আস্বাদন করেন। সাঙ্খ্যের উপলব্ধি প্রকৃতির সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম পর্য্যন্ত। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব বলেন, যদি প্রকৃতি, পুরুষের কেহই নহেন, তবে ইহাঁকে সন্নিধানে পাইয়া উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ কেন এরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। বেদান্ত, হয় পরা প্রকৃতি দেখিতে পান নাই, না হয় শুদ্ধচিৎ সত্তা উপলব্ধি করেন নাই। সম্ভবত তাঁহার পরব্রহ্ম আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের চিদ্গত পরা প্রকৃতি মাত্র; কেননা বেদান্তের পরব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরা প্রকৃতির ন্যায় চিদানন্দময়। বেদান্তের পরব্রহ্ম সৃষ্টিকার্য্যার্থ এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রদান করিয়াছেন, অবশিষ্ট তৃতীয়াংশে তুরীয় ধামে বিরাজিত। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরা প্রকৃতিও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ চিৎ সত্তাকে, এবং স্বকীয় অঙ্গের কিয়দংশকে অবিকৃত রাখিয়া অবশিষ্টাংশে সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়োজিত। ইহাতে এরূপ অনুমিত হইতে পারে যে, বেদান্তের পরব্রহ্ম আর আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের চিৎযুক্ত প্রকৃতি একই পদার্থ। বেদান্তের এই পরব্রহ্ম সত্তাই সর্ব্বস্ব। তাঁহার এই পরব্রহ্ম-সত্তা আবার দ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অসদ্ভাব সত্ত্বেও, অকারণে বা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে নিত্য ছায়াবিশিষ্ট।

এই শুদ্ধ চিৎ আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধামের শ্রীকৃষ্ণ, এই পরা প্রকৃতি তাঁহার শ্রীরাধা। প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ অষ্ট সখী। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বঘটে। শ্রীরাধারও সঙ্গে আছেন, সখীদেরও সঙ্গে সঙ্গে আছেন। মধ্যে পরম ধামে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত; সেই পরম ধামের চতুঃপার্শ্বে এই অষ্ট সখী স্ব স্ব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসচক্রে পরিক্রমণ করিতেছেন। সমগ্র সৃষ্টি সেই পরম ধামের চতুঃপার্শ্বে একটি রাসচক্রে ভ্রাম্যমান।

প্রকৃতি সৃষ্টির মধ্যে কোটী কোটী রূপ ধারণ করিয়া লীলাময়ী; শ্রীকৃষ্ণও এই কোটী কোটী রূপের সঙ্গে বিরাজিত। এ-রাস কেবল অষ্ট প্রধানা সখীর সঙ্গে নহে; কোটী কোটী সখী সঙ্গেও রাসবিলাস চলিতেছে। এই মহারাসচক্রে কোটী কোটী প্রকৃতি কোটী কোটী পুরুষ সঙ্গে ভ্রাম্যমান। কিন্তু মূলে একটি প্রকৃতি ও একটি পুরুষ মাত্র—একটি শ্রীরাধা ও একটি শ্রীকৃষ্ণ মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের প্রেমমার্জ্জিত নেত্র সৃষ্টির মায়িক লীলার মধ্যেও এই মহারাস দর্শন করে। কিন্তু এই বাহিরের রাসে এই বহিস্থা প্রকৃতি নিত্যকাল সন্তুষ্ট থাকিবার নহেন। চিদাভিমুখ অবস্থায় প্রকৃতি তাঁহার বাহ্যিক রাসমণ্ডল ভঙ্গ করিয়া প্রিয় সখী শ্রীরাধার নির্ম্মল অঙ্গে নির্লিপ্ত হইয়া পরমধামে শ্রীকৃষ্ণের মধুর সহবাস লাভ করিবার জন্য স্বয়ং উন্মাদিনী ও অভিসারিণী। দুর্জ্জয় মানভরে কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া লীলা ধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন দুর্জ্জয় কৃষ্ণ প্রেমের আকর্ষণে আবার চিদাভিমুখী—কৃষ্ণাভিমুখী। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া, মলিনাবস্থায় কৃষ্ণসখী কত কাল থাকিতে পারে? এখন হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে করিতে, পরম ধামের পরম রাসে মিলিত হইবার জন্য সৃষ্টির এই সোণার সংসার ছারখার করিয়া চলিলেন। এস, কে এই অননুকরণীয় অকারণ জাগ্রত বৈরাগ্যের অনুকরণ করিবে; এস কে এই কৃষ্ণসখীর অনুগ হইবে; এস কে উজান পথে পরম ধামে যাত্রা করিবে; এস কে পরম ধামের রাসবিলাসে সম্মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা হইবে; বৈষ্ণব তোমাকে ডাকিতেছেন।

রাজপথের কথা।

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্য পর্ব্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান

প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একইভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি স্নিগ্ধশ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি! রাত্রিদিন পদশব্দ, কেবলি পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশি দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে একেকটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্কধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কাণ পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙ্গা কথা ভাঙ্গা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়! ঐ শুন, একজন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি! কই আর দাঁড়াইল! গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না। ঐ একটি মাত্র পদ অর্দ্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথায় যাইতেছে না জানি! যে কথাটা

বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে! এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়! তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্তু আমি ত দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে ত পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায় সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোন কোন মহাজনের পণ্যস্তূপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে, যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্য্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহ-বাতায়ন হইতে মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্য্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র চকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে! গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না!

কখন কখন তাহাও পাই। বালক বালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্ব্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়! আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত

করে, ও তাহাদের ছোট ছোট হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না!

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে! কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়! রাধিকা বলিয়াছেন—

"যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা!"

অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না!

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি! আমি মনে মনে তাহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন হইল, এমনি এক জন কে, তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে বহুদূর হইতে আসিত—ছোট দুটি নূপুর রুনুঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মত বড় ম্লান ভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ঐ বাঁধান বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর-এক-জন-কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে দাঁড়াইত না—হয় ত বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার-হিম-স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলীর কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝরঝর

ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্র মুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর-একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সে দিনও আর-একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল! কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে! তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়ে কঠিন! তুই যাহাকে ডাকিয়া যাহার সাড়া পাইলি না, সে কি আমার চেয়েও মূক! তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ। বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয় ত সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনো সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয় ত সে কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে না, কেবল এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্য্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি! কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে! কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে! শোক কাহার জন্য করিব! এমন কত আসে, কত যায়!

কি প্রখর রৌদ্র! উহু-হুহু! এক এক বার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্তধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসিকান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই

কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্ত্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রতিমা।

জগদীশ্বরের পূজায় কি জন্য প্রতিমূর্ত্তি আবশ্যক তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, বলিয়াছি যে প্রতিমূর্ত্তিতে জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ প্রস্ফুটিত দেখিলে মন তাঁহার পূজায় উৎসাহিত, উত্তেজিত এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে—মানুষ ঈশ্বরে মজিয়া যায়। প্রতিমূর্ত্তির দুইটিমাত্র কার্য্য—শিক্ষা এবং উদ্বোধন। কিন্তু যে প্রকার প্রতিমূর্ত্তির কথা বলিয়াছি, অর্থাৎ প্রতিভাপ্রসূত উন্নতশিল্পসঙ্গত প্রতিমূর্ত্তি, তাহা সকল লোকে বুঝিতে পারে না, যাহারা সুশিক্ষিত তাহারাই কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারে এবং যাহারা শিল্পশাস্ত্রের সূক্ষ্ম নিয়মাদি পর্য্যন্ত অবগত তাহারাই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে। কলিকাতার মহামেলায় অনেকগুলি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি ভাবময় এবং কতকগুলি কার্য্যজ্ঞাপক। দেখিলাম অধিকাংশ লোকেই কার্য্যজ্ঞাপক ছবিগুলি দেখিতেছে, ভাবময় ছবিগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকে অন্তর্জগৎ সহজে বুঝিতে পারে না, বাহ্যজগৎ সহজে বুঝিতে পারে। উচ্চশিল্পসম্ভূত ভাবময় মূর্ত্তি সুশিক্ষিতের জন্য, স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতের জন্য নয়।

পাঠক এখন বলিতে পারেন যে এদেশে দেবদেবীর মূর্ত্তি উচ্চশিল্পের নিয়মানুসারে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না—যে নিয়মে এবং যেরূপ শিল্পী দ্বারা এথেন্সবাসীর জগদ্বিখ্যাত যুপিতর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে এবং সেইরূপ শিল্পী দ্বারা গঠিত হয় না। অতএব এদেশের দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রকৃত পূজা নয় এবং সেইজন্য তাহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু একটি কথা আছে। মনের ভাব দুই রকমে প্রকাশ করা যায়—মনের ছবি দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং বাহ্যবস্তুর দ্বারা প্রকাশ করা যায়। আনন্দ কি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় একটি আনন্দোৎফুল্ল মুখ আঁকিতে হয়, নয় সুস্নিগ্ধ সুবর্ণরঞ্জিত সান্ধ্যাকাশে দুই চারিটি ক্ষুদ্র চঞ্চল-পক্ষ পক্ষী আঁকিয়া দেখাইতে হয়। শোক কি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় একটি মলিনতামাখা মুখ আঁকিতে হয়, নয় মৃতপতির শবের পার্শ্বে করকপোললগ্ন পত্নীকে বসাইয়া দেখাইতে হয়। মনের সকল ভাবের প্রতিকৃতি বাহ্য বস্তুতে আছে। সরল অকপট অন্তঃকরণের বাহ্য প্রতিকৃতি কাচ, জল, বা স্ফটিক; ক্রূর হৃদয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি সর্প; উদার মনের বাহ্য প্রতি-কৃতি অনন্ত সমুদ্র; অপ্রণয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তুর তিক্তরস; রাগের বাহ্য প্রতিকৃতি অগ্নি, ইত্যাদি। ফল কথা, বাহ্য জগৎই অন্তর্জ্জগতের সকল ক্রিয়ার এবং সকল অবস্থার মূল। সেই জন্য কবির কল্পনা-সম্ভূত কাব্যে এবং মনুষ্যের জীবন-কাব্যে অন্তর্জ্জগতের সহিত বহির্জ্জগতের এত বাঁধাবাঁধি, এত কোলাকুলি, এবং সেই জন্য কি কবি, কি কৃষক সকলেই বাহ্যবস্তুর নাম করিয়া মনের কথা বুঝায়। সাধারণ লোকে বাহ্য বস্তু যেমন বুঝিতে পারে, মনের খেলা তেমন বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকে মন অধ্যয়ন করে না—সেই জন্য মনের ছবিও ভাল বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকে বাহ্যবস্তু দেখে এবং তাহার গুণাগুণ বোঝে—সেই জন্য বাহ্যবস্তুতে মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। মনশ্চক্ষে যে ছবি দেখিতে হয় সে ছবি সাধারণ লোকের জন্য নয়; চর্ম্ম চক্ষে যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই সাধারণ লোকের জন্য। তাই কলিকাতার মহামেলায় লোকে ভাবময় ছবিগুলি দেখে নাই, কার্য্যজ্ঞাপক ছবিগুলিই দেখিয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিবে যে হিন্দুর দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রণালী উচ্চশিল্পমূলক আধ্যাত্মিক বা অন্তর্মুখ (Subjective) প্রণালী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না। হিন্দুর

দেবদেবীর মূর্ত্তি মুনিঋষির জন্য নয় মুনিঋষি সাধারণ লোকের জন্য দেব দেবীর মূর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব যে রকম করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে. হিন্দু শাস্ত্রকার সেই রকম করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাই। জগতের এবং জগদীশ্বরের অসংখ্য রূপ। তন্মধ্যে সুখ, সম্পদ এবং সৌভাগ্য একটি রূপ। বর্ষার নদীতে, শরতের আকাশে, বসন্তের বসুন্ধরায়, গৃহস্থের গৃহ-সৌন্দর্য্যে সেই সৌভাগ্যের বিকাশ। জগদীশ্বরের সেই সৌভাগ্য-রূপের যে ভাব ভক্তের মনে থাকে তাহা দুই রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক বা অন্তর্মুখ (Subjective) প্রণালীতে যে মূর্ত্তি হইবে তাহা হয়ত এমন একটি সবল, সুঠাম, নিরাভরণ, সদ্‌গুণজ্ঞাপক স্ত্রী মূর্ত্তি হইবে যাহা দেখিলেই বোধ হইবে—আহা, ইহাই বুঝি সৌভাগ্য! হিন্দুর ঘরে অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিয়া বলিয়া থাকেন—আহা, মেয়েটি যেন লক্ষ্মী! কিন্তু মেয়েটির না আছে অলঙ্কার, না আছে বেশভূষা, আছে কেবল এক ধর্ম্মের ছাঁচে ঢালা মুখ, আর দেহের এক অনির্ব্বচনীয় কান্তি। এই মেয়ের মূর্ত্তি ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুলিলেই বোধ হয় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-মূর্ত্তি হইয়া উঠে। কিন্তু কত ভাবুক, কত মনোজ্ঞ, কত অন্তর্দর্শী হইলে এ ভরা মূর্ত্তি বুঝিতে পারা যায়—এ ভরা মূর্ত্তিতে বসন্তের স্ফূর্ত্তি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ষার আশা, শরতের শান্তি, হেমন্তের হেমময় শস্য,শীতের সোহাগ দেখিতে পাওয়া যায়! এত গুণ, এত ক্ষমতা কি সকলের থাকে? কিন্তু বহির্মুখ (objective) প্রণালী অনুসারে সেই সৌভাগ্য-মূর্ত্তি কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই মূর্ত্তি গড়িতেছেন।—

শ্রিয়ন্দেবীং প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাং।
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবং॥
পীনোন্নতস্তনতটাং মণিকুণ্ডলধারিণীং।
সুমণ্ডলংমুখং তস্যাঃ শিরঃ সীমন্তভূষিতং॥
কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রৌ চ হারভূষৌ পয়োধরৌ॥
নাগহস্তোপমৌ বাহূ কেয়ূরকটকোজ্জ্বলৌ।
পদ্মং হস্তে চ দাতব্যং শ্রীফলং দক্ষিণে করে॥
মেখলাভরণাস্তদ্বত্তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভাং।
নানাভরণসম্পন্নাং শোভনাম্বরধারিণীং॥

পার্শ্বে তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ।
পদ্মাসনোপবিষ্টাস্তু পদ্মসিংহাসনস্থিতাং॥
করিভ্যাং স্নাপ্যমানা সা ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ।
প্রতিপালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥
স্তূয়মানা চ লোকেশৈস্তথা গন্ধর্ব্বগুহ্যকৈঃ॥
(মৎস্যপুরাণ, ২৩২-২৩৫ অধ্যায় দেখ)।

লক্ষ্মী দেবীর কথা কহিতেছি ঃ—লক্ষ্মী দেবী নবযৌবনশালিনী। তাঁহার গণ্ডস্থল পীন, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, স্তন পীনোন্নত। তাঁহার কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, মুখ সুগোল এবং শিরোদেশ সীমন্তে ভূষিত। তাঁহার স্তনদ্বয় কঞ্চুকে (কাঁচলীতে) আবদ্ধ এবং হারে মণ্ডিত। তাঁহার বাহুদ্বয় হস্তীশুণ্ডের ন্যায় সুগোল ও সুঠাম এবং কেয়ূর ও কটকে (বালায়) বিভূষিত। তাঁহার বামহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল। তাঁহার কটিদেশ মেখলায় অলঙ্কৃত এবং দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল। তাঁহার অঙ্গে বিবিধ আভরণ ও পরিধেয় সুশোভন বসন। তাঁহার পার্শ্বে স্ত্রীগণ চঞ্চল করে চামর বীজন করিতেছে। তিনি পদ্মময় সিংহাসনের উপর পদ্মের আসনে আসীনা। দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতেছে এবং আর দুইটি হস্তী শুণ্ডে স্নান-কলস ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। লোকপালগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং গুহ্যকগণ তাঁহার স্তব করিতেছে।

বল দেখি যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতের গূঢ় তত্ত্ব বোঝে না, যে বাহ্য সম্পদের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, যাহার মনশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত নয় সেও কি এ দৃশ্য দেখিয়া বলিবে না যে এ মেয়ে সকল সুখ, সকল সম্পদ, সকল সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের মেয়ে? মুখে ভাবের খেলা থাকিলে সে তাহা বুঝিতে পারে না, চিনিতে পারে না, কেন না তাহার মনশ্চক্ষু নাই; কিন্তু তাহার যে দুইটি শারীরিক চক্ষু আছে তদ্দ্বারা সে সুঠাম দেহে এবং দেহের তপ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভায় যৌবনের সুখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য বস্ত্রাভরণে ঐশ্বর্য্য দেখিতে পায়, চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে পায়, করিশুণ্ডধৃত স্নান-কলসের স্বচ্ছ সলিলে শান্তি এবং স্নিগ্ধতা দেখিতে পায়, পদ্মাসনে পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধর্ব্ব গুহ্যক লোকপালের স্তুতিগানে সর্ব্বারাধ্য দেবতা দেখিতে পায়। তখন তাহাকে কেহ কিছু না বলিয়া দিলেও সে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকে জগজ্জননীর

প্রতিমা বলিয়া পূজা করিতে থাকে। হিন্দু কবির এই অপূর্ব্ব প্রতিমা বড়ই সুন্দর, বড়ই ভাবাভিনয়নমূলক (ideal)। প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীকর্ত্তৃক এই প্রতিমা গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মনশ্চক্ষে জগদীশ্বরের মানসমূর্ত্তি দেখিতে পান। কিন্তু তেমন শিল্পীকর্ত্তৃক গঠিত না হইলেও, আজ কাল যে রকম অশিক্ষিত শিল্পী দ্বারা আমাদের প্রতিমা গঠিত হয় সেই রকম শিল্পীকর্ত্তৃক গঠিত হইলেও সাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীশ্বরের সৌভাগ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কেন না মনুষ্যমাত্রেই চর্ম্মচক্ষে যে সকল বস্তুতে সৌভাগ্য দেখিয়া থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমায় সেই সকল বস্তুর অপূর্ব্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন। পুরাণে জগদীশ্বরের অপরাপর মূর্ত্তিও এই প্রণালীতে ফোটান। ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান হইলে মানবশিরোমণিরাও সে সকল মূর্ত্তিতে মজিতে পাবেন; ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান না হইলে অন্তত সাধারণ লোকে তাহাতে জগদীশ্বরকে দেখিতে ও চিনিতে পারে। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তি গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তির ন্যায় কেবল মাত্র মূর্ত্তি নয়। গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে কেবলমাত্র জগদীশ্বর থাকেন; পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগৎও থাকে। গ্রীক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে কেবল মূর্ত্তি বা ভাব আছে, বস্ত্র নাই, আভরণ নাই, ফুল নাই, ফল নাই, পশু নাই, পক্ষী নাই—বস্তু নাই, জগৎ নাই। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্ত্তিতে মূর্ত্তি আছে এবং বস্ত্র, আভরণ, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগৎ, সবই আছে। অতএব, জগৎ যদি জগদীশ্বরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব যে গ্রীক কবি জগদীশ্বরের শুধু মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, হিন্দু কবি জগদীশ্বরের মূর্ত্তি এবং প্রকৃত প্রতিমা দুইই গড়িয়াছেন। এবং কি গ্রীস্, কি রোম, সকল দেশ দেখ, বুঝিতে পারিবে যে হিন্দু বই পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরের প্রতিমা গড়িতে পারে নাই—আর কেহ জগৎ দিয়া জগদীশ্বরকে দেখায় নাই। জগৎই জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। পদ্মপুরাণের কবি বলিতেছেন যে জগদীশ্বরের প্রতিমা দুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা*। শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, প্রস্তর, ইত্যাদি দ্বারা যে প্রতিমা নির্ম্মিত হয় তাহা স্থাপিত প্রতিমা। আর যে কোন বস্তুতে—কাষ্ঠে বল, মৃত্তিকায় বল, বৃক্ষে বল, পর্ব্বতে বল, সমুদ্রে বল—যে

* স্থাপনঞ্চ স্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তৎপ্রকীর্ত্তিতং।

কোন বস্তুতে জগদীশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা*। হিন্দু কবি জগদীশ্বরের সেই জগৎরূপ স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা দ্বারা জগদীশ্বরকে দেখান। হিন্দু কবির গঠিত প্রতিমা বই পৃথিবীতে জগদীশ্বরের আর প্রকৃত প্রতিমা নাই, কেন না আর কাহারো প্রতিমায় জগৎরূপ জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় না। হিন্দু বই পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরকে প্রকৃত জগন্ময় বলিয়া দেখে নাই। এবং সেই জন্য হিন্দু বই আর কেহ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাই, বুঝাইবার চেষ্টাও করে নাই—সমস্ত জগৎকে জগৎ বলিয়া মানে নাই, জগৎ বলিয়া আদর করে নাই। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই লোকসাধারণের মানসিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অভাব বুঝিয়া তাহাদের জন্য ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহারা বুঝিতে পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাহারা দেখিলে চিনিতে পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর দেখায় নাই। সর্ব্বত্রই শাস্ত্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন—লোকসাধারণকে অর্থাৎ জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই—লোকসাধারণের ভাবনা ভাবেন নাই—জগতে আপনি ছাড়া যে আর কেহ আছে তাহা মনেও করেন নাই—বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুদ্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুদ্রের জন্য যে ক্ষুদ্রের উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা একবার বিবেচনাও করেন নাই। ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার আদরে আপনি গলিয়া, কেবল আপনার নিমিত্তই ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বে ব্যথিত না হইয়া এক একবার ক্ষুদ্রকে জোর করিয়া বলিয়াছেন—আমার পথে চলিতে পারিস্ত চল্, নয় অধঃপাতে যা। কেবল মাত্র হিন্দু শাস্ত্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। লোকসাধারণকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন—জগদীশ্বরের জগৎরূপ স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে আপনার স্থাপিত প্রতিমা গড়িয়া সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়াছেন। এক মাত্র হিন্দুই জগৎ কি তাহা বোঝেন এবং জগৎকে ভালবাসেন। এক মাত্র হিন্দুর বুদ্ধি জগৎ-গ্রাহী, দৃষ্টি জগৎ-ব্যাপী, হৃদয় জগৎ-যোড়া। এক মাত্র হিন্দু জগতের আদর্শে গঠিত—জগৎ-রূপী। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা পূর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞান এবং প্রকৃত সামাজিকতার প্রতিমা। সমাজের সকলকে ভালবাসেন বলিয়া,

* যস্মিংস্তু নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি। পাষাণদার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎ স্মৃতং॥ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৭৩ অধ্যায়।

সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের মানসিক শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া এবং মনের কথা খুঁজিয়া দেখিয়া সকলের ভাবনা ভাবেন বলিয়া, সমাজের ক্ষুদ্রতম হইতে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া ছাড়িতে পারেন না বলিয়া, হিন্দু শাস্ত্রকার তাঁহার জগৎ-রূপী প্রতিমা গড়িয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমা বলে যে, হিন্দু একটি পূর্ণ-জগৎ।

হিন্দুর এই সর্ব্বপ্রিয়তা এবং সর্ব্বগ্রাহিতা তাঁহার অনেক কাজে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিব। তাঁহার সাহিত্য দেখ। বেদব্যাস কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে বসিলেন। বসিয়া সে যুদ্ধের যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে সৃষ্টির সূত্রপাত হয় সেইখানে আরম্ভ করিয়া কত কি লিখিয়া যুদ্ধের অনেক পরে পাণ্ডবদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। বাল্মীকি রাম কর্ত্তৃক রাবণ বধ বর্ণনা করিতে বসিয়া রাম এবং রাবণ উভয়েরই চৌদ্দ পুরুষের কথা লিখিয়া রামকে লোকান্তরিত করিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। প্রত্যেক পুরাণে সৃষ্টির আগে হইতে কথা আরম্ভ। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ রকম দেখা যায় না। হোমর ট্রয়-ধ্বংসের কথা বলিতে বসিয়া সেই ধ্বংস ছাড়া আর কোন কথা বলিলেন না, আবার ধ্বংসের সকল কথাও বলিলেন না। মিল্টন শয়তানের বিদ্রোহের কথা লিখিতে বসিয়া বিদ্রোহের আগেকার একটি কথাও বলিলেন না। ফেনেলন তেলি-মেকসের গল্প বলিতে গিয়া তেলিমেকসের পিতৃপুরুষের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিজের বাল্যকালের কথাও বলিলেন না। হিন্দু কবির এবং ইউ-রোপীয় কবির উপমা তুলনা করিয়া দেখ। দেখিবে হিন্দু কবি উপমেয় ও উপমানের সকল অংশের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেছেন, ইউরোপীয় কবি তাহাদিগের একটি মাত্র অংশের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হয়ত সাদৃশ্য নয়, সাদৃশ্যের মতন একটা কিছু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন। এইরূপ দেখিবে, সকল বিষয়েই হিন্দু ব্যাপকদর্শী, ইউরোপ অংশদর্শী; হিন্দু সমগ্র-গ্রাহী, ইউরোপ অংশগ্রাহী; হিন্দু সংযোজক, ইউরোপ বিযোজক; হিন্দু মহা-কাব্য, ইউরোপ খণ্ডকাব্য। হিন্দুতে এবং ইউরোপবাসীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেই প্রভেদ বশত হিন্দু, সমাজের উন্নত এবং অবনত, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, সকলের জন্যই ভাবেন। ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি একদেশদর্শী নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় শুধু উন্নত, জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের ভাবনা ভাবিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। ইউ-

রোপবাসীর ন্যায় তিনি আপনাকে একেশ্বর ভাবিয়া আপনার মতে, আপনার পথে সকলকে জোর করিয়া আনিতে চান না। তিনি জানেন যে মনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। কেহ যেমন কখনই দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পারে না এবং পারিবে না, কখনই কুটীর ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে না এবং পারিবে না, কেহ তেমনি কখনই প্রতিমা না দেখিয়া নিরাকার জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান করিতে পারে না এবং পারিবে না। কাহারও শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই ছোট ছোট সহজ গ্রন্থ লিখিতে হয়, কাহারো বাসের জন্য যেমন চিরকালই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হয়, তেমনি কাহারো ঈশ্বরোপাসনার জন্য চিরকালই সহজে বুঝিতে পারা যায় এমন ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়া দিতে হয়। এই ভাবিয়া হিন্দু লোকসাধারণের জন্য ঈশ্বরের প্রতিমা গড়িয়াছেন—গ্রীকের ঈশ্বর-মূর্ত্তি নয়, হিন্দুর ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়াছেন। প্রশস্ত সহৃদয়তার গুণে, গভীর সামাজিক বুদ্ধি এবং সমাজাসক্তির গুণে হিন্দু জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে জগৎ-রূপী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমার কারণ—হিন্দুর প্রশস্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সামাজিক-ভাব (social spirit); হিন্দুর প্রতিমার আকারের কারণ—হিন্দুর জগদ্ব্যাপী দৃষ্টি এবং জগৎগ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সামাজিকভাব, এমন দৃষ্টি, এমন মন পৃথিবীতে আর কাহারো নাই। সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই মনের স্ফোট—হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা। সে প্রতিমা ভাল করিয়া গড়, ইচ্ছা হয়—আবশ্যক বুঝ, নূতন করিয়া গড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই উপযোগী কর, কিন্তু সে প্রতিমা ভাঙ্গিও না। প্রতিমা ভাঙ্গিলে জানিব যে হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিল। কেন না হৃদয় না ভাঙ্গিলে প্রতিমা ভাঙ্গিবে না এবং হৃদয় না ভাঙ্গিলে সমাজও ভাঙ্গিবে না। যেখানে হৃদয় নাই সেখানে প্রতিমা নাই, আর সেখানে সমাজও নাই। সেখানে যে সমাজ দেখিতে পাও তাহা হৃদয়ের উপর স্থাপিত নয়, ঐহিক সুখ সম্পদ বা স্বার্থের উপর স্থাপিত। সে সমাজ ক্ষুদ্র কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। কে জানিত যে তেমন আঁটাসাঁটা এথেন্স সমাজ দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে? কে জানিত যে তেমন এক-প্রাণ এক-বাক্য রোমক সমাজ দশ দিনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? আর কে না জানে যে সেই বিশাল অচল জাতিভেদপূর্ণ হিন্দুসমাজ শত বিপ্লব অতিক্রম করিয়া যুগযুগান্তেও অটল

থাকিবে? অতএব হৃদয় মূলক প্রতিমাকে বড় সামান্য জিনিস মনে করিও না। হিন্দুর প্রতিমা পৃথিবীতে হিন্দুর একটি প্রধান পরিচয়। এমন পরিচয়টা হারাইতে ইচ্ছা হয় কি?

পুরাণে প্রতিমা নির্মাণের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সে নিয়মে এখন প্রায়ই প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। তাই দিগম্বরী কালী এবং অসুরনাশিনী কাত্যায়নীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা দেখি। ইহা অজ্ঞতা এবং কুরুচির ফল। পুরাণে প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গের, প্রত্যেক অলঙ্কারের, প্রত্যেক দ্রব্যের অর্থ আছে। পুরাণানুসারে প্রতিমা নির্ম্মিত হইলে এখন যে সকল প্রতিমা অলঙ্কারে বিভূষিত হয় তন্মধ্যে অনেকগুলিতে অলঙ্কার থাকে না। কিন্তু যে প্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রতিমা এখন অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে, এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকে যে তাহাকে কেবল ছেলেখেলা বলিয়া থাকেন তা নয়। দেবতা পরম বস্তু, সৌন্দর্য্যময়—যেখানে দেবতার আবির্ভাব, যেখানে সুন্দর বস্তুর আবির্ভাব মানুষ সেই খানেই সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া থাকে। শচী হিমাচলে উপস্থিত হইলেন, অমনি—

——————————আচম্বিতে তথা

নানা রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল স্তবকে, স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মর ধন,
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীলনভস্তলে হাসে তারাদল যথা।

আবার এক ভক্তের কথা শুন দেখি:—

মধুকর নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উত্তরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,

মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততীরমণ;
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাধা,
দাঁড়াইল চারিদিকে; বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস; রজতস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল। * (ইত্যাদি)
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায়েত অলি নাচে পিকগণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাচে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর লতা চারু কলেবর॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে নানা জাতি॥
ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গণ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর॥
বিমান পাটের থোপ মুকুতার মালা।
বিচিত্র বিনোদ তাতে সুরঙ্গ প্রবালা॥
তার মাঝে বিকশিত কমল কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ॥

অগাধ সমুদ্রে অপরূপ সৌন্দর্য্যের খেলা! অতল জলে অপূর্ব্ব পুষ্প কানন। "গভীর দেখি যে জল, তাহে নানা উতপল, মনোহর কমল উদ্যান।" প্রকৃত ভক্ত এইরূপই করিয়া থাকেন। তাই আজিকার বঙ্গের হিন্দু যেমন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝেন সেই অনুসারে অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার দেবদেবীর প্রতিমার সৌন্দর্য্যসম্পাদন করেন। তোমার সৌন্দর্য্যজ্ঞান তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় ভালই। তুমি তোমার মনের মতন করিয়া তোমার প্রতিমা সাজাও।

* তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ।

আরো একটি কথা। কিছু গূঢ় কথা। তুমি ইংরাজের কবিতা* আওড়াইয়া বলিবে যে জগদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য্য। যে নিজেই সুন্দর তাহাকে আবার অলঙ্কার দিয়া সুন্দর করিবে কি? গ্রীক ভাস্কর তাঁহার দেবদেবীর মূর্ত্তিকে কি সোণা রূপা দিয়া সাজাইতেন? আমি বলি যে শুধু সুন্দরকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত মানুষ সুন্দরকে সোণা রূপা দিয়া সাজায় না। সন্তানকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত জনক জননী সন্তানকে সোণা রূপা দিয়া সাজান না। প্রণয়িনীকে সুন্দর করিবার জন্য প্রণয়ী প্রণয়িনীকে হীরা মুক্তা দিয়া সাজান না। আদরের জিনিসকে হৃদয় সোণা রূপা দেয়—হৃদয় দেওয়ায় বলিয়া দেয়—হৃদয় না দিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া দেয়—সুন্দর করিবার জন্য দেয় না। জননী কুৎসিত ছেলেকেও যে গহণা পরান। তিনি কি জানেন না যে, যে কুৎসিত সে কিছুতেই সুন্দর হয় না? তবে তিনি কেন কুৎসিত ছেলেকে সোণারূপায় মোড়েন? তিনি কি কিছু মনে করিয়া মোড়েন, তাঁহার হৃদয় মোড়ায়। আবার শুধু তাই কেন? আদরের জিনিস যতই কেন সুন্দর হউক না, যে আদর করিতে জানে সে মনে করে বুঝি সুন্দরকে সাজাইলে আরো সুন্দর হইবে। অতএব যেখানেই আদরের জিনিস, যেখানেই প্রতিমা, সেইখানেই সোণারূপা, সেইখানেই বসনভূষণ, সেই খানেই হীরা মুক্তা, সেই খানেই খুটি নাটি। প্রেমের বস্তুর, আদরের জিনিসের কিছু না করিতে পারিলে ভাল বাসিয়া, আদর করিয়া তৃপ্তি হয় না, সুখ হয় না। রস্কিণ বলেন যে love chiefly grows in giving। † জগদীশ্বরের সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই। তথাপি প্রেমের পিপাসা মিটাইবার জন্য হিন্দু তাঁহাকে কত কি দিয়া সাজান। গ্রীক ভাস্কর শিল্পের নিয়মে তাঁহার দেবদেবী মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—হৃদয়ের রাগে গড়েন নাই; দেবতাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ভাবিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন—ঘরের ছেলে, হৃদয়ের নিধি ভাবিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়েন নাই। তাই তাঁহার দেবদেবীর মূর্ত্তি বসনভূষণহীন। গ্রীস্‌বাসীর যেমন চক্ষু ছিল, তেমন হৃদয় ছিল না ‡ তিনি

---

* "Beauty unadorned is adorned the best."

† Modern Painters নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় বালমের ৮৮ পৃষ্ঠা।

‡ "*So far as the sight and knowledge of the human form*, of the purest race, exercised from infancy constantly, but not excessively, in all exercises of dignity, not in straining dexterities, but in natural exercises of running, casting, or riding; practised in endurance, not

কেবল চক্ষু দিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতেন, হৃদয় দিয়া দেখিতেন না। হিন্দুর দেবতা হিন্দুর ঘরের ছেলে, হৃদয়ের ধন। তাই তিনি তাঁহাকে আদর করেন, কোলে করেন, পূজা করেন, ধম্কান্, হীরা মুক্তা সোণা রূপা কড় শাঁখা ঘরে যা থাকে তাই দিয়া সাজান—শুধু সুন্দর করিবার নিমিত্ত সাজান না। হিন্দু জগদী-শ্বরকে যে ভাবে দেখেন আর কেহ তাঁহাকে সে ভাবে দেখে না। তিনি জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়াও ভাবেন আবার একটি ক্ষুদ্র কোলের ছেলে বলিয়াও ভাবেন। অনন্ত জগদীশ্বরের অনন্ত রূপ। তাই অনন্তজ্ঞ হিন্দু জগদীশ্বরকে অনন্ত-বৃহৎও দেখেন, অনন্ত-ক্ষুদ্রও দেখেন। হিন্দুর মন অনন্ত-প্রসারিত, সর্ব্বগ্রাহী, ইউরোপীয়ের ন্যায় সীমানা-সরহদ্দ-মাপ-পরিমাণ প্রিয় নয়। সে মন প্রকৃত অনন্ত-প্রিয়, অনন্ত-বিহারী। হিন্দু কেন যে অনন্ত পুরুষের অনন্তত্বের কাছে সভয়ে সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন, আবার কেনই বা সেই অনন্ত পুরুষকে কোলের ছেলে ভাবিয়া আদর করেন, ধম্কান, ভয় দেখান, খোসামোদ করেন, সোণা রূপা দিয়া সাজান তাহা তিনিই জানেন। তুমি আমি কুলাঙ্গার, কেমন করিয়া জানিব? আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চাঁচা-ছোলা, কেয়ারি-করা, টাইম-ধরা রূলে-বাঁধা, লেবেল-আঁটা ইউরোপীয়ই বা কেমন করিয়া জানিবে? হিন্দু জগদী-

---

of extraordinary hardship, for that hardens and degrades the body, but of natural hardship, vicissitudes of winter and summer, and cold and heat. yet in a climate where none of these are severe; surrounded also by a certain degree of right luxury, so as to soften and refine the forms of strength: so far as the *sight* of all this could render the mental intelligence of what is noble in human form so acute as to be able to abstract and combine, from the best examples so produced that which was most perfect in each, so far the Greek conceived and attained the ideal of humanity; and on the Greek modes of attaining it, chiefly dwell those writers whose opinions on this subject I have collected; wholly losing sight of what seems to me the most important branch of the inquiry. namely, *the influence, for good or evil, of the mind upon the bodily shape, the wreck of the mind itself, and the modes by which we may conceive of its restoration.*" রস্কিনের *Modern Painters* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৯ ও ১১০ পৃষ্ঠা।

শ্বরের মহারণ্য-রূপা luxuriance; ইউরোপীয় মানুষের তৈয়ারি ক্ষুদ্র বাগানের ন্যায় trimness মাত্র। অতএব পবিত্র পিতৃপুরুষের প্রতিমা ভাঙ্গিও না। সেই প্রতিমার সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র পিতৃপুরুষের জগৎ-গ্রাহী ধৃতি, জগৎ-ব্যাপী দৃষ্টি, এবং জগৎ-যোড়া হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর।

উপসংহারে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে উপাসক সেই মূর্ত্তিকেই জগদীশ্বর মনে করিতে পারে। এদেশে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া তাহা পূজিত হয়। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এইরূপ বুঝিয়াছি যে কেহই জগদীশ্বরের মূর্ত্তিটীকে জগদীশ্বর মনে করে না। সকলেই এইরূপ বুঝে যে মূর্ত্তি হইতে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র, মূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব হয় মাত্র। তবে এমনও হইতে পারে যে জগদীশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের মন যখন বড়ই বিভোর হইয়া উঠে, তখন সে জগদীশ্বর এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তির প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া বোধ হয় যেন সেই মূর্ত্তিটীকেই জগদীশ্বর মনে করিতে থাকে। কিন্তু যেখানেই প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, সেইখানেই ত এইরূপ হইয়া থাকে। ওথেলো দিস্‌দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে ওথেলো দিস্‌দেমনাকে ত কল্পনামাত্র বলিয়া মনে থাকে না, সত্যসত্যই রক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে অভিনেতাদিগকে অভিনেতা বলিয়া মনে থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে হয়। ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া যদি তেমনি সমস্ত ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া বিভোর মনে মূর্ত্তিতে কেবল ঈশ্বরই দেখি তবেইত জানিব যে মূর্ত্তি গড়া সার্থক হইয়াছে। মূর্ত্তি যদি ভেদাভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিতে পারে, শুধু ঈশ্বর-ভক্তিতে মন ভরাইয়া দিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল বস্তুকে ভুলাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মূর্ত্তিকে পূজা করা ঈশ্বরকে পূজা করা বই আর কি হয়? মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হওয়া ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হওয়া বই আর কি হয়? কোল্‌রিজ্‌ এই যে একটা পর্ব্বতের সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিলেন। তবেই কি পর্ব্বতটা ঈশ্বর হইয়া গেল? কিন্তু পর্ব্বতে আর গঠিত মূর্ত্তিতে প্রভেদ কি? দুইইত ঈশ্বরের প্রতিমা। তবে পর্ব্বতটা স্বয়ং ব্যক্ত প্রতিমা, গঠিত মূর্ত্তিটী স্থাপিত প্রতিমা; প্রভেদ এইটুকু। তবে কোল্‌রিজ্‌ পর্ব্বত দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হইয়া পর্ব্বতের সম্মুখে প্রণত হওয়ায় পর্ব্বতটা যদি ঈশ্বর হইয়া না গিয়া থাকে, তবে আমি দরিদ্র হিন্দু একটী মূর্ত্তি দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে ভোর হইয়া

মূর্ত্তিটীর সম্মুখে প্রণত হইলে মূর্ত্তিটীই বা কেন ঈশ্বর হইয়া যাইবে? তুমি হয়ত বলিবে যে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে করিতে হয়ত তুমি নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা নাক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিবে। এ কথায় আমি এই বলিতে পারি, যে আমি যদি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়া থাকি. তাহা হইলে সহস্র বৎসর তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিলেও তাঁহাকে হাত পা নাক কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না। এই যে ঈসপের গল্পের ন্যায় গল্প, প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক (allegory) সাধারণ লোকে চিরকালই শুনিতেছে। কিন্তু কেহ কখন কি তাই বলিয়া এমন বুঝিয়াছে যে পাখী মানুষের মতন কথা কয়, আর কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলা এক একটা হাত-পা-ওয়ালা মানুষের মতন বক্তৃতা দিয়া বেড়ায় বা থিয়েটরে নাটকাভিনয় করে? সাকার উপাসকদিগের মধ্যে এমন লোক থাকিতে পারে যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করে। কিন্তু সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত নিরাকার বলিয়া বুঝে নাই, তাহাদের যে রকম শিক্ষা (culture) এবং মানসিক শক্তি (calibre) তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিতে একেবারেই অক্ষম, এবং সেই জন্য মূর্ত্তি সামনে না রাখিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলেও তাহারা বোধ হয় ঈশ্বরকে হস্ত পদ বিশিষ্ট ভাবিয়া তাঁহার পূজা করে। তাই যদি হয়, তবে তাহাদিগকে কোন মূর্ত্তি না দিয়া এবং মূর্ত্তি দেখিলে তাহারা যেরূপ ঈশ্বর-ভক্তিতে উত্তেজিত হইতে পারে, সেইরূপ উত্তেজিত হইতে না দিয়া এবং ঈশ্বর-ভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা যতটুকু ধর্ম্মানুরাগী হইতে পারে, তাহা-দিগকে সেই পরিমাণে ধর্ম্মানুরাগী না হইতে দিয়া লাভ কি? ঈশ্বর কি জন্য? শুধু কি প্রকৃষ্ট উপলব্ধির জন্য, না ধর্ম্মোন্নতির জন্য? যে 'নিরাকার' উপলব্ধি করিতে পারে না এবং নিরাকার উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরানুরাগে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মপথে যাইতে প্রধাবিত হয় না, তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার প্রণালীর খাতিরে নিরাকার উপাসনায় জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা ভাল, না মনকে ঈশ্বরানুরাগে রঞ্জিত করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে প্রবৃত্তি প্রদানার্থ একটী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে দেওয়া ভাল? আমরা শুধু উন্নত পদ্ধতি চাই না; কালে উন্নত পদ্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে এরূপ প্রত্যাশাও করি। কিন্তু আমরা ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগ চাই; আমরা চাই যে সকলেরই

মন যে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নিরাকার পদ্ধতি দ্বারা যে আপন মনে ঈশ্বরানুরাগ ফলাইয়া তুলিতে অক্ষম এবং সেই জন্য ধর্ম্মপথে চলিতে উৎসাহিত বোধ করে না, তাহাকে নিরাকার পদ্ধতি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা, এবং তাহাকে সাকার-পদ্ধতি না দিলে শাস্ত্রকার এবং সমাজনেতার মহাপাতক হয়। তাই ধর্ম্মভীরু হিন্দু শাস্ত্রকার লোকসাধারণের জন্য বহির্মুখ প্রণালীতে জগদীশ্বরের প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মেও যে statesmanship চাই; সে statesmanship কেবল হিন্দু শাস্ত্রকার দেখাইয়াছেন, আর কেহ দেখান নাই।

যে জগদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়াছে সে কি তবে কিছুতেই তাঁহাকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিতে পারে না? এ অবনতি কি একেবারেই অসম্ভব? একেবারেই অসম্ভব এমন কথা বলিতে পারি না। ইতিহাসে এইরূপ অবনতি, এইরূপ বিকৃতি দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে দেখিয়াছি সেখানে এমন দেখি নাই যে মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ নিরাকার ঈশ্বরকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিয়াছে। সেখানে এইরূপ দেখিয়াছি যে মানুষের শুধু ঈশ্বরজ্ঞান বিকৃত হয় নাই, সকল প্রকার জ্ঞানই বিকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেখানে মানুষের সকল বিষয়ে অবনতি এবং বিকৃতি (general decline) হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানেরও অবনতি এবং বিকৃতি হইয়াছে। সকল বিষয়ে বিকৃতি এবং অবনতি ঘটিলে চিরকাল যদি শুধু নিরাকার উপাসনা চলিয়া আসিয়া থাকে তবে তাহাও বিকৃত হইয়া যায়। ইহুদীদিগের মধ্যে—আমাদের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে—এইরূপ ঘটিয়াছে। আবার যদি বল যে সাধারণ অবনতি না হইলেও শুধু মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করিতে পারে, তবে আমি বলিব যে মূর্ত্তি যখন এতই উপকারী, এতই আবশ্যক দেখা যাইতেছে, তখন, তুমি পণ্ডিত এবং সমাজ-নেতা, তোমার কর্ত্তব্য যে তুমি লোক সাধারণকে সর্ব্বদা এইরূপ সতর্ক কর যে তাহারা মূর্ত্তি দেখিয়া যেন নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হস্তপদাদি বিশিষ্ট মনে না করে। এইরূপ কার্য্য করিবার জন্যই সকল দেশে ধর্ম্মযাজক থাকে। যে দেশে নিরাকার উপাসনা সেখানেও এইরূপ কার্য্যের জন্য ধর্ম্মযাজক থাকে। মানুষকে সকল বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য চিরকালই চর্চ্চে সর্ম্মান, মস্‌জীদে খোৎবা

পতিত হইতেছে। মানুষ সকল উত্তম জিনেসেরই অপব্যবহার করিতে পারে। তা বলিয়া কি তাহাদিগকে উত্তম জিনিস দিব না? দিব। তবে অপরাপর উত্তম জিনিসের অপব্যবহার আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা থাকে, মূর্ত্তি পূজার অপব্যবহার নিবারণার্থও তেমনি উপদেষ্টা থাকা চাই। যেখানেই মানুষের ধন তাণ্ডার সেইখানেই প্রহরীর প্রয়োজন। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই প্রতিমার প্রকৃত প্রহরী। তাঁহারা যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হন, তবে তাঁহাদের সমাজের নেতৃত্ব ত্যাগ করা উচিত—তবে তাঁহারা প্রতিমার বিরুদ্ধে কথা কহিতে অনধিকারী।

আত্মদান।

"সখি রে, দারুণ বলো না তাঁয়।
অযশের কথা, শুনিলে তাঁহার
পরাণ ফাটিয়ে যায়।
কুশাঙ্কুর যদি শ্যামপদে বিঁধে
শেল ব্যথা মোর লাগে।
শ্যামের অসুখে পরাণে আমার
কুলিশ বেদনা জাগে।
শ্যাম নাম মোর ইষ্ট মন্ত্র সই—
সে নামে আমার প্রাণ;
নিঃস্বার্থে স্বজনি সরবস মোর
শ্যামেরে করেছি দান।
নিঃস্বার্থে সর্ব্বস্ব দান,
কি মধুর কথা সই!
সরবস ধন, জগতে স্বজনি
যে পারে দানিতে পরে,
তার সম লোকে কে আছে বল না
মোক্ষপদ তার তরে।
দিয়াছি কি আমি পরে?
শ্যামে পর বলা, সহে না স্বজনি
হৃদয়ের ধন মম;
অন্তরে, অন্তরে শ্যামমূর্ত্তি জাগে
শ্যাম মোর প্রিয়তম।
এ হেন রতনে কলঙ্কের দাগ
সহে কি স্বজনি বল;—
রাধিকারমণ, যদি অপবাদ,
জীবনে কি তবে ফল?
সখি,—
মরিব মরিব, কত মনে করি
মরিতে পারি না সই।
মরণের ফল [illegible] যথার্থ
[illegible]কির উদ্দেশ্য।
জানহা[illegible] নহে। সে [illegible]

ভাবি মরণ ত নহে ভাল।
মরিলে আমার প্রাণেশে গো সখি
যতন করিবে কেবা;
দাসী মলে সই প্রাণেশে আমার
কে আর করিবে সেবা?
বাঁশরী শুনিয়া উনমত হয়ে
কে ছুটে আসিবে তবে?
দাসীর কারণে কাঁদিলে প্রাণেশ
কে তাঁরে বুঝায়ে কবে?
কুলে দিয়া জল, গঞ্জনা না মানি
শ্যামপদে সারধন—
আপনা ভুলিয়া দেহ মন কেবা
দিবে সখি বিসর্জ্জন।
শ্যামের অসুখে কার প্রাণ আর
শেলের বেদনা পাবে;
শ্যাম সুখে সই পরম হরষে
কেবা বল সুখী হবে।
প্রাণেশের তরে গঞ্জনা স্বজনি
অঙ্গের ভূষণ মম;
সহিব কলঙ্ক জন্মে জন্মে যেন
পতি পাই শ্যাম সম।
লোকে জানে রাই অসতী রমণী
না ভাবে পতির নাম।
কিন্তু, শ্যাম বই রাই, অন্যে নাহি জানে
রাধা-প্রাণ-পতি শ্যাম।"
উরস তিতিয়া নয়ন সলিল
পড়ে দরদর ধারে।
কতই যতনে প্রবোধিলা সখী
থামাইতে নারে।
করিব।
মনা সেখানেও
সুমধুর রব
বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য

উঠিয়া কিশোরী ছুটিবারে যায়
ধাইয়া সে রব পানে।
"শ্যামের বাঁশরী বাজিতেছে শুন
চল গো স্বজনি চল;—
কি হবে হেথায় চল গিয়া দেখি,
শ্যামচাঁদ নিরমল।
না রহিব আর ঘরে।
শ্যামের বাঁশরী শুনিলে গো সখি
পরাণ কেমন করে।"
সখী কহে ধীরে "শুন লো রাধিকে
কেন হলি পাগলিনী?
প্রাণনাথ তব আসিছেন অই,
শুন শ্যাম-সোহাগিনি,—
যুগল মিলন দেখিব লো আজি,
ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্যাম
দাঁড়াবে; বামেতে দাঁড়াইবে তুমি,
কিবা রূপ অভিরাম!
সেই—
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ মিশামিশি রূপ
দেখিব নয়ন ভরি,—
কিবা—
তমালে যেন বা কনক লতিকা
জড়াবে আদর করি।
আহা—
জলদের কোলে দামিনী যেন বা
সেরূপ দেখিব সবে।
কত—
আহ্লাদে মাতিয়া, গগন পূরাব
'জয় রাধাকৃষ্ণ' রবে।"
আসিলা মাধব বাহু পাশে রাই
জড়াইলা শ্যাম গলে;
কহিলা কাতরে শ্যাম মুখে চাহি
নয়ন পূরিল জলে।

"প্রভু—
তোমার কারণে যে কলঙ্ক তাহা
দাসী তব বহুমানে,
দাসীর কারণে কলঙ্ক তোমার
প্রাণেশ সহেনা প্রাণে।
কালা কলঙ্কিনী রাই !
নাথ—
কালা কলঙ্কিনী অগৌরব নহে
গৌরবের কথা মোর ;
কিন্তু,রাধিকা-কলঙ্কী তোমারে বলিলে
দুঃখের না রহে ওর।
ঘুচাও সে ব্যথা তুমি না ঘুচালে
কে ঘুচাবে আর বল
রাধার বেদনা ?— নিজ প্রাণ চেয়ে
রাধারে কে বাসে ভাল ?
প্রভু,—
প্রেম যে কেমন জানিনু এখন
কে জানিত নাথ আগে ?
ভালবাসি যারে তাহার কলঙ্কে
এতই বেদনা লাগে !!
সবে বলে প্রেমে পাপ !
ভালবাসি তোমা হৃদয় ভরিয়া
পাপ ইথে নাহি জানি।
প্রাণ যারে চায়, ভালবাসি তায়
পাপ ইথে নাহি মানি।
না সহে লোকের যদি,
আগে কেন তবে কহিল না মোরে
তা হলে এ পথে কভু:
[illegible]াসিত কি রাধা ?— কলঙ্ক তোমার
হ'ত না ত তবে প্রভু।"
[illegible]তই আদরে কপোল চুমিয়া
কহিলা কেশব "রাধা

স্বরগের সুখ ছাড়ি প্রিয়তমে
তব প্রেমে আছি বাঁধা।
কে বলে প্রণয়ে পাপ ?
আত্মদান মহাপুণ্য ফল !
আত্মদানে রাই পাপ যদি হয়
এ জগতে কিসে তবে,
কোন্ কর্ম্মবলে সুখী হবে লোকে
কিসে পুণ্য হবে ভবে।
আত্মদান অমূল্য রতন ;
মহাপাপী এই রত্ন বিনিময়ে
লভে রাই স্বর্গ ধন।
পাপ কলিকালে, জগাই মাধাই
জন্মিবে দুজন নর ;
ব্রহ্ম নারী বধ আদি পাপাচারে
রত হবে নিরন্তর।
এ তত্ত্বের কথা শুনিবে যখন
নিতাই নিমাই কাছে,
ইহারি লাগিয়া পাপব্রত ছাড়ি
ফিরিবে তাদের পাছে।
জগাই মাধাই নিজচিত্ত যবে
করিবে আমারে দান,
আলিঙ্গন দিয়া স্বরগে পাঠাব
তুষিব তাদের প্রাণ।
কাঠ বিড়ালীরা ক্ষুদ্র বনপশু
আত্মদান গুণে রামে
বাঁধিল, লভিল অতুল সুখ্যাতি
দেখ এই ধরাধামে।
পদ্মহস্তে রাম পরশিলা গায়
তুষিলা আদরে কত ; [illegible]
আত্মদানে রাই [illegible] উদ্দেশ্য।
দে[illegible]। [illegible]

আত্মদান চিত্তবিনিময়—
শুন বিনোদিনি এই তত্ত্ব লোকে
শিখিবে; ঘুচিবে ভ্রম;
আপনা পাশরি কে বল অপরে
ভালবাসে তব সম ?
কলঙ্ক দহনে সদাই জ্বলিছ
তবু মোরে ভালবাস;
নিকুঞ্জ কাননে বংশীরব শুনি
উতলা হইয়া আস।
শমী বৃক্ষ যথা আপনি পুড়িয়া
ছায়া দান করে পরে;—
প্রণয়ে পুড়িয়া আপনি প্রেয়সি,
এ প্রেম শিখালে নরে।
তব প্রেম দেখি জগতের লোক
প্রণয় শিখিবে রাই;
এ প্রেম শিখাতে গোলোক ছাড়িয়া
ভূতলে এসেছি তাই।
আত্মদান,
সংসারের সার কথা এই।
এ কথা ত সবাই জানায়,—
কুসুম-সৌরভ মলয়ের বুকে
কেন গো ঢালিয়া দেয় ?
তটিনী কেন বা সোহাগে গলিয়া
সাগরে ঢলিয়া পড়ে ?
তাড়না পীড়িত ভক্ত কেন সদা
ইষ্টদেবে মনে পড়ে ?
কোথা বা তটিনী কোথা শশধর
কারিখ।.. তবে কেন বিনোদিনি,
সনা সেখানেও
বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য,

প্রেমে মত্ত হয়ে নদীর উরসে
থাকেন সদাই তিনি ?
পৃথিবীর বুকে কতই আদরে
দেখ না পর্ব্বত থাকে,
সেই—
পৃথিবী কম্পনে যায় গুঁড়া হয়ে
তবু ত ছাড়ে না তাকে।
রাই—
দুঃখ কি সাজে গো তার ?
জগতে যে জন আছে মত্ত হয়ে
মোর প্রেমে অনিবার।
কলঙ্কিনী নাম ঘুচাইব তব
সতী নাম তব রবে;
কলঙ্কিনী তোমা বলে গো যাহারা
তারা কলঙ্কিনী হবে।"
সখীগণ মিলি দিল করতালি
রাধা বসে শ্যাম বামে,—
দেখ ভক্তগণ নয়ন ভরিয়া
কিবা শোভা ব্রজধামে;—
কনক চাঁদিনী যেন বা ঢলিল
নীল জলধর গায়,
সুন্দর সুশ্যাম কূল-প্রবাহিণী
তটিনী শোভিল হায় !
মহাদেব কেশে জাহ্নবী যেন বা
সেরূপ দেখ গো সবে !
কহে ভক্ত কবি গগন পুরাও
'জয় রাধাকৃষ্ণ' রবে।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

নবজীবন।

১ম ভাগ।	পৌষ ১২৯১।	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

তত্ত্ববিদ্যা বা থিয়সফি।

আজ কাল চারিদিকে থিয়সফির আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলনে বঙ্কিম বাবু বড় অসন্তুষ্ট এইরূপ ভাব তিনি নবজীবনের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু বুঝিয়াছেন যে থিয়সফি বুঝি সাধারণ সকলকেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া যোগী হইতে পরামর্শ দেয়। ইহাই তাঁহার অসন্তোষের প্রধান কারণ। আমরা বলিতে চাই যে বঙ্কিম বাবু থিয়সফি সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। শুধু বঙ্কিম বাবু কেন অনেকেই মনে করেন যে থিয়সফি আর যোগবিদ্যা বুঝি একই পদার্থ। এই ভ্রম সংশোধন করা আমাদের কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

থিয়সফি কথাটির অর্থ তত্ত্ববিদ্যা। ওঁ তৎ সৎ, ব্রহ্মবাচক এই তিনটি বাক্য থিয়সফির মূল মন্ত্র স্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, সত্যজ্ঞান—থিয়সফির উদ্দেশ্য। সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সেই পরব্রহ্ম, যাঁহার চক্রবশে এই জগৎ ঘুরিতেছে, তাঁহার স্বরূপ জানিবার বিদ্যার নাম থিয়সফি বা তত্ত্ববিদ্যা। তৎ শব্দের বাচ্য সেই ব্রহ্মের ভাবের নাম তত্ত্ব (তৎ+ত্ব)। যে যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব লইয়া এই জগৎ গঠিত তাহার আলোচনার নামই তত্ত্ববিদ্যা। "সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ" ইহা থিয়সফিষ্ট পত্রিকার শিরোবচন। সৎ শব্দের বাচ্যও সেই পরব্রহ্ম এবং এই সতের ভাব সত্য। এবং যথার্থ সত্য কি, তত্ত্ব কি, ইহা অনুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ থিয়সফির উদ্দেশ্য। কেবল যোগবল লাভ করা থিয়সফির উদ্দেশ্য নহে। যে পথ অবলম্বনে

অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগবলে সাধন করা যায় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মা না, থিয়সফিষ্ট সে পথ অবলম্বন করিতে চান না।

থিয়সফি বা তত্ত্ববিদ্যায় সকলকে কিরূপ পথে চলিতে উপদেশ দে দেখা যাউক। থিয়সফির উদ্দেশ্য কথন তিনটি।

১ম। প্রেম বৃত্তির সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জগৎে ভালবাসিতে শিখ। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী অহিফেনের ঝোঁকে একদি বুঝিয়াছিল যে নিত্যসুখ বা নিত্যপদার্থ পাইবার এই বই অন্য পথ নাই এ কথাটি নূতন নহে। কথাটি নূতন নহে বটে কিন্তু কটা লোক এই কথায় যায়ী কার্য্য করে? কিন্তু যাহাতে লোকে এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিতে পা সেইজন্য এখন থিয়সফি যুক্তি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে দেখাইতে যায় যতদিন না পুরুষ

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

ততদিন তিনি নিত্যসুখ পাইতে পারেন না বা অনাদি কারণ ব্রহ্মের স্বরূ বুঝিতে পারিবেন না। এখন দেখ ইহাই যদি থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য হ তবে কি থিয়সফির আন্দোলনে কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

২য়। প্রাচীন ঋষিগণ-প্রণীত শাস্ত্র সমূহে একেবারে অশ্রদ্ধা না করি সেই শাস্ত্রসমূহ বুঝিতে চেষ্টা কর। তাঁহারা ব্রহ্ম-নিরূপণ বিষয়ে আধুনি বিজ্ঞানবিৎ অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সম শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে আরম্ভ কর, তাহার ভিতর হইতে অনেক রত্ন পাই পারিবে। তাহার সাহায্যে তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের পথে আলোক দেখি পাইবে।

এই কথা যাঁহারা একেবারে মানিতেন না, অর্থাৎ শাস্ত্রাদি সকল কেব কুসংস্কার এবং মূর্খ লোকের মূর্খতায় ভরা এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস ছি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজ কাল স্বীকার করিতেছেন যে, শাস্ত্রাদিতে সকল কথা একেবারে অলীক বলিয়া বোধ হইত তাহা বাস্তবিক সব অলী নয়। ম্যাডাম ব্লাবাট্‌স্‌কি তাঁহার যোগবলের যে মধ্যে মধ্যে পরিচয় দিয়া ছেন তাহা কেবল ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্র সমূহে সাধারণের কথঞ্চিৎ বিশ্বা জন্মাইবার জন্য। ঐরূপে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হওয়াতেই শাস্ত্রালোচনা করা আ বৃথা সময় নষ্ট করা যে একই কথা তাহা আর অনেকে বলেন না। এ

দেখ যদি থিয়সফির আন্দোলনে লোকের শাস্ত্রানুশীলন কথঞ্চিৎও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তবে থিয়সফির আন্দোলনে কি কাহারও অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত?

৩য়। আমাদের আভ্যন্তরিক শক্তি সমূহের মধ্যে অনেকগুলি উচ্চতর বৃত্তি আদৌ অঙ্কুরিত হয় নাই। সেই সমস্ত শক্তির স্ফুরণের চেষ্টা কর।

এই তিনটি কথা লইয়া থিয়সফি সভা। এবং যিনি নিজে এই তিনটি উপদেশ-বাক্যানুযায়ী কার্য্য করেন এবং তদ্দ্বারা নিজের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উন্নতি সাধন মানসে উক্ত তিনটি উপদেশ বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম লোকের হৃদয়ে রোপণ করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই যথার্থ থিয়সফিষ্ট।

অনেকে বলেন যে, যে তিনটি লইয়া থিয়সফি সভা তাহার মধ্যে প্রথমটিত সকল ধর্ম্মেই আছে। আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিবে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখিবে, এইরূপ উপদেশ ত সকল ধর্ম্মেই আছে, তবে থিয়সফির এটি নূতন কথা নহে। শাস্ত্র আলোচনা করা—তাহা থিয়সফিষ্ট না হইয়াও ত অনেকে করিতেছে। এ দুটি থিয়সফির আসল উদ্দেশ্য নহে। তবে যোগবলাদি যে সকল শক্তির বিকাশ করিবার কথা উহাঁরা বলেন, তাহাই থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা থিয়সফি সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, যে থিয়সফির প্রথম কথাটিই অর্থাৎ "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দেখিতে চেষ্টা করিবে; এই কথাটিই থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্য দুইটি ঐ প্রথমটির সাধনের উপায় মাত্র। সকল ধর্ম্মেই বলে বটে তত্ত্ববিদ্যা প্রভাবে সকল ভূতকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিবে, কিন্তু ঐ কথাটির যে কতদূর মাহাত্ম্য তাহা সকলে স্পষ্ট বুঝিতে পারে না। সেই মাহাত্ম্য আজ থিয়সফি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া আজ কালকার সমাজের অন্ধকারে আবৃত প্রাচ্য বিজ্ঞান তত্ত্ব যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থিয়সফি দেখাইতে চায় যে, তুমি আর আমি একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন ভাব যে তোমাতে আমাতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। কিন্তু থিয়সফি দেখাইতে চায় যে, তোমাতে আমাতে এমন সম্বন্ধ আছে যে, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যাহাকে তুমি কখন দেখ নাই, যাহার বিষয়ে তুমি কিছুই জান না, এখন তুমি মনে কর যে তাহার

সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যায় দেখাইতে চায় যে, এরূপ লোক যাহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই মনে কর, তাহারও সহিত তুমি একসূত্রে গাঁথা। সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের চিন্তাপ্রসূত শক্তি কত সময়ে তোমাকে সদসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারে তাহা তুমি এখন কিছুই জান না। আমার একটি অঙ্গুলির সহিত অন্য অঙ্গুলির যে সম্বন্ধ তোমাতে আমাতে সেইরূপ সম্বন্ধ। আমার দুইটি অঙ্গুলিই যেমন এক স্নায়ুযন্ত্রের অধীন, সেইরূপ আমি ও তুমি উভয়েই এই জগৎ শরীরের অন্তস্তলস্থ একটি স্নায়ুযন্ত্রের অধীন। কত কত অদ্ভুতশক্তি সম্পন্ন আকাশ জগতের এই স্নায়ুযন্ত্র। যদি আমার একটি অঙ্গুলি বিষাক্ত হয়, তবে আমার অন্য অন্য অঙ্গুলি যে সতেজ থাকিবে না ইহাও যেরূপ নিশ্চয়, সেইরূপ তুমি যদি তোমার পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও তবে তাহা জগতের অন্তস্তলস্থ নিয়মের বলে আমারও অনিষ্টকর হইবে। গুণময়ী প্রকৃতির ক্ষেত্রে চৈতন্যের আভাস্বরূপ যে বীজ নিহিত হওয়াতে এই প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে, সেই একমাত্র বীজ হইতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ তুমি আমি সকলেই উদ্ভূত। ইহাদের মধ্যে কেহ বা পত্র কেহ বা মূল কেহ বা ত্বক কেহ বা শাখা এই মাত্র প্রভেদ। এই প্রপঞ্চ একটি বৃক্ষ স্বরূপ; তত্ত্ববিদ্যায় এই শিক্ষা দেয় যে মনুষ্যত্বই এই প্রপঞ্চের বীজ এবং মনুষ্যত্বই আবার এই বৃক্ষের ফল। তাই তত্ত্ববিদ্যায় বলে, যে এস ভাই সব এস জীব জন্তু উদ্ভিদ দেব গন্ধর্ব্বাদি তোমরা সকলে, সকলে মিলিয়া এই প্রপঞ্চ বৃক্ষে সুন্দর ফল ফলাইবার চেষ্টা করি। জগতে যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ যাহাতে হয় তাহাই করি। সকলের চেষ্টা, সকলের কামনা এই এক দিকে প্রণত কর তবেই সকলে যথার্থ সুখী হইতে পারিবে। ক্ষুধা পাইলে যে আহার করিবে তাহাতেও যেন সেই সেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনোদ্দেশ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারে বেষ্টিত হইয়া থাকিতে চাও—তাহাও যেন সেই উদ্দেশ্যে করা হয় কিম্বা যদি সংন্যাস অবলম্বনে প্রবৃত্তি জন্মে তবে তাহাও যেন সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ কারণ বশতই হয়, অন্য কোন কারণে না হয়।

মনে করিয়া দেখ জিহ্বা আমার শরীরের একটি অঙ্গ মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদ গ্রহণে জিহ্বা বড় সুখ বোধ করে। কিন্তু জিহ্বা যদি অন্যান্য সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল নিজের সুখে লক্ষ্য রাখিয়া রসাস্বাদনে মত্ত হয়, তবে দেহ শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং

সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকেও কষ্ট পাইতে হয়। সুতরাং রসাস্বাদ গ্রহণে সুখ লাভ করা যেন জিহ্বার প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। সমগ্র জগৎ রূপ শরীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া তুমিও কেবল তোমার সুখ লালসা বশতঃ কার্য্য করিতে যাইও না। যেমন সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে চলিলে জিহ্বা রসাস্বাদন সুখে একবারে বঞ্চিত থাকে না, সেই রূপ তুমি যদি সমগ্র জগতের হিতকামনা করত কার্য্য করিতে থাক তবে তোমাকেও যে অধিকাংশ সময় তোমার সুখপ্রদ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। জগতস্থ সবই আমার—এই জ্ঞান যাহাতে জন্মে তাহার চেষ্টা কর। সমগ্র জগতের উন্নতিই যেন তোমার লক্ষ্য থাকে। নিজের সুখ খুঁজিয়া বেড়াইবার দরকার নাই। দুঃখ যেমন না চাহিলেও আসে, সুখ তেমনি বিনা কামনায় আসিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

তোমাতে আমাতে একসূত্রে গাঁথা সুতরাং পরস্পর পরস্পরের সুখ কামনা করিব। কিন্তু কিরূপ সূত্রে গাঁথা তাহা যদি স্পষ্ট না বুঝিতে পারি, তবে কি পরিমাণে আমি তোমার সুখ কামনা করিব স্থির করিতে পারি না। তুমি আর আমি একই সমাজসূত্রে বদ্ধ, সেই জন্য যদি আমার সুখ তোমার সুখের উপর নির্ভর করে বুঝি, তবে সামাজিক নিয়ম গুলি উল্লঙ্ঘন না করিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যায় দেখাইতে চায়, যে, এক সমাজসূত্রে তোমরা বদ্ধ থাক আর নাই থাক, তুমি যদি হিমালয় গহ্বরে নির্জ্জনে বাস কর আর আমি যদি কোলাহল পূরিত রাজধানীতে থাকি, আমরা উভয়ে কোন সমাজসূত্রে বদ্ধ না হইয়াও, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এক গাছি রজ্জুতে আবদ্ধ। সেই রজ্জু কি তাহা, তত্ত্ববিদ্যার পুনরুদ্ধার মানসে থিয়সফি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। থিয়সফির মধ্যে যে যোগবল প্রদর্শনের কথা বার্ত্তা শুনা যায় তাহা এই তত্ত্ব, যন্নিবন্ধন তুমি আমি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও বাস্তবিক অভিন্ন; সেই তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার বাসনায় ইহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সকলে যোগী হও এই শিক্ষা দিবার জন্য নহে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে, ইহা বুঝাইয়া থিয়সফি বলিতে চায়, "যদি জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাও তবে প্রেমের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাও, তোমার অন্তরস্থ প্রেমের আলোক সমস্ত জগতে বিকীর্ণ হউক, তবে বুঝিতে পারিবে যে সেই পরব্রহ্ম কিং স্বরূপ।"

কিন্তু আবার দেখ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত আমার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে জানিলেই যে আমি আমার প্রেম ভাব সর্ব্বত বিস্তৃত করিয়া যেখানে যেমন উচিত সেই থানে সেইরূপ প্রেমরস ঢালিতে পারিব তাহা নহে। মনে কর একজন নরহন্তা মহাপাপী এবং একজন মহাপুণ্যশালী মহাত্মা; উভয়কেই কি এক ভাবে আমায় দেখিতে হইবে? পায়ের একটি অঙ্গুলির প্রতি যেরূপ যত্ন আবশ্যক, চক্ষের উপরও কি সেইরূপ যত্ন আবশ্যক? না তদপেক্ষা বেশী যত্নের প্রয়োজন? বাস্তবিক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত কি কি স্থলে কি কি সম্বন্ধে বদ্ধ, তাহা সবিশেষ জানিলে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কখন কি কর্ত্তব্য তাহা ঠিক বুঝা যায়, সেইরূপ জগতের হিত কামনায় যদি প্রেমভাব সর্ব্বত বিস্তৃত করিতে চাও, তবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কোন্ স্থলে কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। যে পথে চেষ্টা করিতে হইবে সেই পথ থিয়সফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য-কথন দেখাইতে চায়। তোমার আন্তরিক যে সকল শক্তির এখনও অঙ্কুর পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই ক্রমে ক্রমে তাহার বিকাশের চেষ্টা কর। আন্তরিক শক্তির যতই বিকাশ জন্মিবে ততই বাহ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। অন্তর্জ্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বহির্জ্জগতীয় পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানই সময়ে সময়ে বলরূপে প্রকাশ পায়। কেন না knowledge is power জ্ঞানবলং মহাবলং। এই জ্ঞানজনিত শক্তির প্রদর্শন একটু অসাধারণ হইলেই তাহার নাম যোগবল হইয়া পড়ে। বাস্তবিক একটু যাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে থিয়সফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য-কথনটি যোগবল লাভের জন্য নয়, তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে জগতের হিতসাধনার্থ।

থিয়সফি আর তত্ত্ববিদ্যা একই কথা। থিয়সফি আজ নূতন কথা কিছুই প্রচার করিতেছে না। আর্য্যশাস্ত্র সমূহে যেসকল তত্ত্বকথা আছে সেই সমস্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই থিয়সফির প্রচার আবশ্যক। এই জন্যই থিয়সফির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-কথন আর্য্যশাস্ত্র সমূহ আলোচনার পরামর্শ দেয়। তত্ত্ববিদ্যার আন্দোলনে হিন্দুমাত্রেরই সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে।

শ্রীপুং কালীবর বেদান্তবাগীশ

সরল বিশ্বাসের উপাসনা।

মনুষ্যের বুদ্ধির দ্বিবিধা গতি। একটি তর্ক সংস্কৃত এবং চঞ্চল, অন্যটি সরস ও একনিষ্ঠ। যদিও প্রথমোক্ত বুদ্ধি জনসমাজে আদরণীয় কিন্তু শেষোক্তবুদ্ধিই সদ্গতির হেতুস্বরূপ। যে ব্যক্তির বুদ্ধি শেষোক্ত প্রকার, তাঁহাকে হয়ত লোকে দর্শনজ্ঞান-বিহীন মূর্খ বলিয়া জানে; কিন্তু তিনিই সাধু। তর্ক-বিশিষ্ট বুদ্ধিতে ভাগবতী-মতি উপার্জ্জিত হয় না। বেদ কহেন "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"। এই মতি তর্কে লাভ হয় না। মানব তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা কেবল অনর্থক বিষয়ে ঘূর্ণায়মান হন, কেবল হেতুবাদে বিমোহিত হন। কেবল সাংসারিক স্বার্থবশে ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রয়োজনানুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রয়োজনানুসারে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু একনিষ্ঠা বুদ্ধির নিকটে তর্ক নাই, স্বার্থ নাই, হেতুবাদ নাই, প্রয়োজন নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যাখ্যান নাই। এইরূপ বুদ্ধির সম্মুখেই অবিদ্যা বিদারিত হইয়া ঈশ্বরের প্রভাব বা আবির্ভাব উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। মনুষ্য ঐ বুদ্ধির দ্বারা সূর্য্যকেও ঈশ্বর বোধ করিতে পারেন, সমুদ্রকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন, নরবিশেষকেও ঈশ্বর জ্ঞান করিতে পারেন অথবা নিরাকার নিরঞ্জন ভাবেও ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল ঈশ্বরের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি। ঈশ্বর কিরূপ, নিরাকার কি সাকার, মনুষ্য কি দেবতা, জড় কি চৈতন্য—এই সকল প্রশ্ন তাঁহার সে বুদ্ধির অঙ্গ নহে। সুতরাং তিনি ঐ সকল বিষয়ের বিচার দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ করেন না। ঈশ্বর জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন—তিনি সন্দেহ শূন্য জ্ঞান-নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছেন—তাঁহার জ্বলন্ত সত্তা হৃদয়ে ধারণা করিতেছেন। তাহাতে আবার কোন্ কথার তর্ক, কোন্ কথার মীমাংসা করিতে হইবে? অতএব "জ্বলিতমস্তক পুরুষের জলাশয়ে গমনের ন্যায়" তিনি পথ ঘাট না দেখিয়া, কণ্টক-বন ভাঙ্গিয়া, একেবারে সেই শীতল পরমার্ণবে ঝম্প প্রদান করেন। তিনি কেন সূর্য্যকে পাপঘ্ন বলিয়া ডাকেন, কেন রামচন্দ্রকে নারায়ণ বলিয়া সম্বোধন করেন, তদ্রূপ অনীশ্বর-উপাধিতে ঈশ্বর বোধ করাতে কি দোষ হয়, কি পাপ হয়, সে সকল প্রশ্ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় না। তর্কপ্রিয় বুদ্ধিমানেরা তাদৃশ কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়ত তাহার

কোন উত্তর দিতে পারেন না। তাহাতে লোকে তাঁহাকে একজন অতি গণ্ডমূর্খ, আলাপের অনুপযুক্ত, অসভ্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু তিনিত ঈশ্বরে ডুবিয়াছেন। তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, নরবিশেষ, জীববিশেষ, অথবা প্রতিমায় ঈশ্বর বোধ করিয়া পূজা করাতে প্রখর-বুদ্ধি বিদ্বানেরা মনে করিতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হইতেছেন। কিন্তু তাহা নহে। হে বিদ্বান্! তুমি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতেছ ঐ তিনি সকল জড় পদার্থের ও উপাধির পূজা করিতেছেন, ফলে, সেরূপ ভাবিয়া তুমি নিজেই প্রতারিত হইতেছ। জান না সুদৃঢ় সরল উপাসক জলে, স্থলে, সূর্য্যে, নরবিশেষে, শক্তিবিশেষে, বা প্রতিমাতে পরমেশ্বরের জাজ্বল্যমান অবতীর্ণ-প্রভাব ও আবির্ভাব দৃষ্টি করত সেই অচিন্ত্য অনুপম প্রভাবেরই পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই পূজা কোন ভূত-পদার্থ, প্রতিমা, প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি, নরনারী প্রভৃতি উপাধির উদ্দেশে নহে। তাহা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠা বুদ্ধিই ঐরূপ অতর্কিত সরল উপাসনার প্রসূতি। যদি ঈশ্বরে প্রবল অনুরাগ না থাকে, তবে কি তিনি যাহাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে পারেন? যদি ঈশ্বর থাকার অখণ্ড বিশ্বাস হৃদয়ে না থাকে, তবে কি তাদৃশ উপাসক যেখানে সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে সক্ষম হন? তাদৃশ সাধকের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস, জ্বলন্ত অনুরাগ, একনিষ্ঠা বুদ্ধি আছে তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তার্কিকেরা মনে করেন তিনি বুঝি প্রকৃত ঈশ্বর ত্যাগ পূর্ব্বক ভৌতিক পদার্থ ও স্বকপোল-কল্পিত প্রতিমার আরাধনা করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদের বুদ্ধি অতি জঞ্জাল গ্রস্ত। তাঁহারা জনসমাজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেচক, চিন্তাশীল, দর্শনবিৎ, বিজ্ঞ, ইত্যাদি শ্রুতি সুখকর আখ্যা লাভ করিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন না। এই বর্ত্তমান সময়ে অনেক নিরাকার-বাদী মহাত্মারা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সত্তাতে নিসংশয় হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ঈশ্বর কিরূপ এই প্রশ্ন লইয়াই বিব্রত। অথচ তাঁহারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্ত নিরীশ্বর গ্রন্থ সমূহের প্রতি যত নির্ভর করেন তত সেশ্বর শাস্ত্রের প্রতি নহে। কেহ কেহ বা কিছু কিছু ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ঘোরতর চিত্তচাপল্য ভেদ পূর্ব্বক তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কেবল সাকারোপসনার দোষ ঘোষণা, সমাজ সংস্কার, স্বাধীনতা, ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্দোলনে জীবন গত করিলেন। আপনারা যে

নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসক তাহাই মনে করিয়া অহঙ্কারে বঙ্গে গৃহ-বিচ্ছেদ করিলেন এবং দর্শে ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। কিন্তু তাদৃশ সহস্রের মধ্যে দশজন ব্যক্তি, একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদীর ন্যায়, ঈশ্বরকে জলন্ত ভাবে হৃদয়ে অনুভব করেন কিনা তাহা সন্দেহ স্থল। ফলত সাকার ও নিরাকার এই উভয় বাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই। ঈশ্বরকে হৃদয়ে দর্শন, স্পর্শন ও অনুভব করাই উপাসনার সার উদ্দেশ্য। অত-এব একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদী যেমন অনন্যবুদ্ধিতে ঈশ্বর দর্শন করেন, যেমন তর্ক যুক্তি এবং বাদানুবাদের পক্ষে অন্ধ হইয়া ঈশ্বরের পক্ষে হৃদিনেত্র উন্মিলিত রাখেন;—ঈশ্বর আছেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে হইলে সেইরূপ অনন্যবুদ্ধি,' বাহ্যান্ধতা এবং অন্তর্জ্যোতির প্রয়োজন। সংসার, স্বার্থ, হেতুবাদ, ব্যবহার, পদার্থ ও অর্থবাদ সম্বন্ধে যিনি জাগ্রত, তাঁহার জানা থাকিতে পারে যে ঈশ্বর আছেন। তিনি গ্রন্থাধ্যয়নের বলে বা হেতু-বাদ সহকারে বলিতে পারেন যে ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, নিরবয়ব এবং মঙ্গল-ময়। কিন্তু চঞ্চলচিত্তবশত দৃষ্টিবিক্ষেপ জন্য, একনিষ্ঠ নিস্তরঙ্গ বোধাভাবে সেই প্রেমময়কে দেখিতে পান না। তিনি তাঁহার সমুদয় ব্যুৎপত্তির সহিত কেবল বাহ্যজ্ঞানে জাগ্রত কিন্তু পরমার্থে নিদ্রিত। ফলে ঈশ্বরে যাঁহার একনিষ্ঠা বুদ্ধি তিনি সংসারে যুক্তি ও তর্করাজ্যে এবং ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ বিষয়ক বিচারে নিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরেই তিনি জাগ্রত এবং ঈশ্বরই তাঁহার বিচরণের জলন্ত ক্ষেত্র। তাঁহার সেই বিশ্বাসের বলেই তাঁহার অবলম্বিত প্রতিমাদি উপাধি সমস্ত বিদারণ পূর্ব্বক, ভগবান দর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, হিতাহিত-বোধ-শূন্য, তর্কসিদ্ধান্ত-শূন্য একনিষ্ঠ অনুভবই তাঁহাকে জয় দান করে। প্রখর বুদ্ধিমানদিগের যেখানে বহুদিনান্তে একবারও ঈশ্বরে সমাধিস্থ হওয়া অসম্ভব, যেখানে তাঁহাদের শিক্ষিত ও শ্রুত ঈশ্বরকে একবারও হৃদয়ে অনুভব করা অসম্ভব, সেখানে সেই ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ বিশ্বাসীর পক্ষে পরমেশ্বরের জলন্ত সত্তা ও ত্রাণকর্ত্তৃত্ব হৃদয়ঙ্গম করা নিত্য সম্ভব। তিনি প্রতিমা বা সূর্য্যাদি দেবতাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাকে জড়োপাসক বলিও না। কেন না, সেই আবির্ভাব যখন তাঁহার অন্তরস্পর্শী হয়, তখন তাহা নিরাকার চৈতন্যময়-রূপেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার হৃদয়ে সেই আবির্ভাব প্রেমপূর্ণ, রসময় এবং বাক্যমনের অগোচরভাবেই উপনীত হয়। সেই আবির্ভাব

কি সূর্য্যের অথবা প্রতিমাদির আবির্ভাব? প্রতিমা কি তেমন সরস ভাবে হৃদয়ে আসিতে পারে? সূর্য্যদেবতা অথবা গঙ্গা নদী কি তেমন মনোহর ভাবে হৃদয়ে স্পর্শিত হয়? প্রতিমার আবির্ভাব চেতনহীন অবয়ব মাত্র। সূর্য্যের অবির্ভাব মণ্ডলাকার তেজোময় মার্ত্তণ্ড মাত্র। গঙ্গানদীর আবির্ভাব তরল তরঙ্গিণী নদী মাত্র। এই সকল ব্যবহারিক অচেতন অবয়ব কি সাধকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে? না, তত্রাবির্ভূত ভগবান নিরাকার, চৈতন্যময় ও করুণাময় রূপে সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন? প্রতিমা, অবতার ও সূর্য্যাদি যে কোন উপাধির অবলম্বনে সাধক উপাসনা করুন, উপাসনা ঈশ্বরেরই; সাধকের দৃষ্টিতে সকল উপাধিতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং সাধক সেই আবির্ভাবেরই পূজা করিয়া থাকেন, উপাধির নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সদাকালই সকল পদার্থে ও সকল জীবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে। কেবল সেই সমস্ত আবির্ভাবেই যে নরহৃদয় মোহিত হয় এমত নহে। মানবের স্বীয় হৃদয়ে যে পরমাত্মা বিরাজিত আছেন, অচঞ্চল ধীরচিত্তের সেই দিকে একনিষ্ঠা বুদ্ধি হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে সেই বুদ্ধি বহির্জ্জগতে প্রেরিত হইয়া পদার্থ, গুণ, শক্তি ও জীব প্রভৃতি উপাধি বিশেষে সেই প্রাণসখার চরণ বন্দন করে। তাহা সূর্য্যমণ্ডলে জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতাকে প্রকাশ করে। পর্ব্বতে, নদীতে, বৃক্ষবিশেষে ও নরবিশেষে তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়। পবিত্র দেবমন্দিরে প্রতিমাতে তাঁহাকে প্রকাশ করে এবং সর্ব্বপ্রকার অর্চ্চনা কালে তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া দেয়। মানব স্বীয় জ্ঞানানুসারে স্বীয় হৃদয়েরই উত্তেজনায় দেবতা অবতার বা নরবিশেষে ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু হৃদয়ে তর্ক প্রবেশ করিলে সকলই শূন্য ও অনীশ্বর বোধ হয়। হেতুবাদ-লোভী পুরুষ অহৈতুকী বৈষ্ণবী মতি ধারণে অক্ষম হয়েন। সুতরাং তাদৃশ চঞ্চলচিত্ত জনের হৃদয়ে তখন এই পরামর্শ উপস্থিত হয়, যে পরমেশ্বরকে স্বরূপত উপাসনা করাই বিধেয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতিতেই ঐশ্বরীয় স্বরূপ রসবৎ প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞান ও ভক্তি তর্কেতে প্রাপণীয় নহে। "নৈষাতর্কেণমতিরাপনেয়া"। সেই মতির অভাবে স্বরূপ দর্শন অসম্ভব। অতএব হেতুবাদে বিমূঢ় পুরুষ স্বরূপত পরমেশ্বরের পূজার পরিবর্ত্তে শূন্য ঈশ্বর নামের উপবাচক হন। সেই উপবাচকতা যত অভিমানে তত হৃদয়ে

প্রতিষ্ঠিত নহে। হৃদয়হীন পুরুষ তর্ক সহকারে উপাধি "নেতি নেতি" পূর্ব্বক ঈশ্বরকে রচনা করেন। সহৃদয় সাধু সেই রসস্বরূপকে লাভ করিয়া সতর্কে "নেতি নেতি" বলেন না, কিন্তু ব্যবহারিক দেবতা, অবতার ও প্রতিমা প্রভৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক তৎসারভূত ভূতাতীত ভগবানকে লাভ করেন। তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে দেবতা প্রভৃতি আপনা আপনি "নেতি নেতি" হয়। কেন না তাঁহার জ্ঞান ও প্রেম উপাধির উপযাচক নহে। তাহা উপাধের স্বরূপ রসেরই প্রার্থী। মধুলোভী ভৃঙ্গ যেমন কমলের কমনীয় কান্তিতে ভ্রান্ত হয়না—কেবল মধু লাভই তাহার উদ্দেশ্য—সেই মকরন্দ লাভ হইলে সে যেমন স্বভাবত কমলকে ত্যাগ করে; ভগবৎ-পদ-পঙ্কজ বিগলিত সুধা-লাভ করিলে ভগবৎভক্ত ভাগ্যবানের নিকটে উপাধি স্বরূপ দেব, অবতার ও প্রতিমাদির বাহ্যভাব সেইরূপ স্বভাবত পরিত্যক্ত হয়। নতুবা তৎসর্ব্বত্রে ভগবানের পবিত্রাবির্ভাব সত্তে তিনি কোন্ বুদ্ধিতে সে সমস্ত ত্যাগ করিবেন? একথার সংক্ষেপ-তাৎপর্য্য এই যে, অলি যদি পুষ্পকে ত্যাগ করে তবে তাহার যেমন মধুলোভ তৃপ্ত হয় না, দেহকে বিদায় করিয়া দিলে যেমন দেহীর উপলব্ধি হয় না, বস্তুকে বা পদার্থকে পরিহার করিলে যেমন শক্তি ও গুণ ধারণা করা যায় না, সেইরূপ ভগবানকে পূজা করার জাজ্বল্যমান অবলম্বন স্বরূপ দেবতা ও তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা সকল পরিত্যাগ করিলে তত্রা-বির্ভূত ভগবানকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। ঈশ্বরাবির্ভাবের সহিত দেবতা, প্রতিমা বা অবতার বিশেষের সামানাধিকরণ্য বশত তৎসমুদয় গৌণরূপে লক্ষণাপ্রয়োগে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হন। অতএব প্রতিমা-পূজা, সূর্য্যের পূজা, রামকৃষ্ণাদির পূজা বলিলেই ভগবানের পূজা বুঝিতে হইবে। নতুবা মূর্ত্তিতে, সূর্য্যে, অথবা রামকৃষ্ণাদির মায়িক স্নেহে সে পূজার উদ্দেশ্য নহে। যদি মানব স্বয়ং মায়াশূন্য হন, অর্থাৎ প্রকৃতিজনিত ভেদজ্ঞান হইতে উদ্ধার পান, তাহা হইলে তাঁহার সেই জীবন্মুক্তাবস্থায় দেবতাদি পদার্থ নির্ব্বিশেষে সমদর্শিতা ও উপাধিপরিত্যক্ত অদ্বয়-ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ জন্মিতে পারে। তাদৃশাবস্থায় তাঁহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ, সূর্য্য হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু, রাম কৃষ্ণ অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরী এবং দেবালয় অবধি গৃহাঙ্গন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ব্রহ্মময় হইয়া যায়। অর্থাৎ সমস্ত উপাধি হেয় হইয়া ব্রহ্মই দৃষ্ট হয়েন। কিন্তু যতদিন তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততদিন দেবতা, প্রতিমা ও অবতার বিশেষের অবলম্বনে অথবা

মূর্ত্তিমান পদার্থ, গুণ বা শক্তি বিশেষের ব্যপদেশে সরলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনা স্বাভাবিক। তার্কিকগণের তাদৃশ সরল-উপাসনার অধিকার হয় না। ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ সরল বুদ্ধি যেমন সূর্য্যাদি দেবতা বা নরবিশেষে অথবা পদার্থবিশেষে বা প্রতিমাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দৃষ্টি করত সামানাধিকরণ্য বশত আবির্ভাব ও উপাধি উভয়কেই একই ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করে, সেইরূপ শাস্ত্রও সগুণাধিকারে তাদৃশ ভাবে ঈশ্বরকে গ্রহণের বিধি দিয়া থাকেন। গীতা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। বিশেষত শাস্ত্র কেবল একনিষ্ঠা বুদ্ধিরই প্রতিষ্ঠা-স্থান। এই রূপ একনিষ্ঠা বুদ্ধিতে দেবতা ও প্রতিমাদির ব্যপদেশে যেরূপ ঈশ্বর-দর্শন সম্ভবে, পণ্ডিতাভিমানী ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির নামমাত্র ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সেরূপ দর্শন সম্ভবে না। এইরূপ ঐশ্বরীয় রস তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করে না। তাদৃশ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের যেরূপ অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাহা প্রায়ই শ্রবণ-করা অস্তিত্ব, হেতুবাদ বিরচিত, এবং কেবল লক্ষণা-নিষ্পন্ন। তাহা অনুভব-করা বা হৃদয়ঙ্গম-করা অস্তিত্ব নহে। যদি তাহা হইত তবে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতেন যে তাঁহারা যে পরম দেবতাকে হৃদয়ে অনুভব করত নিরঞ্জন-ভাবে উপাসনা করিতে যত্ন পান, সকল প্রকার উপাসনা তাঁহারই উদ্দেশে। নানা নাম রূপে, নানা অধিকারে তাঁহারই পূজা হইতেছে। সেই বাঞ্ছাকল্পতরু, জগদ্গুরু, চিরকাল শাখা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিজ ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এরূপ যদি বুঝিতে পারিতেন তবে শাস্ত্রেও অশ্রদ্ধা হইত না, কেন না তাহাই সর্ব্বশাস্ত্রের মীমাংসা। অতএব যিনি প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ, সর্ব্বপ্রকার ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার যোগ দেওয়া উচিত। তিনি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি দেবালয়ে সমানভাবে ব্রহ্মদর্শন করিবেন। হরিসভায় গীত শাস্ত্রপাঠ ও ব্রহ্মসমাজের বেদপাঠ প্রভৃতি সমান শ্রদ্ধার সহিত শুনিবেন এবং বৈদিক, স্মার্ত্ত, ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কর্ম্ম সকল সমান শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন। তিনি অভেদ ধ্যান জ্ঞান ও ভক্তিযোগে ব্রহ্মেতে সমন্বয় পূর্ব্বক বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। তাদৃশ অনুভবশীল, নিষ্কাম উপাসকই প্রকৃত সাধু। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম হইতে দেবগণকে ভিন্ন মনে করিয়া দেবোপাসনা করেন তিনি নামত হিন্দুধর্ম্ম পালন করেন বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। আর যিনি তাদৃশ ভেদ বুদ্ধিদ্বারা দেবগণকে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক

ব্রহ্মোপাসনা করেন তিনি উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে মনে করিতে পারেন বটে; কিন্তু আমরা তদুভয় প্রকার ব্যক্তিকে সাধু বলিতে পারি না। তাঁহারা উভয়েই সন্দিগ্ধচিত্ত, ভেদবাদী তার্কিক। তাঁহাদের উভয়েরই মনের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ব্রহ্মেতে থাকিতে পারে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যের মর্ম্ম তাঁহারা অনবগত। তাঁহারা সুদৃঢ় সরল উপাসক নহেন।

একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিরই জয়। সেই উজ্জ্বল হৃদয়-ব্যাপারের নিকটে কি তর্ক উপস্থিত করিবে? এই কথা বলিবে যে ওরূপ করিলে পৌত্ত-লিকতা বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সেটি তোমার তর্কের ফল, ভগবানের জ্বলন্ত বিশ্বাসের ফল নহে। সরল সাধক সে কথা গ্রাহ্যও করিবেন না। সরল-বুদ্ধি সাধু তো যে কোন প্রকারে হউক ঈশ্বরকে ডাকিয়া আপনার দিন কিনিয়া লইলেন, কিন্তু হে তার্কিক! তুমি কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্ক, সিদ্ধান্ত, সমাজ সংস্কার ও সভ্যতা প্রচার ব্রতেই কালক্ষেপণ করিলে। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এইরূপ সরল-উপাসনা কেবল একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-সম্পাদিত নহে, তাহা সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে নানা বিচার করিয়া অবশেষে সরল-উপাসনারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মূর্খ ও পণ্ডিতের সমান শ্রদ্ধা। মূর্খলোকে একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিতে বা বিধিনিষ্ঠ হইয়া যেরূপ দেবদেবীর পূজা করে, পণ্ডিতেরা শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহাতেই যোগ দেন। কারণ তাঁহারা জানেন বিচারত সকল উপাসনা একই ঈশ্বরে সমন্বিত। আমাদের নবীন ব্রাহ্মেরা বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন বটে, কিন্তু এত বেশি পরীক্ষা করিয়া লিতেছেন যে, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরে একনিষ্ঠা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। হয়তো এইরূপ পরীক্ষাতেই চিরকাল যাইবে এবং একবার যেটিকে ল বলিয়া গণ্য হইবে আরবার তাহাই পরিত্যক্ত হইবে। ব্রহ্মদর্শনরূপ য়ী ফল লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। সমাজ সজ্জায়, আদর্শ নির্ব্বাচনে, াতিত্যাগে ও বক্তৃতার ধূমে তাঁহারা যত ফল দৃষ্টি করিবেন, প্রকৃত সাধনা ও হ্মদর্শনে তত করিবেন না। ফলত ব্রাহ্মগণ যেরূপ তর্ক যুক্তি ও বৈষয়িক াড়ম্বরের সহিত চলিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে ঋষিসেব্য ব্রহ্মজ্ঞান ও শিক্ষার বিষয় হইবে না, কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান ক্রমেই চারিত হইবে।

পর্ব্বত।

স্থান--(পুণার পথে) বোরঘাট।
সময়—অরুণোদয়।

১

পাষাণ! তোমার পানে স্থাপিলে নয়ন,
বুঝি এই জীবনের মমতা কেমন,
বুঝি এই জীবনের কঠোর সাধনা,
বুঝি আনন্দের কিবা মধুর ধারণা।
কালের প্রবাহ হ'তে
ভাসি প্রতিকূল বাতে,
গুটিকত পাহারা তরঙ্গ মতন
ঊর্দ্ধদৃষ্টে কালগর্ভ কর অন্বেষণ।
হৃদয় খুলিয়া বিশ্ব হাসে চারিধার,
তুমি মধ্যে দাঁড়াইয়া শব স্তূপাকার।
তথাপি হৃদয় প'রে
তরুলতা আছ ধরে,
শুষ্ক হৃদিতল তব, তথাপি বিদারি
ঢালিছ অবনি বক্ষে সুশীতল বারি।
অসংখ্য প্রাণীর এই ধারাজল প্রাণ
জীবনের ধর্ম্মগুরু তুমিহে পাষাণ!

২

দেখহে নয়ন তুলি আছে আঁখি যার!
বিরাট—বিশাল ওই মূর্ত্তি মমতার!
ক্ষুদ্র সুখ দুখ হ'তে সরায়ে নয়ন,
আনন্দের অবতার কর দরশন;

ভূতলে কঠিন যাহা,
হৃদয়ে জড়ায়ে তাহা,
প্রসারিয়া শূন্যমর্ত্ত্য—বিশাল ভুবন,
পরহিত-ব্রতে রত অনন্ত জীবন।
নাহি উপভোগ সাধ—উদাসীন বেশ;
সংযমের স্তূপ—নাই ইন্দ্রিয়ের লেশ;
আত্মদানে ব্যক্ত প্রাণ,
আত্মদানে ব্যক্ত জ্ঞান,
আইস মানব ত্যজি পাণ্ডিত্যের ভাণ!
আইস সন্ন্যাসী ত্যজি স্বার্থপর ধ্যান!
গিরি পদতলে আসি কর দরশন
কি গভীর ব্রত তার, সন্ন্যাস-জীবন।

৩

হৃদয় শ্মশানে মম রে উদাস প্রাণ!
তুমিওত আজ এই কঠিন পাষাণ;
বিদীর্ণ—বিকৃত—এই হৃদয় প্রান্তরে,
তুমিওত দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রে;
তোমার ত চারি পাশে
সংসার অমনি হাসে,
প্রলয়-মথিত মম অতীত জীবন,
তুমি তার পথভ্রান্ত তরঙ্গ ভীষণ;
তুমিওত শূন্য মর্ত্ত্য ধরি প্রসারিত
স্তূপাকার শবমূর্ত্তি সদৃশ পতিত।
ওই ভূধরের মত
করি বক্ষ বিদারিত
ক্ষুদ্র সুখ দুখ তব করি পরিহার
কেন নাহি ধর তুলি হৃদয়ে সংসার?
কঠিন প্রস্তরময় অন্তর বিদারি
তৃষিত সংসারে কেন নাহি ঢাল বারি?

৪

যে বিপুল স্থানব্যাপি যন্ত্রণা তোমার,
অনায়াসে রবে তথা অনন্ত সংসার;
এই পিপাসার যদি পিপাসাই সার;
যন্ত্রণার পর যদি যন্ত্রণা তোমার;
যদিরে মরুর পাশে
কেবল মরুই ভাসে,
যেই মরীচিকা তায় ছিল সুশোভিত,
পরিণামে তাও যদি হ'ল অন্তর্হিত,
অথবা পশ্চাতে তব অনন্ত প্রমাণ
শ্মশানের পরে যদি কেবলি শ্মশান,
যেই চিতা উজলিত,
তাও যদি নির্ব্বাপিত,
তবে কোন্ অভিলাষে রে অবোধ প্রাণ
সেই যন্ত্রণায় বক্ষে কর স্থান দান!
সম্মুখে আনন্দ মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে পাষাণ
লহ জীবনের দীক্ষা আজ তাঁর স্থান।

৫

ভীম প্রভঞ্জনে মূলসহ উৎপাটিত,
ভূধর সাগর গর্ভে হইয়া পতিত,
উন্মত্ত তরঙ্গ স্রোতে উলটি পালটি,
অতল সলিল গর্ভ ধরিয়া সাপটি,
তুলি শির ধীরে ধীরে
যথা চতুর্দ্দিক হেরে—
সংসার! প্রবাহগর্ভে তেমতি তোমার!
তোমারি তরঙ্গ ধরি এপ্রাণ আমার
ধীরে ধীরে তুলি শির বারেক ফিরিয়া
সংসারের পানে আজ দেখিবে চাহিয়া;
প্রলয়ময় জীবন!
কর বেগ সম্বরণ;

হারায়েছি হৃদয়ের সকলি আমার,
হৃতসর্ব্বস্বেরে দয়া কর একবার,
দুরাশা দিয়াছি ফেলি উরস চিরিয়া,
সংসারে রাখিব আজ হৃদয়ে ধরিয়া।

৬

জড় জগতের জীব কঠিন প্রস্তরে,
জীবন ধরিয়া যদি আনন্দে বিহরে,
নর জগতের প্রাণী তোমরা কি তবে
এ পাষণ বক্ষে মম অসুখেতে রবে ?
বিনষ্ট মানব জ্ঞানে
হেরিয়া আমার পানে,
সরিয়া দাঁড়াও কেন ফিরায়ে নয়ন,
একবার এ হৃদয় কর দরশন ;
যেই মোহস্বপ্নে প্রাণ ছিল অভিভূত,
স্থির লক্ষ্য করি যাহা সুদীর্ঘ-অতীত,
উন্মত্ত আবেগে প্রাণ
ছুটে ছিল অবিশ্রাম
সুপথ কুপথ নাহি করিয়া বিচার,
ভাঙিয়াছে সেই স্বপ্ন নয়নে আমার।
মাতা ভ্রাতা ভগ্নী ভার্য্যা তনয়-সংসার !
এস আজ একবার হৃদয়ে আমার।

৭

পাষাণ ! তোমার মত প্রফুল্ল বদনে,
হেরিতে কি পারিব না আমি এভুবনে ?
অমনি করিয়া কভু আনন্দে হাসিয়া
দাঁড়াতে কি পারিব না আলোকে ভাসিয়া ?
অমনি আপনা ভুলে,
সংসারে হৃদয়ে তুলে,
বাঁধিয়া প্রাণের অঙ্গে মায়ার বন্ধনে,
নারিব কি নিরখিতে উৎফুল্ল নয়নে ?

যন্ত্রণাই পরিণাম হবে কি আমার ?
হ'বে নাকি পুন হৃদে আনন্দ সঞ্চার ?
যাহা লয়ে তুমি সুখী,
সে ত সকলই দেখি,
চৌদিকে হৃদয় খুলি বিরাজে আমার,
মায়া দয়া পিপাসার্ত্ত মধুর সংসার।
জীবনের ধর্ম্মগুরু তুমি হে পাষাণ !
দেহ শিখাইয়া মোরে তোমার ও জ্ঞান।

বুদ্ধিবধ বা জ্ঞানকাণা।

পঞ্চশিখা নামক জনৈক মুনি ধীরস্বভাব শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ করিতেছেন।

"দূরে ঐ যে একটি স্থাণু (মুড়োগাছ) দেখিতেছ, এক সময় উহার নিকট আমরা চারি জন ব্যক্তি চারি প্রকার বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম। আমি, শৈব্য, দাণ্ডিনায়ন ও হাস্তিনায়ন,—আমরা চারি জনে একদা এই স্থান দিয়া যাইতে ছিলাম, দূর হইতে উহা দেখিয়া আমাদের তিন জনের সংশয় হইল, উহা কি স্থাণু ? না একটা মানুষ ? পরে হাস্তিনায়নের জ্ঞান সংশয়েই শয়ান থাকিল, তাঁহার মনে কোন প্রকার তর্কোদ্রেক হইল না; তিনি অনায়াসেই আপন গন্তব্য প্রদেশে চলিয়া গেলেন। দাণ্ডিনায়ন অনেকক্ষণ ভাবিলেন, অনেক চেষ্টা করিলেন, তথাপি তিনি সংশয়চ্ছেদে সমর্থ হইলেন না, অবশেষে তিনি অশক্য বিবেচনা করিয়া চলিয়া গেলেন। শৈব্য বলিলেন, উহা যাহা হয় হউক, আমি উহাতে সংশয় স্থাপন করিতেও চাহি না, পরীক্ষা করিতেও ইচ্ছা করি না, উহার তথ্য কি তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক নহি। যাহা হয় হউক, আমি উহার জন্য কার্য্য ক্ষতি করিব না, এই রূপে তিনিও উক্ত প্রকার সন্তোষ লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আমি সংশয়িত স্থাণুর নিকটবর্ত্তী হইয়া সঞ্জাত সংশয় বিদূরিত করিলাম। তাহাতে

আরোহণ করিলাম, তাহার ফল, পত্র, পুষ্প, সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে যে পক্ষী ছিল, সে গুলিকেও দেখিলাম। অতএব হে শিষ্য! সকল মনুষ্যের সমান বুদ্ধিশক্তি নাই, বুঝিবার বুঝাইবার ক্ষমতা নাই, ইহা কথিত উদাহরণের দ্বারা বুঝিয়া লও।

বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি,—প্রধান কল্পে এই চারি প্রকার বুদ্ধি ভেদ আছে, ইহা অবধারণ কর। সংশয় (ঠিক্ না বুঝা) ও অজ্ঞান (আদৌ না বুঝা) বিপর্য্যয় (বিপরীত বুদ্ধি) মধ্যে গণ্য। বুঝিতে না পারা, এবং সংশয় হইলে তাহার উচ্ছেদ করিতে না পারা, অশক্তির অন্তঃপাতী। একটু কঠিন দেখিলে, দুরূহ দেখিলে, তাহাতে প্রয়োজন নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকা অথবা বুঝিবার অযোগ্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধির তুষ্টি নামক অবস্থা, ইহা অবধারণ করিবে। এই তুষ্টি-নামক বুদ্ধি আলস্যের জননী, ইহা বর্ত্তমান থাকিতে মঙ্গলের আশা নাই। যে কোন দুষ্প্রতর্ক্য বা দুর্বিজ্ঞেয় বস্তু থাকুক, সন্দিগ্ধ বা বিকল্পিত অর্থ হউক, বুদ্ধি যখন তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহা সিদ্ধি অবস্থায় আসিয়াছে, ইহা অবধারণ করিবে। এই সিদ্ধিনামক বুদ্ধিই লৌকিক ও পারলৌকিক বস্তুতত্ত্ব বুঝিবার প্রধান উপকরণ।

যে বিপর্য্যয়-বুদ্ধির কথা বলিলাম, তাহা ৫ পাঁচ প্রকার। যে অশক্তির কথা বলিলাম, তাহা ২৮ আটাশ প্রকার। তুষ্টি-নামক বুদ্ধি ৯ প্রকার এবং সিদ্ধি-বুদ্ধিও ৮ আট প্রকার আছে,। আজ তোমাদিগকে আমি ২৮ প্রকার অশক্তির কথা বলিব, ইহা বুঝিতে পারিলে ক্রমে অন্যগুলিও বর্ণন করিব।

মনুষ্যের ১১ এগারটি ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দোষে, তাহাদের বিকলতায়, তাহাদের অসম্পূর্ণতায়, স্ফুরণ স্বভাব বুদ্ধির স্ফুরণত্ব প্রতিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ স্ফূরিত হইতে পাবে না। স্ফুরণশক্তি থাকিতেও বুদ্ধি যে স্ফূরিত হইতে পারে না, ইহা কেবল একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের দোষেই পারে না। ইহা দেখিয়া আমরা ইন্দ্রিয়কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধি বিনাশ) ১১ প্রকার, ইহা নির্ণয় করি। এতদ্ভিন্ন আর ১৭ সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ আছে, তাহা বুদ্ধির নিজদোষে বা নিজ আশ্রয়ের (মস্তিষ্কের) দোষে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাধির্য্য বা শ্রোত্রকৃত বুদ্ধিবধ।

শ্রবণেন্দ্রিয় বা শ্রোত্র-যন্ত্র নিরুদ্ধ হইলে ও বিনষ্ট হইলে বুদ্ধির শব্দে

গ্রহণ শক্তি থাকে না, বধ হয়, ইহা বিদিত আছে। কিন্তু শ্রবণ-যন্ত্রের অপূর্ণতা হেতু বুদ্ধির যে সূক্ষ্ম অংশের ক্ষতি হয়, তাহা তোমরা সহসা অর্থাৎ প্রণিধান না করিয়া বুঝিতে পারিবে না। তোমরা কি স্থির করিয়া রাখিয়াছ যে, সকল ব্যক্তিই সমান শুনিতে পায়? তাহা পায় না। পাইলে, তাল-কাণা ও সুর-কাণা লোক থাকিত না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও তাহাদের তালবোধ ও সুরবোধ হয় না। কেন হয় না? না তাহাদের কাণ ভাল নহে, তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ নহে। তাহাদের শ্রোত্রযন্ত্রস্থ শব্দবহা শিরার সকলগুলি সমান নহে, কিংবা কোন কোন শিরার অভাব আছে, অথবা কোন কোন শিরার ক্ষতি হইয়াছে। তাই তাহারা ধ্বনিভেদ বা শব্দের সূক্ষ্মতম তারতম্য বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেইজন্যই তাহারা হয় তালকাণা না হয় সুরকাণা। বাধির্য্য হইলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের কষ্ট হয়, সুতরাং লোক সকল বাধির্য্য নিবারণের চেষ্টা করে, কিন্তু ধ্বনিভেদ না বুঝিলে দেহ যাত্রা চলে, তাই তাহার চিকিৎসাদি করে না। ফল, কাণ ভাল করিবারও উপায় আছে এবং কাণ ভাল না থাকিলে যে বুদ্ধির ক্ষতি হয়, তাহাও নির্ণীত আছে।

রসনেন্দ্রিয় ও অপজিহ্বিকা।

রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় জিহ্বা। তাহার দোষ থাকিলে, অপূর্ণতা থাকিলে, অপজিহ্বিকা নামক বুদ্ধিবিঘাত হইয়া থাকে। এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের আস্বাদ বোধ অতি অল্প। স্বাদগ্রহণ শক্তি সকলের সমান, এরূপ মনোভাব, এরূপ বিশ্বাস, পরিত্যাগ কর: ঐ ফলটিতে তুমি যে পরিমাণ বা যে প্রকার আস্বাদ পাইবে, আমি হয়ত ঠিক্ সেইরূপ আস্বাদ পাইব না। লোক সকল মোটামুটি কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি ছয়টি রস জ্ঞানগম্য করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম প্রভেদ আয়ত্ত করিতে সকলে সমান-রূপে পারে না। সর্ব্বসমেত ৬৩ প্রকার রস আছে, কিন্তু সকলে তাহা বোধগম্য করিতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি, রসনেন্দ্রিয়ের বৈগুণ্য বশতও বুদ্ধিবধ হয়, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, সুতরাং রঙ্ কাণা লোকের ন্যায় রস-কাণা লোকও আছে। রসবাহী শিরা এককালে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণ রূপেই রসবুদ্ধির বধ হয়, আর যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্য থাকিলে অপজিহ্বিকা বা সামান্য রস-কাণা বলিয়া গণ্য হয়, ইহা সূক্ষ্মদর্শী মুনিগণের উপদেশ।

ঘ্রাণপাক ও অজিঘ্রতা।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দোষে, বৈগুণ্য বশত, অথবা অপূর্ণতা হেতু গন্ধবিষয়ক জ্ঞানের বা বুদ্ধির অল্পাধিক্য ও ক্ষতি হইয়া থাকে। রোগবশত কাহার কাহার ঘ্রাণশক্তি এককালে নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা কোন প্রকার গন্ধ বুঝিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অত্যল্প ব্যাপার প্রকাশ করিতেও পারে না। সেরূপ ঘ্রাণ বধের নাম অজিঘ্রতা এবং সেরূপ ঘ্রাণ-নাশের নাম ঘ্রাণ-পাকঁ। কিন্তু ঘ্রাণ-যন্ত্রের, গন্ধবাহী শিরায়, অসম্পূর্ণতা দোষে অথবা অন্য কোন দোষে কেহ কেহ গন্ধ সমূহের সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝিতে পারেন না। ইহার নিদর্শন অনেক সময়েই সুপ্রাপ্য।

বাগিন্দ্রিয় ও মূকত্ব।

মূক অর্থাৎ বোবা। বাক্যন্ত্রের দোষেই মানুষ বোবা হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহারা বোবা নহে, যাহাদের বাক্যন্ত্র আছে, মনে করিও না যে,তাহারা সকলেই সমান বলিতে পারে, সকলেই সমান শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। বাক্যন্ত্রের তারতম্য থাকাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাক্য,অসমান। বাগিন্দ্রিয়ের অভাব হইলে বুদ্ধির সমূহ ক্ষতি,বৈগুণ্য থাকিলে অত্যল্প ক্ষতি। ফল, বাগিন্দ্রিয় কৃত অশক্তি বা বুদ্ধিবধ থাকিলে, তদ্দ্বারা লৌকিক পার-লৌকি সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

ত্বক্‌কৃত জড়তা বা ত্বক্‌কৃত স্পর্শবধ।

পক্ষাঘাত হইলে, কুষ্ঠবিশেষ জন্মিলে, ত্বক্ নষ্ট হইয়া যায়, অথবা ত্বকের স্পর্শ গ্রহণ শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, ইহাও তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু ত্বক্যন্ত্রের বৈগুণ্য বা অসম্পূর্ণতা হইতে যে স্পর্শভেদজ্ঞান লুপ্ত থাকে, তাহা বোধ হয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই। স্পর্শশক্তি সকলের সমান নহে, ইহা কি তোমরা জান? যদি না জান-ত ক্রমে জানিবার চেষ্টা কর, দেখিতে পাইবে যে,একজন হয়ত আদৌ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ বুঝে না, অন্যজন হয়-ত তাহা উত্তমরূপ বুঝি। স্পর্শ শক্তির সম্পূর্ণ অভাব না হইলে, যৎকিঞ্চিৎ অভাবে, দেহযাত্রা চলিয়া যায় বলিয়া সূক্ষ্ম স্পর্শবিজ্ঞান লাভের জন্য কেহ বিশেষ যত্ন করে না। কিন্তু দিব্য স্পর্শানুভবের ও সূক্ষ্ম স্পর্শানুভবের জন্য পৃথক পৃথক উপায় আছে, সে সকল অতীব প্রয়োজনীয় জানিবে। তালকাণা সুরকাণার ন্যায় স্পর্শকাণা হইয়া থাকা বিড়ম্বনার বিষয়। স্পর্শকাণা লোক কোন ক্রমেই অভ্রান্ত নহে।

চক্ষুঃকৃত আন্ধ্য বা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবধ।

চক্ষু দেখিতে ভাল হইলে কি হইবে? এমন যে আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র, সেও অনেক সময়ে অনেক প্রকার রূপ বা রঙ দেখিতে বা গ্রহণ করিতে অক্ষম। তোমরা কি মনে কর যে, সকলেই সমান দেখে? তাহা দেখে না। কেহ নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ দেখে, কেহ বা দূরস্থ বস্তুকে আপনার চক্ষুর উপর জ্ঞান করে। কেহ বা বর্ণের বা রঙের তারতম্য বুঝিতে পারে না, কেহ বা এক রঙে অন্য রঙ দেখে, কেহ বা কোন একটি রঙ আদৌ দেখিতে পায় না। এরূপ রঙকাণা (Color blind) লোক অনেক সময়েই বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকে।

মহাভারতে একটি গল্প আছে। তাহার সংক্ষেপ অনুবাদ এই যে, কশ্যপ-পত্নী কদ্রু ও বিনতা, এই উভয় সপত্নীর মধ্যে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বের বর্ণ বা রঙ্ লইয়া একদা বিতর্ক হইয়াছিল। কদ্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনি! বলদেখি, ঐ যে অশ্বটি আসিতেছে, উহার রঙ্ কি! অনন্তর বিনতা দেখিলেন, শাদা এবং কদ্রু দেখিলেন, কাল। বিনতা বলিলেন, শাদা এবং কদ্রু বলিলেন, কাল। কদ্রুর ন্যায় এখনও অনেক লোক শাদাকে কাল অথবা লালকে কাল দেখে, কিন্তু তাহারা ধরা পড়ে না। (শুনিয়াছি, এই বিষয়ের তথ্য লইয়া আজ কাল মহা আন্দোলন হইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লেখাও হইতেছে এবং রেল্‌ওয়ে প্রসাদাৎ আজ কাল নাকি অনেক রঙ কাণা (Color-blind) লোক ধরা পড়িতেছে। আজকাল যেমন রঙ কাণা লোক ধরা পড়িতেছে, এইরূপ যদি দুই একটা জ্ঞান কাণা লোক ধরা পড়িত, তাহা হইলে আমরাও বাঁচিতাম, ধর্ম্মও বাঁচিতেন!) *

---

* রঙকাণা মানুষ আছে, ইহা নাকি পূর্ব্বে কেহ জানিত না! আজ কালকার ইংরাজ পণ্ডিতেরাই নাকি জানিতে পারিয়াছেন! মাক্স মুলার সাহেব, ২১ খানা ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে ১ খানা মাত্র সংহিতা দেখিয়া, স্থির করিয়াছেন যে, অতি আদিম কালে নীল রঙ ছিল না, অথবা লোকেরা নীল রঙ দেখিতে পাইত না। তিনি নাকি ঋগ্বেদের মধ্যে "নীল" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পান নাই, তাই তিনি ঐ কথা বলেন। "নীল রঙ্ ছিল না" এ কথা অস্বীকার্য্য; কাজে কাজেই "নীল রঙ ছিল" ইহা স্বীকার্য্য। নীল রঙের বোধক কোন কথা ছিল কি না তাহা আলোচ্য বটে; কিন্তু, এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা অযুক্ত। যাহাই হউক, প্রবন্ধান্তরে আমরা এই বিষয়টির পর্য্যালোচনা করিব, অনুসন্ধান করিব, এরূপ ইচ্ছা থাকিল।

চক্ষুস্থ রূপবাহী শিরা প্রশিরার বৈগুণ্য বশত বর্ণবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব হয়, ইহা শারীরশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা ও যোগীরা জ্ঞাত। তাঁহারা আরও বলেন যে, ঔষধবিশেষ প্রয়োগের দ্বারা সে সকল দোষ উপশান্ত হইয়া থাকে, যোগ-ক্রিয় প্রভাবেও হইয়া থাকে। যাহাই হউক, নেত্রযন্ত্রের অপূর্ণতা দোষেই হউক, আর অন্য কোন বৈগুণ্যবশতই হউক, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, ইহা অত্যল্প ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। অতএব, বুদ্ধির চক্ষুঃকৃত অশক্তি থাকিলে, অথবা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবিঘাত থাকিলে, তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা বর্ণতর্থ্য আবিষ্কারের বিশেষ বাধা থাকে।

মনঃকৃত বুদ্ধিবধ বা মনের পক্ষাঘাত।

এইটিই বিশেষ গুরুতর কথা। মনের দোষেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যত্যয় ও সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়া থাকে। মনের বৈগুণ্য হইতেই লোক উন্মাদ হয়, তাহাও অসংখ্য প্রকার। অতএব মনের অশক্তি, মনের দ্বারা বুদ্ধিবধ, এবং মনের পক্ষাঘাত বুঝাইবার জন্য পৃথক্ এক অবসর নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। * শরীরের পক্ষাঘাতের ন্যায়, ইন্দ্রিয়ের পক্ষাঘাতের ন্যায়, মনেরও পক্ষাঘাত আছে, (পাক্ষিক অর্থাৎ আংশিক অপূর্ণতা বা অঙ্গবিকলতা আছে), সংসারী উন্মত্ত লোকে তাহা জানে না, জানে না বলিয়াই ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই বঞ্চিত হয়। মনঃকৃত বুদ্ধিবধ হইলে, উন্মাদ হইলে, লোকে তাহার নিরাকরণার্থ চিকিৎসা করে, কিন্তু পক্ষাঘাত হইলে, আংশিক বৈগুণ্য হইলে, তাহার পূরণার্থ কেহই যত্ন করে না। ফল, মনঃপক্ষাঘাতের উত্তমরূপ ঔষধ আছে। ব্রহ্মচর্য্য, গুরুকুলবাস, হবিষ্যান্ন ভোজন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইত্যাদি অনেক সুপথ্যও নির্দ্দিষ্ট আছে। এ সকল কথা অন্য এক সময়ে বুঝাইয়া দিব।

এ-ত গেল জ্ঞানেন্দ্রিয়-কৃত বুদ্ধিবধের কথা। এইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধির ক্ষতি) ও হইয়া থাকে। হস্তের অভাবে ও হস্তের দোষে, পদের অভাবে ও পদের বৈগুণ্যে, পায়ুর বিনাশে ও পায়ুর বিকলতায়, উপস্থের বিনাশে ও উপস্থের বৈকল্যে, অনেক প্রকার বুদ্ধিবধ বা বুদ্ধির ক্ষতি হইয়া থাকে।

---

* মনের পক্ষাঘাত অথবা মনঃকৃতি বুদ্ধিবধ কিরূপ, তাহা আমরা অন্য এক প্রবন্ধে বর্ণন করিব।

ঐ সকল দোষ থাকায়, করণ কৈবল্য থাকায়, অযোগী মনুষ্যেরা প্রায়শঃই জ্ঞান-কাণা হয়। প্রকৃত জ্ঞান কি তাহা তাহারা চিনিতে পারে না। অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রিয়গম্য স্থূল পদার্থও তাহারা যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না। তাহারা যখন অতি যৎসামান্য রেণু তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম, তখন যে তাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঈশ্বর তত্ত্ব ঠিক্ বুঝিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। অসংস্কৃতাত্মা, অযোগী ও বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির ধর্ম্মপিপাসা থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা আপনাদের সেই অপূর্ণ-বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া একে আর করিয়া তুলে। হয়ত কেহ নীতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ বা বৃত্তিসামঞ্জস্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করে, কেহ বা সমঞ্জসীভূত সুখকেই ধর্ম্ম বলিয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা সংস্কৃতাত্মা, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, যোগানুধ্যানদ্বারা যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়দোষ নষ্ট করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দিগকে পূর্ণশক্তি করিয়াছেন, তাঁহারা দেখেন, জ্ঞানকাণা বিষয়াসক্ত লোকেরা অন্ধপথিকের হাতী জানার ন্যায় * ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতেছে। আজ এই পর্য্যন্ত, কাল আবার তোমাদিগকে যথাসাধ্য উপদেশ করিব।”

ভগবান্ পঞ্চশিখ মুনি এই বলিয়া উপরত হইলেন।

---

* পাঁচ জন অন্ধ, হাতী কিপ্রকার তাহা জানিবার জন্য একদা সমবেত হইল। একজন চক্ষুষ্মান্ লোকের সাহায্যে তাহারা একটি হাতী পাইল। চক্ষু নাই, কাযেকাযেই তাহারা হস্তের দ্বারা হাতী চিনিতে গিয়া কেহ লেজ্ ধরিল, কেহ শুঁড় ধরিল, কেহ কাণ ধরিল, কেহ বা পা ধরিল। যে পা ধরিয়াছিল, সে স্থির করিল, হাতী লম্বাকার ও গোল। যে কাণ ধরিয়াছিল, সে স্থির করিল, হাতী কুলোর মত চ্যাপ্টা। যে পা ধরিয়াছিল, সে ভাবিল, হাতী স্তম্ভের ন্যায় স্থূল ও গোল।

ভারতে ব্রিটিশাধিকার।

অনেকের বিশ্বাস, ইংরেজের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কেবল ইংরেজের পরাক্রমে, ইংরেজের ক্ষমতায়, ইংরেজের বুদ্ধিকৌশলে ভারতবাসী পরাজিত, পদানত ও পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ ইংরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত। ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনকর্ত্তা, ভারতবাসী আধিপত্য স্থাপনে পরাজিত। সাগর ভূধর পরিবৃত নানা রত্ন শোভিত প্রকৃতির এই রমণীয় রাজ্য দিগ্‌বিজয়ী ইংরেজের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি। পলাশীর আম্রকাননে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে সর্ব্বত্রই ইংরেজের বাহুবলে ও বুদ্ধিকৌশলে ভারতবাসী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অনেক ইংরেজ ইতিহাস লেখক অম্লানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। মেকলে লর্ড ক্লাইব শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকস্থলে "কেহই সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণকে—ক্লাইব ও তাঁহার ইংলণ্ডবাসিদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণের" ক্ষমতা বলেই যেন ভারত সাম্রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। ক্লাইব তাঁহার ইংলণ্ডবাসিদিগের পরাক্রমেই যেন পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার পদানত করিয়া তুলিয়াছেন।

যাঁহারা প্রকৃত ঘটনা বিপর্য্যস্ত করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, আমি তাঁহাদিগকে শতহস্ত দূর হইতে অভিবাদন করি। ভারতবর্ষ এখন ইংরেজের পদানত হইয়াছে, ইংরেজ এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইংরেজের বীরত্বে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ভারতের দেশের পর দেশ ইংরেজের করায়ত্ত হইয়াছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে সমস্ত হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে ভারতবাসীর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রতাপ ছাইয়া

পড়িয়াছে, ইংরেজ শাসনে ভারতের সে গৌরব, সে মহত্ত্ব, সমস্তই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ইংরেজের কেবল বিজয়লব্ধ সম্পত্তি নহে। অদূরদর্শী ইংরেজ যতই গর্ব্বিত হউন না কেন, জগতের সমক্ষে আত্মগৌরব বিস্তার করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও ভারতবর্ষের বিজেতা বলিয়া সম্মানিত করিবে না। ইংরেজ ভারতবর্ষের বিজেতা নহেন, ইংরেজের ক্ষমতায় ভারতবর্ষ বিজিত হয় নাই, বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতে ইংরেজের কোনও অধিকার নাই। ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে, ভারতবাসী আপনারাই আপনাদিগকে ইংরেজের অধীন করিয়া তুলিয়াছে!

কেহ এক দেশ হইতে আসিয়া দেশান্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন করিলেই উহাকে সাধারণত দেশ-জয় বলা গিয়া থাকে। দুই রাজ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেই রাজ্যের রাজকীয় শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের অধিপতিকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত রাজ্যাধিপতি এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর নিকট প্রকারান্তরে আপনার অধীনতা স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হওয়াতে তাঁহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল। ইহাই প্রকৃত দেশ-জয়। যখন মাকিদনের মহাবীর সেকন্দর শাহ্ পারসস্তান জয় করেন, তখন মাকিদনের সৈন্যগণের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্যের সৈন্যগণ সেকন্দর শাহের সৈন্যদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। পারস্যে মাকিদনের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। যখন পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত আফগানদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে শেষে আফগানদিগের পরাজয় হয়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নরপতি আফগানদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড জয় করেন। যখন নির্দ্দেশ করা যায় যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তখন সহজেই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যেও এইরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কোনও ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ইংলণ্ডের অধিপতি—দিল্লীর মোগল সম্রাট বা ভারতবর্ষের কোন

প্রদেশের রাজা বা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইংলণ্ডের সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ উপস্থিত হয় নাই, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কেবল ইংলণ্ডের কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে ব্যবসায় করিতে আসিয়া, মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্ন দশায় ভারতবর্ষে অরাজকতা দেখিতে পান। এই অরাজকতা তাঁহাদিগকে আধিপত্য স্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে। তাঁহারা ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছলে বলে ও কৌশলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকার করিতে থাকেন। ইহা প্রকৃত দেশ জয় নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত।

এই অরাজকতা ও বিপ্লবের সময় যদি ইংলণ্ডের বণিকগণ কেবল তাঁহাদের "সাগরের পরাক্রমশালী সন্তানগণের" বাহুবলে ভারতবর্ষের জনপদ সকল অধিকার করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় বলিতে পারা যাইত যে, ইংলণ্ডের পরাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে এরূপ চিত্রও পাঠকের নেত্র-পথবর্ত্তী হয় না। ভারতবর্ষের দুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৬৫০০০ হাজার মাত্র ইংরেজ। এইরূপ সংখ্যা কেবল সিপাহি যুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। সিপাহি যুদ্ধের সময় ৪৫ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও ২,৩৫ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল। ১৮০৮ অব্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। ব্রিটীশ কোম্পানী যখন আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র ইংরেজ সৈন্য ছিল। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানী কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্য দ্বারাই আপনাদের সামরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অন্ধকূপ হত্যার পর লর্ড ক্লাইব যখন কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ১৫০০ ভারতবর্ষীয় সৈন্য ও ৯০০ মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা বৃটীশ কোম্পানীর পদানত হয়, তাহাতে ২৮৮০ জন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ১ হাজারের অধিক ছিল না। ইহার পরে ইংরেজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে তাঁহাদের বিজয় গৌরব বিকাশ পাইয়াছে, তৎসমুদয়েই এক পঞ্চমাংশ মাত্র

ইংরেজ সৈন্য ছিল। অপর চারিভাগের সমস্তই ভারতবর্ষীয় সৈন্য। সুতরাং ইংরেজজাতি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়াছে, ইংরেজ জাতির পরাক্রমে ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও বিজাতি ও বিদেশীকর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে কখনও বিজাতি ও বিদেশীয় পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই। ভারতবর্ষ আপনাকেই অপনি জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পূর্ব্বতন গুণগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। মুসলমানেরা ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আর ইংরেজেরাও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে, আপনাদের অনেক সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে, তাহারা রণনিপুণ বীরপুরুষ হইয়া উঠিবে, এ চিন্তা বা এ ধারণা প্রথমে ইংরেজদিগের মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং ইংরেজেরা কখনও ইহা বলিয়াও গর্ব্ব করিতে পারেন না যে, তাঁহারা ভারতবর্ষে সিপাহি সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার এক অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনাদের অভীষ্টকার্য্য সাধনের এই উপায় ফরাসীদিগের উদ্ভাবিত। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিতে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজেরা ফরাসীদিগের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতবর্ষীয়দিগকে আপনাদের সৈনিক দলে গ্রহণ করেন। এইরূপে ১৭৪৮ অব্দে দক্ষিণাপথে ইংরেজদিগের সিপাহি সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়।

ভারতের এই সিপাহি সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরেজদিগের প্রধান সহায়। ইহাদের রণনৈপুণ্য, ইহাদের প্রভুভক্তি ও ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন হইতেছে না। একজন সদাশয় পুরুষ একদা ভারতের গবর্ণর জেনেরলের নিকট ভারতীয় সিপাহিদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাহারা (সিপাহিগণ) যে, জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্ব

পুরুষগণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তিপূর্ণ সময়ে—যে সময়ে আমাদের শাসন বিধ্বস্ত প্রায় বোধ হইয়াছিল—আমাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষ দলের উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছে। তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিস্বামী দিগের বিরুদ্ধে, তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে।” বস্তুত ব্রিটীশ সেনার, সহিত ভারতীয় সেনার তুলনা হইতে পারে না। নানা কারণে ও নানাবিষয়ে উভয়ে, উভয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত। একজন বিদেশী প্রভুর, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মানুশাসনে সর্ব্বতোভাবে বিদেশীর ভৃত্যত্ব করে, অন্যজন তাহার স্বদেশী লোকেব ও স্বদেশের কার্য্য সাধনের জন্য নিয়োজিত থাকে; একজন অধিকাংশ সময়ে তাহার স্বজাতির স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, অন্যজন সকল সময়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া থাকে; এক জনের প্রভুভক্তি প্রভুদত্ত বেতনে সমুৎপন্ন ও প্রভুর সদাচরণে পরিবর্দ্ধিত হয়, অন্য জনের প্রভুভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত পরিপুষ্ট হয়, এবং আপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য সর্ব্বদা তাহার প্রভুর অনুগত ও তাহার প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী। অর্থ ও সদাচারের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তি ক্রীত হয়, তাহা অনেক সময়ে প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্ত্তব্য নিষ্ঠাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। বহুবিধ কষ্ট অথবা অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহি কখনও কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সিপাহি সর্ব্বপ্রকার কষ্টভার বহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সমীহিত সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন্ অনিচ্ছা তাহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধিনায়কের অধীনে থাকিয়া, সিপাহি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসাহ সহকারে আপনার ব্রত ধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অসন্দিগ্ধ ভাবে এই ভিন্ন দেশীয় অধিনায়-কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার সহিত প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অম্লান ভাবে তাঁহার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া থাকে।

কিছুতেই তাহার সাধনা প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার মহত্ত্বগুণ অবনত হইয়া পড়ে না। সে বিপত্তি সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও আপনার যৎ সামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সতীর্থ ব্রিটীশ সেনার তৃপ্তি সাধনে অগ্রসর হয়, ইউরোপীয়ের সাহস ও তেজস্বিতা যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়, সিপাহী সে স্থানেও অবাধেও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়া আপন দলের পতাকা স্থাপিত করে এবং সে যুদ্ধের সময় আপনার বহু পরিশ্রম লভ্য যৎসামান্য বেতনের অংশ দিয়া ইংরেজের সাহায্য করিয়া থাকে। পবিত্র ইতিহাসের প্রতি পত্রে তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুভক্তি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার মহত্ত্ব, তাহার একপ্রাণতা, তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে। হিমালয়ের অযুত শৃঙ্গপাতেও তাহার গৌরব-স্তম্ভ বিচূর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, এবং ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে না।

এই প্রভুভক্ত সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। এই প্রভুভক্ত সৈন্য প্রধানত প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইংরেজদিগের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী বিদেশী বিজাতির হস্তে আপনাদের দেশ সমর্পণ করিতে কেন এত যত্ন করিয়াছে, আত্ম-স্বাধীনতায় তাচ্ছীল্য দেখাইয়া বিদেশী, বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন এরূপ স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কমিয়া আসিতে ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা সাহসে ও বীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। যখন মহাবীর সেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ছিলেন। এসিয়ার আরবেরা একটি প্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী জাতি। স্বল্পকালে ইহাদের বিজয় পতাকা মিশর, পারস্য, স্পেন, তুরস্ক ও কাবুলে উড্ডীন হয়। কিন্তু আরবগণ একশত বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষ জয়ে সমর্থ হয় নাই। কাসেম সিন্ধুদেশ জয় করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই উহা আবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। যাঁহারা প্রথমে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেন তাঁহারা পাঠান। পাঠানেরা আরব দিগের ন্যায় প্রতাপশালী বা সমৃদ্ধিশালী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হয়। পৃথ্বীরাজের পর আর কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা

করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় অনাস্থা বা জাতীয় জীবনের অবনতি। ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহারা পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিন্তাশীলতা প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহাদের বাহ্যসুখে অনাস্থা জন্মে। এই অনাস্থা হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যের সূত্রপাত হয়। রাজা স্বদেশী কি বিদেশী হউন, তাঁহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। মুসলমানের রাজত্ব সময়ে কেবল এক রাজপুতানা ভিন্ন ভারতের আর কোন ভূখণ্ড আপনার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার গৌরব দেখাইতে পারে নাই। এই স্বাতন্ত্র্য গৌরব আজপর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার ন্যায় ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাবের আতিশয্য ছিল। বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যায় নাই। তাঁহারা তখন একতা সম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও ক্ষমতা অপ্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। ইহার পর ক্রমে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে মিশিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব বিকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। প্রতিমণ্ডলে ভিন্ন জাতির ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির ভিন্ন ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। কোন সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন না। কোন সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষীয় পরস্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হইল না, সুতরাং ভারতবর্ষে জাতিপ্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের গৌরব দেখা গেল না। জাতিপ্রতিষ্ঠাভাব ও অনৈক্য প্রযুক্ত সাহসে ও বীরত্বে চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষীয়গণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আবার মুসলমানেরা যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া পড়ে, ভারতবর্ষীয়েরা যখন মুসলমানের অনুগত বা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। ভারতের সৌভাগ্যক্রমে এই অনৈক্যের মধ্যেও একবার জাতি প্রতিষ্ঠার অঙ্কুর

দেখাগিয়া ছিল। দক্ষিণাপথে প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী আপনার মহা মন্ত্র-বলে একবার একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। এই মহাজাতির পরাক্রমে চিরজয়ী মুসলমান চিরপরাধীন হিন্দুর পদানত হইয়াছিল। কিন্তু শিবজীর মৃত্যুর পর এই মহাজাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যখন মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়, ভারতবর্ষীয় খণ্ড-রাজ্য গুলি যখন স্বস্বপ্রধান হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। তখন ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠার কোনও চিহ্ন ছিল না, জাতীয় জীবনে কোনও লক্ষণ দেখা যাইত না। তখন একপ্রাণতা ও সমবেদনা, সমস্তই অন্তর্দ্ধান করিয়া ছিল। দীর্ঘকাল বিদেশী ও বিজাতীর শাসনে থাকাতে ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোধ ছিল না। তখন দিগ্‌বিজয়ী মারহাট্টারা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর প্রতাপশালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া ছিলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজ-পুতানা ক্রমে গৌরব শূন্য হইয়াছিল। বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা অনৈক্য দোষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হয়দরাবাদের নিজাম স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার সুবাদার স্বপ্রধান হইয়া ছিলেন। তদানীন্তন মোগল সম্রাট্ হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। এই অরাজকতার সময় ফরাসীরা প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগের সাহার্য্য আপনাদের প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যত হন। ভারতবর্ষীয়েরা এইরূপ সাহায্যদানে অসম্মত হয় নাই। তাহারা দীর্ঘকাল হইতেই বিদেশীয় শাসনে ছিল, এখন অরাজকতা হইতে অব্যাহিত পাইবার আশায় তাহারা অভিনব বিদেশী প্রভুর আনুগত্য স্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের এইরূপ কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া ভারতবর্ষীয় দিগের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশীজাতির আনুগত্য তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে নূতন ছিল না। তাহারা পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল বিদেশীর শাসনাধীন ছিল। ইতালী ও জর্ম্মণি সহজে নেপোলিয়নের বশীভূত হইয়াছিল, যেহেতু ইতালী তখন সে ইতালী বা জর্ম্মণি সে জর্ম্মণি ছিলনা। ইতালীয় ও জর্ম্মানগণ তখন জাতীয়ভাব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়েও ভারতবর্ষ পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ বা শিবজীর ভারতবর্ষ ছিল না।

সুতরাং ইংরেজ বণিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইল। ভারতবর্ষীয়েরা চারিদিকে ঘোরতর আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে বৃটিশ কোম্পানীর সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং অত্যন্ত কার্য্যপারদর্শিতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়া আপনাদের অভিনব প্রভুর অধিকার বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবাসী ইংরেজের পক্ষ হইয়া আপনাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে সুতরাং তাহারা স্বদেশদ্রোহী। তাহারা দেশহিতৈষিতায় জলাঞ্জলি দিয়া অবলীলায় অসঙ্কোচে একদল বিদেশী বণিককে আপনাদের অধিপতি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের ছিলনা। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পাঁচ জাতি চারি পাঁচ ভাষার লোক পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপ সিংহ বা দ্বিতীয় শিবজীর আবির্ভাব হইত তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাস রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। মহারাজ রণজিৎ দ্বিতীয় শিবজীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব মোগল সাম্রাজ্যের ঠিক অধঃপতন সময়ে হয় নাই। বৃটিশ কোম্পানী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের রেখাপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আর ভারতবর্ষীয়গণ দুর্বুদ্ধি ক্রমে এক অধীনতা পাশ হইতে আর এক অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য তাহাদের সহায় হইয়াছিল।

এইরূপে ভারতে ব্রিটীশাধিকারের সূত্রপাত হয়, ব্রিটীশ কোম্পানী এইরূপে ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। পাঠান ও মোগলেরা দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও ভারত সাম্রাজ্য একীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইংরেজেরা একশত বৎসরের মধ্যেই ইহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই একীকরণ লর্ড ডালহৌসীর শাসন সময়ে হয়। ডালহৌসীর অদ্ভুত রাজনীতি বা চাতুরীর বলে পঞ্জাব, নাগপুর, সেতারা, অযোধ্যা প্রভৃতি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত হইয়া উঠে। এই সকল পররাষ্ট্র গ্রহণেই ব্রিটীশ অধিকারের পূর্ণতা সাধিত হয়। পররাষ্ট্র গ্রহণপ্রথা ভারতে ব্রিটীশ অধিকারের পর হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। লর্ড ডালহৌসীর পূর্ব্বে ভারতের আর দুই একটি গবর্ণর জেনেরল এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইহার উদাহরণ স্থলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক কূর্গ রাজ্য গ্রহণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেণ্টিঙ্কের সময়ে কূর্গ রাজ্যের একজন হত্যাপরাধী মহিসূরের ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের শরণাগত হয়। কূর্গরাজ এই অপরাধীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে রেসিডেণ্টকে পত্র লিখেন। ইহাতে রেসিডেণ্টের সহিত কূর্গের অধিপতির মনোবাদ জন্মে। এই মনোবাদ হইতে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। কূর্গরাজ পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজ্য ব্রিটীশ রাজ্যে সংযোজিত হইয়া যায়। কূর্গের পূর্ব্বাধিকারিগণ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন, পদচ্যুত রাজা সেই টাকা পাইবার জন্য চৌদ্দবৎসর কাল বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পদচ্যুত কূর্গরাজ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাইবার তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। একটি তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী দুহিতার শিক্ষার বন্দোবস্ত করণ, অপরটি তাঁহার সেই দশলক্ষ টাকার প্রাপণ। প্রথমটিতে তিনি বিশেষরূপে ফল লাভ করিলেন; ইংলণ্ডের অধীশ্বরী কূর্গরাজ দুহিতার ধর্ম্মমাতা হইলেন। কিন্তু অপরটিতে তাঁহার কিছুই ফললাভ হইল না। ডিরেক্টরগণ বলিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার প্রাপ্য দশলক্ষ টাকার সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কূর্গরাজ কাতরভাবে তাহার বিষয় পুনর্ব্বিচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এবার ডিরেক্টরগণ ভয় দেখাইলেন, কহিলেন তিনি শীঘ্র বারাণসীতে ফিরিয়া না গেলে তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করা হইবে। কূর্গরাজ হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। বেণ্টিঙ্কের সময়েও পররাজ্য গ্রহণ নীতির এইরূপ বলবতী যথেচ্ছাচারিতা। যিনি সতীদাহ নিবারণ করিয়া ভারতবর্ষের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রিটীশ শাসনের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে যাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহার সময়েও এইরূপ বলবতী স্বার্থপরতা। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে পররাষ্ট্র গ্রহণের পূর্ণতা বিকাশ পায়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, লর্ড ডালহৌসী যতগুলি রাজ্য গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত করিয়াছেন, তাহার একটিতেও সুরাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ডালহৌসী প্রথমে বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন, ইহার পর

উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া সেতারা, ঝান্সী ও নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সংযোজিত করিয়া তুলেন। সর্ব্বশেষে অত্যাচার ও অবিচারের ছলে অযোধ্যা অধিকৃত হয়।

ভারতের ব্রিটীশাধিকার এইরূপে সম্প্রসারিত হইয়া উঠে। ব্রিটিশগণ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্যে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন এবং কোথাও চিরন্তন সন্ধিভঙ্গ করিয়া, কোথাও গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলিয়াছেন। অনেক অত্যাচারে ও অনেক অবিচারে ভারতে ব্রিটিশ সম্রাজ্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। মহারাণী বিক্টোরিয়া যখন এই সম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,"ভারতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব।" আমাদের আশা আছে, ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর শাসনে এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যে সাম্রাজ্য অধিকার করা হইয়াছে তাহার শাসন কার্য্য ধর্ম্মপরতা ও ন্যায়পরতার মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। আমরা সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আশান্বিত হৃদয়ে এই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।
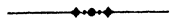
মহাশক্তি।

তুমি কে? আমি কে? এই অনন্ত বৈচিত্র্য চিত্রিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কি? ইহা কোথা হইতে আসিল? কে জানে ইহা কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন আর্য্য ঋষি এ কথার উত্তর দিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় এ কথার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন এখানে দৃষ্টিহীন, বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। আমি কে যে ইহার উত্তর দিব?

কে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়াছে, ইহারও কি উত্তর চাও মানব?

কে বলিবে এ ব্রহ্মাণ্ড কার রচিত? কে জানে এই ব্রহ্মাণ্ড কি? এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন অনন্ত আকাশে অনন্তকাল ভ্রাম্যমাণ,—কে আমাকে বলিবে ইহা কি? প্রাচীন বৈদান্তিক বলিয়াছেন এ মায়া; আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের একমাত্র উত্তর,—আমি জানি না।

এই যে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বসুন্ধরার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতেছে, প্রকৃতি স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া রূপের স্নিগ্ধ রশ্মিতে ভাবুকের মন ভুলাইতেছে; পাখী জাগিল, ফুল ফুটিল, নব-কুসুমিত তরুশাখে অলি আসিয়া ঝঙ্কার দিল; মনুষ্য, বল দেখি এ সব কি? এ সব সত্য, কি মিথ্যা, এ সব প্রকৃত, কি ভাণ? বিজ্ঞানের তত্ত্বদর্শী চক্ষে দেখিবে এ সব কি তা জান না। দেখিবে, প্রকৃতির এই ভুবন ভুলান হাসি, ফুলের মধুময় বাস কোকিলের এই উন্মাদক স্বর, এ সব মানুষ তোমার কাছেই ভাল তোমার কাছেই এরূপ। প্রকৃত কি তা তুমি জান না। বিজ্ঞানের চক্ষে দেখ, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের খরজ্যোতিঃ ও পূর্ণচন্দ্রের কনকসুধা বিশ্বব্যাপি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষের তরঙ্গায়িত গতি মাত্র। তোমার চক্ষুতে যখন আঘাত লাগে, তুমি দেখ আলো। তোমার চক্ষে যখন আঘাত লাগে না, তখন তুমি দেখ আঁধার। জগৎ হইতে জীবের চক্ষু বিলুপ্ত হউক, তখন আলোক ও আঁধার, নীল ও পীত, সুন্দর ও কুৎসিত কিছুরই পার্থক্য থাকিবে না। তেমনই জলদের গভীর গর্জ্জন ও বীণার মধুর নিক্কণ তোমার কাছেই পৃথক্ মাত্র। জগৎ হইতে জীবের জীবন লুপ্ত হউক, জগতে শব্দের আর পার্থক্য থাকিবে না। তেমনি জগতে ছোট বড়, লঘু গুরু, ভাল মন্দ, সুরূপ কুরূপ, পাপ পুণ্য, সবই তোমার কাছে ও তোমার জন্যে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বাহির হইতে যদি দেখিতে পার, তাহা হইলে কিছুরই পৃথগস্তিত্ব দেখিবে না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক বই আর দুই নাই। ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড; ইহা এক। বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই, ইহার চরম উত্তর—যাহা দেখিতেছ তাহা নয়, তাহা কি তুমি জান না। মানুষ অল্পবুদ্ধি, মানুষ কি বলিয়া অনন্ত কি তাহা বলিবে। মানুষের সমস্ত জ্ঞান নিজ অবস্থা সাপেক্ষ, দর্শনে বলে প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানি না। একটি পিঁপীড়া যাহাকে ক্ষুদ্র বল, এক খণ্ড কাচ লইয়া দেখ অতি বৃহৎ বোধ হইবে; বায়ুর বদলে অন্য পদার্থের ভিতর দিয়া, দেখ, অন্য আকার লাগিবে, তোমার চক্ষুর যদি পরিবর্ত্তন

হয়, তাহা হইলে এখনই যাহাকে ছোট বল তাহাকে বড় বলিবে, অথবা যাহাকে বড় বল তাহাকে ছোট বলিবে। তোমার কাছে যাহা গরম, আমার কাছে তাহা শীতল; তোমার কাছে যাহা শক্ত আমার কাছে তাহা সহজ, তোমার কাছে যাহা সুন্দর আমার কাছে তাহা কদাকার; কে বলিয়া দিবে তাহার স্বরূপ কি? তুমি বসিয়া আছ, একজন সাধারণ লোক বলিবে তুমি স্থির; একজন বৈজ্ঞানিক বলিবে তুমি পৃথিবীর সহিত ঘণ্টায় এত সহস্র ক্রোশ বেগে ঘুরিতেছ। আবার যদি তখনই সৌর জগতের নিরপেক্ষ গতির বিষয় ভাবিয়া দেখ, কে গণিবে কত কোটি ক্রোশ তুমি দিবামধ্যে ভ্রমণ করিতেছ। কে জানে তুমি স্থির কি অস্থির?

তবে কেন ভাই, এত বাগ্‌বিতণ্ডা? যে জগতের কিছুই জান না, সেই জগতের কর্ত্তাকে লইয়া এত টানাটানি কেন। তুমি কার্য্য জাননা, কারণ অনুসন্ধান কর, ও অনুসন্ধানে কৃতকাম হইয়াছি বলিয়া স্পর্দ্ধারবে জগৎ ফাটাও। এস, ভাই আমরা ভ্রান্ত জীব দূরে চাহিয়া কাজ নাই; অজ্ঞেয়ের অজ্ঞেয়, জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, সেই অজ্ঞেয় পুরুষ কে

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসম্ —

সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—

দূর হইতে প্রণাম করি

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।

সমস্তজগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

এস ভাই, সহজ পথে যাই। যাহা অজ্ঞেয় তাহা জানিতে যাওয়াতেই কাজ-নাই। যাহা সীমাবদ্ধ মনুষ্যজ্ঞানের গম্য, মনুষ্য জ্ঞান সাপেক্ষ, তাহাই কি,—তাই ভাবি। ভুলো না, যাহা ভাবিবে সমস্তই মনুষ্য জ্ঞান সাপেক্ষ, প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন কি তাহার স্থিরতা নাই।

মানুষের জ্ঞান সীমার অপর পারে ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ নাই, আঁধার আলো ভেদ নাই, লঘু গুরু ভেদ নাই, শ্বেত কৃষ্ণ অপৃথক্, পাপ পুণ্য অভিন্ন। সেখানে সবই এক, সবই এক ধর্ম্মাক্রান্ত। সেখানে জ্ঞান ও অজ্ঞান এক, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক, স্থিতি ও গতি এক, কার্য্য ও কারণ এক। সেখানে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, সুখ দুঃখে পার্থক্য নাই, হিংসা ভালবাসায় প্রভেদ নাই। সবই আছে, কিছুই নাই। সে তত্ত্ব কার সাধ্য ভেদ করে!

মনুষ্যের জ্ঞানসীমার ভিতরে আইস. দেখিবে সেখানে কি বিচিত্র দৃশ্য। কোটি কোটি সূর্য্য চতুর্দ্দিকে রশ্মিরাশি বিকীরণ করিয়া প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান; সূর্য্যের পর সূর্য্য, তার পর সূর্য্য কে গণনা করে কত? অকূল সাগরে অগণ্য জলকণা, সীমাহীন মরুতে অগণ্য বালুকণা, কে গণিবে কত? সূর্য্যের পাশে গ্রহ, গ্রহের পাশে উপগ্রহ, শৃঙ্খলে গ্রথিত, শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে বাঁধা। অনন্ত আকাশে প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ডচয়, মানুষের চোখে যেন নীল চন্দ্রাতপে মাণিকের মত ঝিকিমিকি জ্বলে, এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও? 'জগৎ মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়"—রূপের অতুল ভাণ্ডারে সৌন্দর্য্যের রাশি, রাশি রাশি, মধুমাথা সুধামাথা, যে যত পার প্রাণ ভরিয়া ভোগ কর; এ ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। নগণ্য ধূলিকণা সমান পৃথিবী সেখানেও রূপের ছড়াছড়ি, রূপ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আনন্দের বাজার, প্রমোদের হাট, সুখের মধুর হিল্লোল, প্রেমের গভীব কল্লোল, এমন কি আর আছে। সাগরাম্বরা অদ্রি-শেখরা বসুন্ধরা, কোথাও নদী, কোথাও ভূধর, কোথাও সাগর কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন, কোথাও কানন। শিশুর আধ হাসি যুবতীর রূপরাশি,যৌবনেব উদ্বেলতা, বার্দ্ধক্যের গভীরতা, যুবার হৃদয়, রমণীর প্রণয়, কি চাও, এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও?

আবার দেখ এই জগৎ কি ভয়ঙ্কর। জগতের প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বাহিরিতেছে। অগ্নিজিহ্ব মার্ত্তণ্ড পলকে পলকে কত কত ক্ষুদ্রতর জগৎ গ্রাস করিয়া স্বশরীর পুষ্ট করিতেছে; ঝলকে ঝলকে অগ্নি নিকশিতেছে। কত জগৎ ভাসিতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে কত প্রকাণ্ড জগৎ ধূলিসাৎ হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোথাও বাত্যার প্রলয় গর্জ্জনে মহীধ্র শিখর কাঁপিতেছে, কোথাও অগ্নি লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিশ্বগ্রাসের প্রয়াস পাইতেছে। কুসুমে কীট, অমৃতে বিষ, জীবনে পাপ মরণে তাপ, রোগীর যাতনা, সাধুর লাঞ্ছনা, স্থবিরের অপমান, দুর্ব্বলের রক্তপান। কে বলে পৃথিবী সুখময়ী?

এই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের কারণ কি? এ বৈচিত্র্য নূতন কি পুরাতন ইহার উদ্ভব কোথা হইতে? ইহার কি আদি আছে, ইহার কি অন্ত আছে মনুষ্যের জ্ঞান কি নিজ বিষয়ীভূত? এই পার্থক্যের আদি অন্ত কল্পনা করিতে সমর্থ? বিজ্ঞান বলিবে হাঁ। মনুষ্যের জ্ঞান সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইয়াও ভাগ্যবলে ও বিধাতার অদ্ভুত কৌশলবলে আপাতত অসামান্য ও অসীম

ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহৎ বিচিত্র,ও মহান্ মনুষ্যের জ্ঞান এখানে নিজ অধিকার মধ্যে অব্যাহত প্রভাব, এখানে উত্তর দিতে সমর্থ। আধুনিক বিবর্ত্তবাদ ইহার উত্তর দিয়াছে। এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে নূতন বা ভ্রান্তিহীন না হইলেও মনুষ্যের বিপুল শক্তির পরিচায়ক।

জ্ঞাননেত্র প্রসারণ করিয়া বিজ্ঞানচক্ষুঃ বিবর্ত্তবাদী দেখিলেন, মনুষ্য-জ্ঞানায়ত্ত কালের আরম্ভে, মনুষ্য জ্ঞানায়ত্ত সৃষ্টিক্রিয়ার আরম্ভে দুই সত্তা অথবা দুইরূপধারী এক সত্তা বর্ত্তমান। এই দুই সত্তা জড় ও শক্তি। এই দুই সত্তার পৃথক রূপে অবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্ব কল্পনাতীত হইলেও,প্রয়োজনানুরোধে উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র তিনটি—

(১) জাগতিক সমস্ত পদার্থ ও কার্য্যবিশেষের মূল দুই, জড় ও শক্তি।

(২) জড় ও শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও একের পরিবর্ত্তনে অন্যের পরিবর্ত্তন হয় না।

(৩) জড় ও শক্তির সমষ্টি হ্রাসবৃদ্ধি হীন।

জগতে জড় ও শক্তির বিনাশ বা হ্রাস নাই। শক্তির প্রয়োগে জড়কে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পার, কঠিনকে তরল, তরলকে বাষ্পীয় আকারে পরিবর্ত্তন করিতে পার, কিন্তু জড়পদার্থের অণুমাত্র একবারে ধ্বংস করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ জড়পদার্থের সংযোগে, কখন তাপ রূপে, কখন তড়িৎরূপে, কখন গতিতে, কখন রাসায়নিক আকর্ষণে, প্রকাশিত হইলেও তাহার সমষ্টি সর্ব্বদা সমান কখনও কমিবার নয়।

শক্তি জড়কে চালাইতেছে। জড়ের প্রতি অংশ অপরাংশকে টানিতেছে। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকর্ষিতেছে। প্রতি অণুর সহিত প্রতি অণুর সংঘর্ষ হইতেছে। কেহ কাছে আসিতেছে, কেহ দূরে যাইতেছে, কেহ নড়িতেছে, কেহ ঘুরিতেছে; এ উহাকে আঘাত করিতেছে, এ উহার আঘাতে দূরে পলাইতেছে। এই শক্তি প্রয়োগে জড়ে জড়ে সংঘর্ষণ, অণুতে অণুতে বিঘট্টন, ইহারই নাম কার্য্য, ইহা হইতেই সমস্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি। কতকগুলি অণু দলবাঁধিয়া একবেগে চলিল, আমরা দেখিলাম গতি। কতকগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে ইতস্তত নড়িতেছে, আমাদের ত্বকের স্নায়ুতে আঘাত করিল; আমরা বলিলাম তাপ। আবার

সেই আণবিক গতি ব্যোমে লাগিয়া ব্যোম কর্তৃক তরঙ্গায়িত ও চালিত হইয়া চাক্ষুষ স্নায়ুতে আঘাত করিল, আমরা বলিলাম আলোক।

বিবর্ত্তবাদী বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন সৃষ্টির আরম্ভে সমস্ত জগৎব্যাপিয়া জড় পরমাণু সর্ব্বত্র সমভাবে বাষ্পীয় আকারে বিস্তীর্ণ ছিল। এই বিশ্বব্যাপি পরমাণুরাশির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাক্ষত্রিক জগতের সৃষ্টি, সেই একই নিয়মে প্রত্যেক নাক্ষত্রিক জগৎ হইতে সৌরজগতের উৎপত্তি, সূর্য্য হইতে গ্রহের সৃষ্টি ও গ্রহ হইতে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। সেই একই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রবর্ত্তী হইয়া পার্শ্বস্থ গ্রহদিগকে আকৃষ্ট ও জীবিত রাখিয়াছে; সেই নিয়মেই ভূমণ্ডল সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোটি কোটি বর্ষান্তে বাষ্পময়ী মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তরল হইয়াছে; আবার কতকাল পরে ভূপৃষ্ঠ শীতল হইয়াছে; কেন্দ্রস্থ তরল দ্রব্যের আকুঞ্চনে পৃষ্ঠোপরি পর্ব্বত ও গহ্বরের সৃষ্টি; তাপক্ষয়ে ধরাপৃষ্ঠে জলের সঞ্চার ও সমুদ্র নদীর আবির্ভাব। তৎপরে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে ভূপৃষ্ঠ জীব-নিবাসের উপযোগী হইলে সেই একই নিয়মবলে জীবের উৎপত্তি। আবার সেই অবয়ব-রহিত প্রাথমিক জীব পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে ক্রমিক বিকাশের সোপান পরম্পরা অবলম্বন করিয়া উন্নতির পর উন্নতি তার পর উন্নতি এইরূপে এই অদ্ভুতের অদ্ভুত মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। মানুষে সমাজ বাঁধিয়াছে, গ্রাম নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে, আকাশে উঠিয়াছে, সাগরে পশিয়াছে, রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছে, এবং অনন্ত জগতের ক্রিয়া প্রণালী জ্ঞানের আয়ত্ত করিয়া জগদীশ্বরের মহিমা গাইয়াছে। আবার কত বৎসর পরে এইমানুষ হইতে আবার কি জীবের উদ্ভব হইবে। আবার কত যুগান্তরে ভূমণ্ডল উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সেই চিরন্তন নিয়মবশে হয়ত অবনতির আরম্ভ হইবে। ভূমণ্ডল আবার বিশ্বব্যাপি ব্যোমরাশির সংঘর্ষণে বা জোয়ার ভাঁটার অবিরাম পরিচালিত জলরাশির বিঘট্টনে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবেগ হইয়া ক্রমশ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে এবং কালে যে সবিতার গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিল তাহারই দেহে বিলীন হইয়া পুনরপি বাষ্পময় হইয়া যাইবে। এইরূপ দশা বুধ শুক্র বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল গ্রহেরই ভাগ্যে ঘটিবে; এবং সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যমণ্ডল বহিঃস্থ অপরাপর বাষ্পীভূত নক্ষত্র পুঞ্জের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে যেমন ছিল তেমনই আবার সবই হইবে। আবার

হয়ত সৃষ্টি, আবার হয়ত লয়, এই অপূর্ব্ব জগতের অপূর্ব্ব রহস্যের ইয়ত্তা করিবে কে?

জগতের কার্য্য প্রণালী বুঝিতে হইলে এই দুইটি পদার্থ চাই, জড় ও শক্তি। ধরিয়া লও জড় পদার্থ আছে, সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন অণুরূপে সমস্ত জগৎ সমভাবে ব্যাপিয়া আছে; ধরিয়া লও শক্তি তাহার উপর কাজ করিল; উৎপন্ন হইল গতি বা পরিবর্ত্তন। কালে দেখিবে সূর্য্যচন্দ্র শোভিত, মানুষ কীটা-ধ্যুষিত, অনন্ত বৈচিত্র্য-মণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি; দিবা রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম, শাদাকাল, সমস্ত পার্থক্যের বিকাশ; মেঘ বর্ষিবে, বায়ু গর্জ্জিবে, ফুল ফুটিবে, চাঁদ উঠিবে, যুবা হাসিবে, শিশু কাঁদিবে। এই অনন্ত বৈচিত্রের, নিয়ম এক—অখণ্ড ও অদ্বিতীয়।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে—কে জানে কবে সৃষ্টির আরম্ভ—জড়ের উপর শক্তির ক্রীড়া চলিতেছে; অনন্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত প্রবাহে অনন্ত তরঙ্গে সৃষ্টির স্রোত চলিয়াছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এই মহাতরঙ্গের মহাকল্লোলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে কোন্ দিক দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। দিগন্তব্যাপী মহাকালের মহাকায় পূর্ণ করিয়া অচল অজর অনাদি অনন্ত সীমাহীন জড়ের মহামূর্ত্তি বিরাজমান; তদুপরি, মহেশ্বরের মহামহিমাময় জড়মূর্ত্তির উপরি, অনন্ত জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের কারণভূতা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টির প্রসবিনী, জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রলয়কারিণী, বিশ্বেশ্বরের মহাশক্তি ক্রীড়মানা। মহাকালের মহাশরীর ব্যাপ্ত করিয়া, বাক্যাতীত, মনোতীত, কল্পনাতীত, ভৈরব রাবে ভৈরব ভাবে ক্রীড়ামানা—মহাশক্তি! ভৈরবী সে শক্তি, ভীষণা সে ক্রীড়া। অনন্তের গর্ভে মহাবেগে উছলিতেছে মহাতরঙ্গ—অতীতের অন্ধকারময় ভীমগর্ভে বজ্রনির্ঘোষে দিগন্ত আপূরিত করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া জড়ের সহিত ক্রীড়মানা—শক্তি; মহেশ্বরের সহিত ক্রীড়মানা মহেশ্বরী। ভীমনৃত্যে উন্মাদিতা মহাকালী। আদি নাই, অন্ত নাই, সৃষ্টির স্রোত চলিয়াছে; অনন্তের গর্ভ দিয়া অনন্ত কল্লোলে ছুটিয়াছে; কে জানে কবে শেষ হইবে? কত কোটি সৌরজগৎ পলকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া যাইতেছে; বিকট স্রোতের বিকট আবর্ত্তে, বিশ্বসৃষ্টির ঘূর্ণচক্রে তখনই ডুবিতেছে, ভীমাবর্ত্তে পড়িয়া কতই বা ছুটা ছুটি করিতেছে—কে জানে ইহার শেষ কি, কে জানে ইহার আরম্ভ কোথায়?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত অনাদি মৃত্যুঞ্জয়, মহাকাল,—

পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেবচ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজী চ————॥

এই অষ্ট মূর্ত্তিতে, সংক্ষেপত জাগতিক বিভিন্ন পদার্থে, মানবেন্দ্রিয় প্রকাশমান, সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বতঃ স্থায়ী, জড়রূপী শবরূপী মহাদেবের মহাকায়—সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সর্ব্বভূতের নায়ক, আশুতোষ ব্যোমকেশ মহামূর্ত্তি;—সেই মহাশরীরের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, উন্মত্তভাবে ক্রীড়মানা অবিরাম মহাসংগ্রামে উন্মত্তা মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী মহাশক্তি—ভীমভাবে ভীম সমরে নিরতা

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিশাল খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা॥
বালার্ক মণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতা।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননা।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চী হসন্মুখী।

দক্ষিণ-কালিকার ভীমামূর্ত্তি, ঈশানের বক্ষোপরি বিকটবেশে সমারূঢ়া; দেবাসুরের ভীমসমরে অসুরনাশার্থ নৃত্যন্তী মহাকালী।

এই সৃষ্টির ক্রিয়া সেই মহাশক্তির মহাসংগ্রামে নৃত্য মাত্র। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব—মানব তুমি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের কি জান? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সেই প্রকাণ্ড শক্তির নৃত্য মাত্র। বিশ্বমণ্ডলের সর্ব্বত্র—নাক্ষত্রিক জগতে, সৌরজগতে, সূর্য্য পৃথিবীর আকর্ষণে, পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে, নদীর পতনে, সাগরের উত্থানে, শরবিক্ষেপে, লোষ্ট্রনিক্ষেপে, ভূগর্ভোত্থ ধাতু পদার্থের উৎক্ষেপণে, বৃক্ষস্থ ফলের অধঃপতনে—সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশমান—একই নিয়মে জাত, একই নিয়মে চালিত, জাগতিক ক্রিয়াসমষ্টিরই নাম সৃষ্টি, অথবা জগতই সেই অবিচ্ছেদোদ্ভবা ক্রিয়ানিচয়ের পরম্পরা মাত্র।

পুরাণকল্পিত কালিকামূর্ত্তিতে আমরা বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইও না। হিন্দু পূর্ব্বপুরুষগণ বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

জড়পদার্থকে মহাদেবের মহাশরীর বলিলাম তাহাতেও বিস্ময়ের কিছুই নাই। ধর্ম্মযাজকেরা জড়কে হেয় করুন, ক্ষতি নাই; কিন্তু ঈশ্বরে যাঁহার ভক্তি

আছে, ঈশ্বরে যাঁহার ভীতি আছে, তিনি এই নিখিল-ব্যাপি অনন্ত বিশ্বের কারণকে কবিশ্রেষ্ঠ গেটের সহিত জগদীশ্বরের জীবন্ত অঙ্গচ্ছদ বলিয়া ভীতি-ভরে নমস্কার করিবেন।

অনাদি সেই জড়—দার্শনিক যাহার তত্ত্ব পান না, বৈজ্ঞানিক যাহার পূজা করেন, কবি যাহার গুণ গান করেন,—ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত, বিশ্বের আদ্য, বিশ্বের বীজ, ঈশ্বর যে মূর্ত্তিতে প্রকাশমান, যাহার জন্ম কেহ দেখে নাই, যাহার মৃত্যু কেহ দেখিবে না, তেত্রিশকোটি দেবতা যাহার অংশমাত্র, সেই সর্ব্বলোক পূজিত

অশেষ জগতাং শেষঃ শেষোহি পরিকীর্ত্তিতঃ
শেষকালে ধৃতঃ কট্যাং কালাভরণভূষিতঃ।

যাহার মহা শরীরে

মহা প্রলয়সম্ভূতং চিতাভস্ম চ দৃশ্যতে।
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাং বেতালকোগণঃ।
ততোঽসৌ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ ভূতবেতালসংবৃতঃ।
পাদৌ যস্য তু পাতালং কটির্ভূ-র্দ্যৌঃ শিরস্তথা।
দিশো বাসাংসি যস্যাসন্ দিগ্বাসাস্তেন স স্মৃতঃ॥

সেই মহাপুরুষকে

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূল ধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দু শেখরম্।

কবি ও দার্শনিক যে মূর্ত্তিতেই কল্পনা করুন ও যে ভাবেই দেখুন, আমি সেই মহাপুরুষকে ভীতচিত্তে প্রণাম করি।

শিবের সহধর্ম্মিণী সহচারিণী শক্তি, যার বলে এই মহাচক্র চলিতেছে, জলে স্থলে, সূর্য্যে চন্দ্রে, আকাশে পাতালে, মনুষ্য হৃদয়ে, সমাজ শরীরে, সর্ব্বত্র প্রকাশমানা শক্তি—জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত, পৃথিবীর গতিতে, সূর্য্যের তাপে, মেঘে বিদ্যুতে, চাঁদের আলোকে, ইংরেজের বিপুলবিভবে, ফরাসীর রাজ্যবিপ্লবে, সর্ব্বত্র প্রকাশমান তেজঃপুঞ্জের সমষ্টিরূপা শক্তি—

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহাতেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।

নির্গতং সুমহত্তেজঃ তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ত্বিষা॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ

নদীতে পর্ব্বতে, পবনে বরুণে, সূর্য্যে সোমে, সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশমানা শক্তি—

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতা সনাতনী।
সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশা সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ॥

প্রাচীন এপিকিউরস, ডিমক্রিটস্ হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ-প্রধানেরা যে মহাশক্তির উপাসক; যে শক্তির বিদ্যমানতায় স্বয়ং শিবের বিদ্যমানতা; তান্ত্রিকের সূক্ষ্মদর্শনে যে মহাশক্তি মহাদেবের সঙ্গিনী হইয়াও জননী, সেই জগৎ প্রসূতি মহাদেবীর আরাধনা করিতে পাইলে, আর কি চাও মানব?

এখন দেখিলাম বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য যাহা কিছু নক্ষত্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে, মানব মনের বিকাশে, সমাজশরীরের বিবর্ত্তনে, যে খানে যাহা কিছু দেখাযায় সে সমস্তই গতি এবং সেই গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় সমুৎপন্ন। সৃষ্টির পূর্ব্বে,—পূর্ব্ব যদি কখন সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে—ঐশী মহাশক্তি হইতে জড়ের উদ্ভব হয় এবং কালক্রমে জড় ও শক্তির সমন্বয়ে এই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিবর্ত্তবাদ আর কিছুই নয়, পুরাকালের কালিকা মূর্ত্তিও আর কিছুই নয়,—উভয়ই এই গভীর তত্ত্বের বিকাশ মাত্র।

এই সৃষ্ট জগতে দেবাসুরে এক মহাসংগ্রাম চলিতেছে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে চলিতেছে; যে দিন এই সংগ্রাম থামিবে সেই দিন আবার জগতে সমস্ত বৈচিত্র্য লোপ হইবে সমস্ত জগৎ আবার একাকার হইয়া যাইবে আবার সর্ব্বত্র একাকার হইবে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য যতদিন, দেবাসুরের এই সংগ্রাম ততদিন। এই দেবাসুরের মহাসমর, সুরের সহিত অসুরের, ভালর সহিত মন্দর, কল্যাণের সহিত অকল্যাণের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের চিরন্তন

এই মহাসমর—অসুরমনুজের সহিত আর্হিমানের, শেমাইতের অমার্জ্জিত কল্পনায় শয়তানের সহিত স্বয়ং ঈশ্বরের—মহাসমর। এই মহাসমরের বৈজ্ঞানিক নাম জীবন যুদ্ধ; এই যুদ্ধের পরিণাম—সুরের জয় অসুরের পরাজয়, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়, ঈশ্বরের জয় শয়তানের পরাজয়।

এই দেবাসুর-সংগ্রামে দেবেরই জয়, মহাশক্তির নির্ম্মম খড়্গে অসুরের নিপাত। যাহা ভাল, যাহা সুন্দর, তাহাই নির্ব্বাচিত হইয়া জগতের কল্যাণসাধন ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। সেই শক্তিচালিত নির্ব্বাচনে জগতের এই অবিশ্রান্ত বিবর্ত্তন, সৃষ্টির এই ক্রমিক বিকাশ, জীবদেহের উদ্ভব ও মানব হৃদয়ের উন্নতি।

এই মহাসমরে-দুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, অসুরের ক্ষয়ে, সুরের জয়ে সহায়ীভূতা কে?—না, চিন্তার অগম্যা, কল্পনার অতীতা, বৈজ্ঞানিকের আরাধ্যা, সাধকের উপাস্যা, জগন্নিবাস জগন্নাথের মহাশক্তি। আইস ভাই, আমরা সামান্য মানব সেই মহাশক্তির সমক্ষে ভক্তি-প্রীতি-ভীতি-পূর্ণ হৃদয়ে প্রণত হই।

দেবি বিপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ভারতের রাজলক্ষ্মী।

১

"দীর্ঘকাল পরে কেন এ নিদ্রা ভাঙ্গিল,
কেন এত নরনারী,
দাঁড়াইয়া সারি সারি
কেতন বিবিধ বর্ণে গগন ছাইল
উল্লাস বাজনা কেন সঘনে বাজিল ?

২

"কেন আজি চারি দ্বারে আনন্দ ঘোষণা?
নাচিতেছে গাহিতেছে,
প্রেম সুধা ঢালিতেছে !
কোন্ যোগী পূরাইল অভীষ্ট কামনা
আজি এ ধরায় কেন স্বর্গীয় বাজনা ?

৩

"কে বলিবে কি ঘটেছে কপালে আমার
প্রিয় পুত্র মোর যত,
সকলি হয়েছে গত,
অবশেষে হল বুঝি বাসনা কাহার
বধিতে আমারে, তাই এ সুখ অপার !

৪

"তাই বুঝি নাচিতেছে গাইছে সকলে?
তাই কলিকাতা অঙ্গে,
সাজাইল নানা রঙ্গে ?
মুগ্ধমন্ত্রে মোহিবারে চায় সবে ছলে,
কি আছে কপালে মোর না জানি কি ফলে!

৫

"যদবধি আর্য্যগৃহ ঘুচেছে আমার ;
ঘুচিয়াছে সব সুখ,
নিত্য নিত্য পাই দুখ,
অবসাদে মন প্রাণ হইল কেমন
সে অবধি একরূপ ছিনু অদর্শন।

৬

"কর্ম্মদোষে এল কালে দুর্জ্জয় পাঠান।
রাখিতে সতীত্বধন,
আর্য্যকুল বালাগণ
অনলে আহুতি দিল সাধের জীবন ;
দেখে শুনে মুদিলাম আমার নয়ন !

৭

"সাধ হ'ল পড়ি আমি জলন্ত অনলে
রাখি স্বাধীনতা ধন,
ব্যাকুল হইল মন,
আর্য্যবালা চিতা যবে জলিল ভূতলে
ধুয়ে সব মুছে গেল মম আঁখিজলে।

৮

"তদবধি শূন্য মনে প্রাণ হীন প্রাণে
গভীর পাতালে বসি,
নাহি তথা রবি শশী ;
নিয়ত নিয়তি পদে মুদিত নয়নে
এ মোর দুখের কথা শুনাই গোপনে।

৯

"নিয়তি শুনিলে পাছে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়—
ঘোর রবে সিন্ধু তায়,
নিত্যবাদ সাধে হায়!
দুখের ভারতী মোর লয় হয়ে যায়,
বিরলে ফুটিয়ে সাধ বিরলে ফুরায়!

১০

"না নিদ্রিত না জাগ্রত ছিলাম তথায়!
ছিলাম কি বেঁচে প্রাণে,
তাহাও কি কেহ জানে?
মৃতদেহে কিম্বা প্রাণ এল পুনরায়!
আমাতে ছিল না আমি কব তা কাহায়!

১১

"সদা মনে অভিলাষ আর্য্যের কুশল,
দিবা নিশি মম প্রাণ,
গায় আর্য্য কুল গান।
আর্য্য রাজ্য পাবে বলে সহি এ সকল
তা না হলে ভেঙে যেত এ হৃদি বিকল।

১২

"পাঠান মোগল পরে হায় রে আবার—
সুদূর বৃটনবাসী,
শাসিল ভারত আসি।
বিক্রমে শার্দ্দুল-মেষ হ'ল একাচার।
শান্তিময় হল সব, গেল অত্যাচার।

১৩

"তখন নিদ্রার কোলে লভিনু বিরাম;
ভাবিলাম কভু আর,
ঘটিবে না কু-আচার।
নির্ভয়ে কুমার কন্যা নিদ্রা যাবে ঘরে;
এ রাজার এই ভাব রবে চির-তরে।

১৪

"মম ভাগ্য দোষে হায় সে সুখ ফুরাল
আর সে বিরাম নাই,
শান্তিহীন সর্ব্ব ঠাঁই!
জেতা বিজেতার ভাব বিপদ ঘটাল;
অন্তরের আশা মোর অন্তরে লুকাল!

১৫

"দেখিলাম অত্যাচার কত অবিচার!
কহিতে মনের কথা,
মুখে বুকে যেন ব্যথা!
কে যেন চাপিয়া ধরে রসনা আমার;
মনোব্যথা আজো তাই হয় না প্রচার।

১৬

"কিছুদিন পরে এক বৃটন কুমার
ভারত শাসিতে এল,
প্রাণ জুড়াইয়ে গেল!
মুখের বাঁধন মম করিল মোচন,
আশ্বাসে নিশ্বাস আমি ছাড়িনু তখন।

১৭

"অকস্মাৎ একি শুনি, কেন এ বাজনা?
কেন বা সবার মুখে,
আনন্দ ভাসিছে সুখে?
সমগ্র ভারতে কেন উল্লাস-ঘোষণা—
গেল কিরে ভারতের দারুণ বেদনা"?

১৮

ভারতের রাজলক্ষ্মী, উঠ একবার!
পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলে যাও,
নয়ন মেলিয়া চাও
সম্মুখে তোমার, দেখ—রীপণ কুমার!
কি হবে মথিলে আর শোক পারাবার?

১৯

ধর মা, হৃদয়ে ধর প্রাণের নন্দনে,
দুই দিন পরে আর,
থাকিবে না এ কুমার ?
সুনীল সাগর পারে যাইবে বৃটনে !
কেঁদো না জননি আর মলিন বদনে !

২০

চাও মা, প্রফুল্ল নেত্রে বারেক রীপণে
বারেক হৃদয়ে ধর,
রীপণের তাপ হর !
তোমা বিনা হৃদি জ্বালা কে বারে ভুবনে?
তব অঙ্ক শঙ্কাশূন্য মানব সদনে।

২১

এই পুত্র হে জননি, ভারতের তরে
দুঃসহ যাতনা কত,
সহিয়াছে অবিরত !
স্বজাতির টিট্‌কার সহে অকাতরে !
ধর মা, হৃদয়ে ধর সস্নেহ অন্তরে !

২২

"এই কি রীপণ সেই বৃটন কুমার !
আয় বাছা কোলে আয়,
জুড়াই তাপিত কায় !
জ্বলে পুড়ে মন প্রাণ হয়েছে অঙ্গার ;
আয় রে শীতল কর হৃদয় আমার !

২৩

"বৃটন জননী তোর প্রিয় সে যেমন
বসে আছে তোর তরে,
যাবি কবে ফিরে ঘরে ;
আমিও ত তোর প্রিয়, প্রাণের নন্দন !
আয় বাছা শুভমতি নয়ন রঞ্জন !

২৪

"চিরদিন তার বুকে ঘুমাবি আদরে !
আমার তাপিত বুকে,
আর না ধরিবে সুখে,
একবার আয় বাছা আয় দয়া করে !
জনমের মত আজি বিদায় লব রে !

২৫

"তুমি বৎস সুকৃতির আদর্শের স্থল !
বৃটন-গৌরব তুমি,
গাবে ইহা বিশ্বভূমি !
দশ কোটি ভাই তোর হয়েছে বিকল
তোমারে দেখিতে ধায় হইয়ে পাগল।

২৬

"প্রীতি প্রসন্নতা যেন বদনে তোমার
একভাবে দুই লেখা,
ললাটে জ্ঞানের রেখা,
অন্তরের ভাব যেন বদনে প্রচার ;
বৃটন্-সুযশ তুমি করেছ উদ্ধার !

২৭

"ফিরে যাবে যবে বৎস স্বদেশে তোমার,
বৃটনিয়া কাণে কাণে,
গাহিও বিষাদ গানে,—
ভবিষ্যে ভারতে যেন হয় সু-বিচার—
এই কথা হে কুমার, বলো একবার !

২৮

"বিদায়ের কালে বৎস, কি দিব তোমায়
নাহি কোহিণুর ধন,
শিখিপুচ্ছ সিংহাসন ;
তব যোগ্য উপহার তাই এ ধরায়,
আন বৎস এ ভারতে নাই তা কোথায়।

২৯

"নিবেদন বিধাতায় দাসীর কেবল,
চিরদিন যেন তোরে,
রাখেন শান্তির ডোরে ;
যাও বৎস নররাজ্যে নাহি আর ফল ;
ধর্ম্মরাজ্য বিচরণে ধর মনে বল !"

৩০

যাবে রে এখনি চলে সাধের রীপণ
আয় আয় বঙ্গবাসী,
বিষাদসাগরে ভাসি,
সাঁতারিয়া যাই চল ত্বরায় বৃটন
লক্ষ্য করি ধ্রুব তারা অই যে রীপণ !

৩১

এত সুখ প্রেম খেলা সব কি স্বপন !
দেখিতে দেখিতে হায়,
সুখ কোথা চলে যায় !
হিমাচল সম দুখ নড়ে না কখন !
সকলি অলীক কিরে এতই যতন ?

৩২

আয় প্রাণ ভরে গাই খুলিয়া হৃদয় !
এই সুখ অভিলাষি,
ধর তান বঙ্গবাসী—
মুক্তকণ্ঠে উচ্চস্বরে গাও উভরায়
"জয় জয় মহোদয় রিপণের জয় !"

লর্ড রীপণ।

আজও পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, লর্ড রীপণ ভারতের শাসনভার লইয়া আগমন করেন। তখন এ দেশীয়েরা তাঁহাকে চিনিত না। তিনি তৎপূর্ব্বে একবার দুই কি তিন মাসের নিমিত্ত ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরির কার্য্য করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু সে কার্য্যে ভারতবাসী তাঁহার কোন পরিচয় পায় নাই—তিনি ভাল লোক, কি মন্দ লোক, জানিতে পারে নাই। আজ পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ভারতের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু আজ আর তিনি এ-দেশীয়ের কাছে অপরিচিত নহেন। তাঁহার স্বদেশযাত্রায় এ-দেশীয় সকলেই কাতরহৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছে। ভারতবাসী আর কোন ইংরাজের জন্য এত কান্না কাঁদে নাই—আর কোন ইংরাজকে এত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসে নাই, এমন পূর্ণ মাত্রায় পূজা করে নাই। লর্ড রীপণ আজ ভারতবাসীর দেবতা। কেমন করিয়া এত অল্প দিনের মধ্যে একটি অপরিচিত বিদেশীয় ব্যক্তি অসংখ্য বিদেশীয়ের

হৃদয়-দেবতা হইয়া উঠিলেন,—একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রহস্য বড় গুরুতর। রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সকলেরই উপকার আছে। রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিব।

লর্ড রীপণ ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া এ দেশে আসেন। সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন বা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার দোষ-গুণ-বিচার সম্পন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার এইরূপ সংস্কার, যে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার ফলাফল-বিচার কিছু কাল-সাপেক্ষ। তাঁহার কৃতকার্য্য বা অনুষ্ঠানগুলি দেশের পক্ষে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহা এখন বলা যাইতে পারে না। আত্মশাসন বা শিক্ষা-বিস্তার যে প্রকারের অনুষ্ঠান, তাহার পরিণতি নিতান্তই কাল-সাপেক্ষ। শুধু তাও নয়। তদপেক্ষা একটু গুরুতর কথা আছে। ঐরূপ অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি শুধু গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা বা শক্তি সাপেক্ষ নয়, অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি সাপেক্ষ। আত্মশাসন সম্বন্ধে লর্ড রীপণ স্বয়ং এ কথা গোড়া হইতে বলিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধেও আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন হইবে। অতএব লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানের ফলাফল শুধু কাল-সাপেক্ষ নয়, আমাদের নিজেরও শক্তি-সাপেক্ষ। অতএব সে সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এখন ভাল মন্দ কোন কথা বলা যাইতে পারে না। এবং ভবিষ্যতে সে সকল অনুষ্ঠান যদি সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ না হয়, তাহা হইলে তখন দেখিতে হইবে যে আমাদের নিজের দোষে ফল ভাল হইল না কি না। শুধু লর্ড রীপণকে দোষ দিলে চলিবে না।

অতএব লর্ড রিপণের অনুষ্ঠিত প্রধান প্রধান কার্য্য গুলির ফলাফল বিচার করিয়া তাঁহার দোষ-গুণ বিচার আপাতত অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হয়। কিন্তু সেই জন্যই তাঁহার অনুকূলে একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তাঁহার প্রধান অনুষ্ঠান গুলির সিদ্ধি বা সফলতা আমাদের নিজের শক্তি এবং প্রবৃত্তি সাপেক্ষ, এ কথার অর্থ এই যে তাঁহার শাসন-প্রণালী প্রজাশক্তিমূলক—শুধু রাজশক্তিমূলক নয়। এবং তাঁহার শাসন-প্রণালী প্রজাশক্তিমূলক, একথার অর্থ এই যে তিনি শক্তিহীন প্রজাকে শক্তিশালী করিতে চাহেন, প্রজাকে শুধু শাসনের পাত্র না করিয়া শাসন-

কর্ত্তা করিতে চাহেন, শুধু বিজয়ী রাজাকে রাজা না রাখিয়া বিজিত প্রজাকেও রাজা করিতে চাহেন। তিনি ঘৃণিত প্রজাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া রাজার পার্শ্বে বসাইয়া রাজা এবং প্রজা উভয়কে লইয়া একটি সরীকি-কারখানা বা জইণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি করিতে চাহেন। তাঁহার শাসন-প্রণালী বড় উচ্চ দরের। প্রজার শক্তিই প্রকৃত রাজশক্তি। লর্ড রীপণ সেই প্রজা-শক্তির উপর তাঁহার শাসন প্রণালী স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহত্ত্বের এবং রাজশক্তির অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। এখন প্রজা-শক্তির অভাবে যদি তাঁহার প্রণালী সুফলপ্রদ না হয়, দোষ তাঁহার হইবে না, প্রজারই হইবে।

কিন্তু লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানের ফলাফল কালসাপেক্ষ হইলেও তাহার মধ্যে দুই একটি সম্বন্ধে আপাতত কিছু বলা যাইতে পারে। প্রেস্ আইন উঠাইবার বিষয় বা রমেশ বাবুকে প্রধান বিচারপতি করার বিষয় আমি এস্থলে কিছু বলিব না। ওরূপ কার্য্যের ফলাফল কিছু সংকীর্ণ—সমাজব্যাপী নয় এবং প্রায়ই উচ্চশ্রেণীসম্বদ্ধ হইয়া থাকে। আমি তাঁহার লবণশুল্ক কমাই-বার বিষয়, খাসমহল-বন্দোবস্তের বিষয় এবং আত্মশাসন-প্রণালীর বিষয় কিছু বলিব।

যাঁহারা ধনী, দ্বিতল ত্রিতল গৃহে বাস করেন, যাঁহাদের জমিদারির আয় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন দুঃখী আছে বলিয়া যাঁহাদের জ্ঞান নাই বলিলেও হয় এবং যাঁহারা জমিদার না হইয়াও আপনাদিগকে জমিদার-শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন না, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে লবণের শুল্ক কমাইয়া এদেশে লবণ সস্তা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এবং লর্ড রীপণ লবণের শুল্ক কমাইয়া লবণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে (sentimental, visionary) ভাব প্রবণ প্রভৃতি উপাধিতে উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহা-দের নিজের ঘরে প্রতিদিন ষোড়শোপচারে ভোজনের আয়োজন হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের অদৃষ্টগুণেই হউক আর অদৃষ্টদোষেই হউক তাঁহাদের জঠরানলও বড় প্রবল নয়। অতএব বিনা আয়াসেই তাঁহাদের ক্ষুধার শান্তি হয়। তাই তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, যে পৃথিবীতে সকলেই তাঁহাদের ন্যায় বিনা আয়াসে ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকে। কিন্তু তা নয়। বঙ্গের কোটি কোটি লোক যথার্থই লবণের কাঙ্গাল। একটি গল্প বলি।

কয় মাস হইল একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কলিকাতার একটি গলি-রাস্তায় ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে এক মুদির দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন নিম্ন শ্রেণীস্থ এক দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া মুদিকে একটি পয়সা দিয়া দুই একটি কথার উপর একটু জোর দিয়া বলিল—'ভাল করিয়া এক পয়সার নুণ দেও দেখি, নুণ সস্তা হইয়াছে।' গরীব যে রকম করিয়া এই কয়টি কথা বলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে কিছু জোরে ঘা দিয়া জানাইয়া দিল, যে, সে যথার্থই নুণের কাঙ্গাল, নুণ সস্তা হওয়ায় আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে; জমিদার বাবুরা ত্রিশ হাজার টাকায় তিনলক্ষ টাকার একখানা জমিদারি পাইলে যেমন আহ্লাদে আটখানা হন, তেমনি আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে। তখন ভাবিলাম যে এদেশে এই গরীবের ন্যায়, এবং ইহার অপেক্ষাও, কত লক্ষ লক্ষ গরীব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের জঠরানল বড়ই প্রবল, এক এক রাশি ভাত না খাইলে সে অনল নিবে না, কিন্তু তত ভাত খাইবার ব্যঞ্জন তাহারা পায় না, তাই তাহারা যথার্থই নুণের কাঙ্গাল, আর তাই বুঝি নুণ সস্তা দেখিয়া এই গরীবের মতন লক্ষ লক্ষ গরীব আজ আহ্লাদে আট খানা হইয়াছে।* তাহারা হয় ত জানে না কোন্ দীনবন্ধু তাহাদের নুণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি। জানিয়া আমাদের দীনদুঃখীর নুণ যিনি সস্তা করিয়াছেন সেই দীনবন্ধু রীপণকে কি আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিব না? যিনি ধনী বা জমীদার, যিনি ত্রিতল বিলাস-ভবনের একটা বাতায়ন খুলিয়াও কখন কাঙ্গালের ভগ্ন কুটীরের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না, তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিবেন

---

* The total quantity of salt sold within the law limits in the saliferous districts of Midnapore, Howrah, the 24-Pergunnahs, Khulna, Backergunge, Chittagong, Noakholly, Cuttack, and Balasore rose from 9,67,083 to 9,99,653 maunds, showing a net increase of 32.,570 maunds, or 3·3 per cent. Consumption increased in all districts except Backergunge. In Midnapore and Khulna the advance was slight. In Howrah however it amounted to 4·3 per cent. on the previous year's consumption, in the 24-Pergunnahs to 3·1 per cent., in Chittagong to 6·9 per cent., in Noakholly to 4·6 per cent., in Cuttack to 4·6 per cent., and in Balasore to 5 per cent. The reduction of the salt duty is alleged everywhere to have contributed in part to the increase, while as special causes tending to stimulate consumption an influx of labourers for employment on local works

না। আমরা দীনদুঃখী না হই, দরিদ্র বটে। আমরা দীনবন্ধু রীপণের কাছে যথার্থই কৃতজ্ঞ। তাঁহার ন্যায় দীনবন্ধু ইংরাজ রাজপুরুষ ভারতে কখনও আসেন নাই।

তাঁহার খাস মহল বন্দোবস্তের নিয়মেও তাঁহাকে সেই দীনবন্ধু মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। ত্রিশ বৎসর অন্তর খাস মহলের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। প্রতি বন্দোবস্তের সময় মহলের সমস্ত প্রজার সমস্ত জমি জরিপ করা হয় এবং ইচ্ছামত সমস্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। এই জরিপ এবং খাজনা বৃদ্ধি উভয় কার্য্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অশুভের কারণ। খাস মহলের প্রজা এই দুই কার্য্যের দ্বারা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া থাকে। দীনবন্ধু রীপণ অসংখ্য দীন দুঃখীকে সেই পীড়ন হইতে উদ্ধারার্থ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া গেলেন। তিনি এই নিয়ম করিয়া গেলেন, যে দুই একটি নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেণ্ট প্রজার জমি জরিপ বা খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই নিয়মে যদি গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করেন, তবে খাস মহলের লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী প্রজা যথার্থই অনেক দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এজন্যও বলি যে রিপণের ন্যায় দীনবন্ধু রাজপুরুষ ভারতে আর কখনও আসেন নাই। এমন দীনবন্ধুকে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিব না?

আত্মশাসন প্রণালীতে রীপণকে কেবল দীনবন্ধু মূর্ত্তিতে দেখি না—ভারত সমাজের জীবন-সঞ্চারক মূর্ত্তিতেও দেখি। আত্মশাসন প্রণালীর ফলাফল কাল সাপেক্ষ—সে প্রণালী সিদ্ধি লাভ করিবে কি না, সুফল প্রসব করিবে, কি কুফল প্রসব করিবে, এখন বলা যাইতে পারে না। একথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ প্রণালী অনুসারে আপাতত যে নির্ব্বাচন কার্য্য হইয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে মনে

---

has been mentioned in the 24-Pergunnahs, Khulna, and Balasore, increased vigilance on the part of the police in Howrah, Chittagong, and Cuttack, the prosperous condition of the agricultural classes in Chittagong, and increase of population in Noakholly. The decrease in consumption in Backerguge is ascribed to large stocks having been in the hands of the dealers at the beginning of the year, to the prices having been kept high by the dealers for a considerable period, and to the diversion of the trade of some of the marts within salt limits to places outside them. There is no good reason to suspect the prevalence of illicit manufacture to any appreciable extent in the district. *Bengal Administrations Report*, 1882—83, *pp.* 446—7.

বড় আশা এবং উৎসাহ জন্মিয়াছে। গত ২৫শে এবং ২৯শে নবেম্বর বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যায় কমিশনর নির্ব্বাচন লইয়া যে তোলপাড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে তাহার অর্থ বড় গুরুতর। তাহাতে তীব্র রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, বিবাদ বিসম্বাদ, মারামারি, হুড়া হুড়ি প্রভৃত পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ধনী এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি হইতে মুটে মজুর দোকানি পশারিকে পর্য্যন্ত মহা শশব্যস্ত, মহা উৎসাহে উৎসাহিত, মহা রিষারিষিভাবে উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে। নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট নিস্পন্দ নিস্তব্ধ নির্ব্বিকার দেশীয় সমাজে এই দৃশ্য যথার্থ ই নূতন, যথার্থ ই আশাপ্রদ, যথার্থ ই জীবন-লক্ষণ-যুক্ত। এই দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন মহীপাল দীঘির যে ঘনদামাবৃত নিদ্রিত জলরাশির উপর দিয়া অসংখ্য গো মহিষ-আদি চলিয়া গেলেও মুহূর্ত্তকালের জন্যও জলরাশির চৈতন্য হয় না, সেই জলরাশিতে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে। রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি দেখিয়া ভয় পাইও না অথবা আত্ম-শাসন প্রণালীর দোষ দিও না। রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি মন্দ জিনিস নয়, ভাল জিনিস। যেখানে সমাজ জীবিত সেই খানেই সমাজে রিষারিষি, দলাদলি, মারামারি। যেখানে সমাজ মৃত বা নির্জ্জীব, সেখানে ওসব কিছুই নাই। যখন হিন্দু সমাজ জীবিত ছিল তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কত বিবাদই হইয়া গিয়াছে। এখন হিন্দু সমাজ নির্জ্জীব; এখন কোন বিবাদই নাই। অতএব দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি ভাল জিনিস, কেন না সজীবতার ফল। নির্জ্জীব নিস্পন্দ নির্ব্বিকার দেশীয় সমাজে এত দিনের পর তরঙ্গ দেখিলাম—জীবনসঞ্চার দেখিলাম—দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি দেখিলাম। লর্ড রিপণের আত্মশাসন প্রণালীর গুণে এই তরঙ্গ যদি বাড়িয়া উঠে, এই জীবনসঞ্চার যদি গাঢ় হইয়া যায়, এই দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি যদি তীব্রতর হইয়া উঠে, তবে নিশ্চয়ই এ দেশের সমাজ—কর্ম্ম এবং উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবে। রীপণ মরা গাঙ্গে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। স্রোত বিনা ডিঙ্গি চলে না। এখন আমাদের সমাজ-ডিঙ্গি চলিবে বলিয়া আশা হইতেছে। রীপণ যথার্থই ভারত সমাজের জীবন-সঞ্চারক মহাপুরুষ। রীপণের ন্যায় ভারতবন্ধু ইউরোপ হইতে আর কখনও এদেশে আসেন নাই। রীপণকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে পূজা করিব না ত করিব কাহাকে?

মনে কর যাহা বলিলাম সবই ভুল—মনে কর রীপণ আমাদের কোন

উপকারই করেন নাই। তথাপি একটি কথা আছে। যে উপকার করে তাহাকেই কি পূজা করিতে হয়, তাহারই কি প্রশংসা করিতে হয়? রামচন্দ্রের কোন্ রাজকার্য্যের দ্বারা তোমার আমার কি উপকার হইয়াছে? কিন্তু আমরা ত রামচরিত্র পূজা করি। উপকারের পরিমাণে পূজা বা প্রশংসা—এ জঘন্য নীতি ভারতে ত কখন ছিল না। আর প্রকৃত কথাও এই যে, যে যথার্থ মানুষ সে ত উপকার বা কৃতকার্য্য দেখিয়া পূজা বা প্রশংসা করে না। প্রকৃত মানুষ যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখে সেইখানেই পূজা করে, প্রশংসা করে, উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড রীপণে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি। লর্ড রীপণ বিদেশীয়—ইংরাজ—বিজয়ী-জাতির একজন। বিজিতজাতির প্রতি বিজয়ীজাতির কিরূপ ভাব এবং আচরণ হইয়া থাকে, ইতিহাসে তাহা অনেকদিন হইতে দেখিতেছি। বিজিতজাতির উপর বিজয়ী-জাতিকে অত্যাচার করিতে দেখিলে, অথবা বিজয়ী-জাতিকে বিজিতদিগকে পশুবৎ ঘৃণা করিতে দেখিলে আমরা বিজয়ী-জাতিকে নিন্দা করি বটে। কিন্তু আমরা যদি কোন ক্রমে বিজয়ী-জাতি হইতে পারি তবে বিজিতজাতিকে যে বিজয়ীজাতির রীতি অনুসারে ব্যবহার করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। অনেক ইংরাজ রাজপুরুষকে ত আমরা বিজয়ী-বিজিতের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করার বিরুদ্ধে কহিতে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু কাজের বেলা কেহই ত সে প্রভেদ নষ্ট করিতে প্রয়াস পান নাই। লর্ড রীপণ সেই প্রভেদ নষ্ট করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনে, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগে, রুড়কি রিজোলিউসনে এবং ইলবার্ট বিলে তাঁহার সেই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সব কথা ছাড়িয়া কেবল ইলবর্টবিল সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। কিন্তু ইলবর্টবিলে লর্ড রীপণের যে অলৌকিক মহত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের দিক্ হইতে বুঝিলে চলিবে না, বিজয়ী ইংরাজের দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। ইংরাজের দিক্ হইতে এইরূপ বুঝা যায়। আজ একশত পঁচিশ বৎসরের অধিক হইল ভারতে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজের রাজ্য স্থাপনের তারিখ হইতেই ইংরাজ—ভারতের ইংরাজ এবং ভারতবাসী দুইজনকে তুল্য জ্ঞান করিবেন এবং তুল্য ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ বিজয়ী এবং বিজিত দুইজনকেই সমান জ্ঞান এবং সমান ব্যবহার করিবেন এই কথা বলিয়া

আসিতেছেন। কিন্তু মুখে বলিলে কি হয়, আইনের গৌরচন্দ্রিকায় লিখিয়াদিলে কি হয়, কাজে তিনি তাহা বড় একটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই এই একশত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ভারতবর্ষীয় বিধি-বহিতে বিজয়ী-বিজিতের প্রভেদরূপ বিজয়ীর কলঙ্ক সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছে। এবং সেইজন্য এই একশত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত সভ্য জগৎ তাঁহাকে অতি-অমানুষ বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডে এত রাজারাণী হইল, এত পিট্, বর্ক, পীল, ব্রাইট্, গ্লাডষ্টোন হইল, ভারতে এত কর্ণওয়ালিস্, বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিং, মেয়ো রহিল—সকলেই বলিলেন, না, এ বিধি আমাদের জাতির কলঙ্কের কারণ, এ বিধি থাকা উচিত নয়, কিন্তু কেহই ত এ বিধি উঠাইলেন না। অবশেষে লর্ড রীপণ এ বিধি উঠাইলেন—এ গাঢ় কলঙ্ক মুচিয়া ফেলিলেন। বিজয়ী এতদিনের পর বিজয়ীর বিষম ভাব বিস্মৃত হইয়া বিজিতকে বিজয়ীর তুল্য বলিয়া সম্মান করিল—পশুকে মানুষের আসনে বসাইল—এবং শত সভ্যজাতির কাছে বিজয়ীর মুখ উজ্জ্বল করিল। বল-দেখি, যদি ইংরাজ না হইয়া বাঙ্গালি আজ বিজয়ী জাতি হইত এবং রীপণ বাঙ্গালি হইয়া যদি বিজয়ী এবং অপর কোন বিজিত জাতির মধ্যে প্রভেদ-বিধিরূপ কলঙ্ক মুচিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে বাঙ্গালিজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতেন, তাহাহইলে বাঙ্গালির মধ্যে আজ রীপণ কতবড় লোক, বাঙ্গালি-জাতির আজ রীপণ কত শ্লাঘা ও স্পর্দ্ধার জিনিস? বিজয়ী হইয়া—বিশেষ বিজয়ী ইংরাজ হইয়া লর্ড রীপণ যে কাজ করিলেন, বহুশতাব্দীতেও কেহ সে কাজকরিতে পারে না। বিজয়ীর দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে রীপ-ণের মহত্ব এবং মনুষ্যত্ব যথার্থই অসাধারণ এবং অলৌকিক। সে মহত্ব এবং মনুষ্যত্ব দেবত্বের কাছে কাছে যায়। বিজয়ী ইংরাজ দোকানদার, হয় ত তাই এ মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝে না।

আবার এই ইলবার্ট বিল পাশকরিতে রীপণ কি অপরূপ মাহাত্ম্যই প্রদ-র্শন করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে এদেশে ইংরাজের যেরূপ প্রাধান্য এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ এংলোইণ্ডিয়ানের যেরূপ সহায় তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা মুরূপ আইন পাশকরিলে এংলোইণ্ডিয়ান ও ভারতবাসীর মধ্যে আকুণ্ডকুণ্ড বাধিয়া উঠিবে এবং মফঃস্বলে ভীরু ভারতবাসীর ধনপ্রাণ এবং ধর্ম্ম রক্ষাকরা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই বিশ্বাসে তিনি আপনার খ্যাতি অখ্যাতির প্রতি কিছু-মাত্র দৃষ্টি না করিয়া শুধু ন্যায়-পালনার্থ এবং ভারতবাসীর মঙ্গলার্থ ইল-

বর্টবিল পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচার করিলেন। আর কেহ হইলে নিজের অপযশের ভয়ে বোধ হয় তখন পদত্যাগ করিয়া ফেলিতেন। রীপণের কাছে আত্ম নাই—ভারতবাসীই সব। এ রীপণ কি দেবতুল্য নয়? আবার এই বিল লইয়া বৎসরাধিক কাল ধরিয়া রীপণ এংলোইণ্ডিয়ানের কাছে কতই নিন্দিত, কতই অপমানিত না হইয়াছেন! কিন্তু রীপণের মুখে এ পর্য্যন্ত কখনও এংলোইণ্ডিয়ান উপর রাগের বা ঘৃণার কথা শুনিয়াছ? বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে রীপণ প্রথম আমাদিগকে প্রকৃত খ্রীষ্টান চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। খ্রীষ্টান কাহাকে বলে পুস্তকে পড়িয়াছি—বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আজ রীপণে প্রথম দেখিলাম। এ চরিত্র যাঁহার, তিনি জগতের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ মনুষ্য। এ রকম আদর্শ-চরিত্র যে আমাদিগকে দেখাইল, সে আমাদিগকে না দিল কি? স্বাধীন প্রেস, প্রধান-বিচার-পতিত্ব, আত্ম-শাসন, ইত্যাদি, সবই দুই দিনের জন্য—আদর্শ-চরিত্র অনন্তকালের জন্য। সেই আদর্শ-চরিত্র রীপণ দেখাইয়াছেন। তাই ফলাফল তুচ্ছকারী মহত্ত্বপ্রিয় মহান্ হিন্দুর কাছে রীপণ আজ দেবোপম পুরুষ—দেবপূজায় পূজিত। এ পূজা শুধু রীপণের পূজা নয়, হিন্দুরও পূজা। ফলাফল বিচারক, উপকারাপকার গণনকারী ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছ-বৎ পতিত হিন্দু এ পূজার অর্থ বুঝিবে না।

আর একটি বড় কথা, দুই কথায় বলি। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী যে রকম প্রাচীন, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মনা, ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মপ্রিয়, তাহাতে প্রবীণ, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মনা, ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মপ্রিয় রীপণ ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বটে। রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, কিন্তু যত ইংরাজ রাজপুরুষ এদেশে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল তিনিই সেই সিংহাসনের পাদমূলে বসিয়া ভারত শাসন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। এই জন্যই ভারতবাসী তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছে; যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে কি প্রীতির উচ্ছ্বাস হয়!

পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব।

নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, "বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের শেষ কথা কয়টি এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনারূপে পুনরুক্তি করা আবশ্যক।—

"ভক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন ঐতিহাসিক আদর্শ আছেন। তাঁহার জন্মগ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভাগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা অতি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা বারান্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব।"

বারান্তরে বটে, কিন্তু এবারে নয়। অগ্রে পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে, ঐতিহাসিক অবতারের কথা হৃদগত করিয়া বুঝা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্য এবার, অগ্রে, পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ঈশ্বর অবতারের নানা রূপ সিদ্ধান্ত আছে। কেহ বলেন, এই সমস্ত জড়-জীব জগৎ, সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে ঈশ্বরের অবতার। সমষ্টিতে এক এবং অদ্বৈত অবতার; ব্যষ্টিতে অনন্ত এবং অসংখ্য অবতার। মানবের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ীভূত হইয়া ঐশীশক্তির যেখানেই বিকাশ দেখিবে, সেইখানেই বুঝিবে জগদীশ্বরের অবতার। বনে, উপবনে,—গহনে, কাননে,—পর্ব্বতে, সাগরে,—মানবে, দানবে,—কীট, পতঙ্গে,—ফুলে, ফলে,—সর্ব্বত্রই তাঁহার শক্তি ঝল মল করিতেছে। সর্ব্বত্রই তিনি সশরীর বিরাজমান, সর্ব্বত্রই তাহার অবতার; এই পৃথিবী অবতারময়ী।

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ঐশীশক্তিতে অবতার উপলব্ধি করা ভক্তির চরম দশা বটে, কিন্তু অবতার বলিলে আমরা ওরূপ বিশ্বগ্রাসী কোন ভাব বুঝি না। যে স্থলে আমরা ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখি, আমরা সেই স্থলেই অবতার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। মানবে ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশকে প্রতিভা বলা যায়। "প্রজ্ঞা নব নবোন্মেষশালিনী-প্রতিভা

মতা।” জগৎস্রষ্টার সৃষ্টিকারিণী শক্তি মানব হৃদয়ে প্রতিভা রূপে প্রতিভাত হয়; সেই শক্তি তখন মানব হৃদয়েই সৃষ্টিকারিণী, নব নবোন্মেষশালিনী হয়, এবং সেই মানব জগদীশ্বরের অবতাররূপে পরিগণিত হন। কপিল কোম্‌ত্, ধন্বন্তরি, নিউটন,—ব্যাস, বাল্মীকি, ইহারা সকলেই অবতার।

কেহ কেহ বলেন, কেবল মাত্র ধার্ম্মিক পুরুষগণই প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের অবতার। জগদীশ্বর ধর্ম্মময়, ধর্ম্ম-ধৃক্, ধর্ম্ম-শক্তি; সেই ধর্ম্মই যাঁহাদের জলন্তজীবন, ধর্ম্মই যাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের প্রসরক্ষেত্র, তাঁহারাই মুখ্য কল্পে অবতার। তবে গৌণকল্পে, রূপকের ভাষায় অন্যান্য প্রতিভা সম্পন্ন জনগণকেও কখন কখন অবতার বলা গিয়া থাকে। এই মতে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মূশা, ঈশা, নানক প্রভৃতি সকলেই অবতার।

খ্রীষ্টানের মতে, কেবল মাত্র ঈশাই দেব-নর বা নর-দেব, অর্থাৎ অবতার। মূশা প্রভৃতি ঈশ্বরের করুণা কটাক্ষে অতিমানুষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অবতার নহেন। খ্রীষ্টানের মতে নরের প্রধান গুণ আত্মদান। নরের সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রধানা শক্তি ক্ষমা। এই ঐশ্বরিক অপূর্ব্ব পিতৃ শক্তি ক্ষমা, এবং মানবীয় ঐ প্রধান গুণ সন্তানের আত্মোৎসর্গ—বাক্য এবং অর্থের মত মিশ্রিত হইয়া—যীশু-জীবন; সুতরাং যীশুখ্রীষ্ট দেব হইয়া নর; নর হইয়া দেব। তিনিই নর-দেব ও দেব-নর; তিনিই এক মাত্র অবতার।

পুরাণের অবতারতত্ত্ব বিচিত্র। কোন কোন পুরাণে পূর্ণাবতার, এবং অংশাবতার, এই দুই ভাগে অবতার ভেদ করা হইয়াছে।* শ্রীমদ্ভাগবত বলেন;—

এতেচাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা কহিলাম, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের কেহ কেহ অংশ এবং কেহ কেহ কলা; কিন্তু কৃষ্ণাবতার আবিষ্কৃত সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ। এই জগৎ দৈত্যকুল কর্ত্তৃক উপক্রত হইলে,

---

* বঙ্কিমবাবু পূর্ণাবতারেরই অবতারত্ব স্বীকার করেন। সেইজন্যই তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ঈশ্বরাবতার বলেন। “প্রকৃত বিচারে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এবং রামচন্দ্রের সে পদ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।” প্রচার।

ভগবান্ ঐ সকল মূর্ত্তিতে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বিনাশ করত লোক সকলকে সুখী করেন। [শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতব্যাখ্যানুবাদ।]

পরন্তু অনেকগুলি পুরাণের মত এই যে কেবল পালন কার্য্যের জন্যই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সৃজন এবং সংহরণে অবতারের কোন প্রয়োজন নাই। এইজন্য কেবল বিষ্ণু বা নারায়ণেরই অবতার হইয়া থাকে, অন্য কোন দেবতার অবতার নাই। তবে যে হনুমানকে রুদ্রাবতার বলিয়া বা বলরামকে অনন্ত বা সঙ্কর্ষণাবতার বলিয়া উল্লেখ আছে, তাঁহারা কেবল নারায়ণাবতারের সহায়রূপে পরিগণিত মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

> ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোক-ভাবনঃ।
> লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্ নরাদিষু॥

অপিচ এই লোক-ভাবন ভগবান সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া লীলা বশত দেবতির্য্যক্ নরাদিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনুরক্ত হইয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করেন। [বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যানুবাদ]

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে ;—

> অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃসত্ত্ব নিধের্দ্বিজ।
> যথাবিদাসিনাঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥
> ঋষয়ো মনবো দেবাঃ মনুপুত্রাঃ মহৌজসাঃ
> কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয় স্তথা। *

হে দ্বিজ জলাশয় হইতে নদী, খাল, প্রভৃতি যেমন সহস্র প্রকার হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণ প্রধান হরির অসংখ্য অবতার। ঋষি, মনু, দেব, মহাবিক্রম মানব, প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই সেই হরির কলা মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণের একস্থানে কথিত হইয়াছে যে ;—

> মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা।
> সাত্ত্বিকোহংশঃ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম !॥

ব্রাহ্মণ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর সাত্ত্বিক অংশ এবং ইহারাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন।

> চতুর্যুগেহপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ।
> যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তৎ শৃণু॥

মৈত্রেয়, জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারি যুগে যে প্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদি স্বরূপধৃক্।
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূত হিতে রতঃ॥

তিনি প্রথমত সত্য যুগে সর্ব্বভূত হিতার্থে কপিলাদিরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকল প্রাণীকে পরম সত্যজ্ঞান দান করেন।

চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্রয়ম্॥ ৫৫॥

ত্রেতা যুগে সেই প্রভু চক্রবর্ত্তি স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক দুষ্টগণের দণ্ডবিধান পূর্ব্বক ত্রিলোক রক্ষা করেন।

বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা শাখা শতৈর্বিভুঃ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাস স্বরূপধৃক্॥

তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস রূপ ধারণ পূর্ব্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বিভক্ত করেন। এবং পুনর্ব্বার উহা বহুল অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ।
কল্কিস্বরূপী দুর্ব্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ॥

তিনি বেদব্যাসরূপে এই প্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির অবসানে কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন।

[বরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সানুবাদ বিষ্ণুপুরাণ।]

উপরের ঐ কয়টি শ্লোক হইতে মোটামুটি এই বুঝা যায়, যে ভগবানের সত্ত্ব-গুণাংশে অর্থাৎ নারায়ণাংশে লোক পালনের জন্য যুগে যুগে ভগবান মানব আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণের অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে;—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীর গ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্॥

দুঃখপ্রাপ্তিহেতু বা সুখপ্রাপ্তিহেতু, ধর্ম্মহেতু বা অধর্ম্মহেতু, তুমি শরীর পরিগ্রহ কর না, পরন্তু তুমি একমাত্র ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়া থাক।

[ঐ ঐ সানুবাদ বিষ্ণুপুরাণ।]

মহাভারতান্তর্গত ভগবদ্গীতায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে ;—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধনের জন্য এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতগণের দুর্গতি সাধন এই দুইটি ধর্ম্ম সংরক্ষণের অনুষঙ্গ বলিলেও বলা যায়; সুতরাং ধর্ম্ম সংরক্ষণই ঈশ্বরাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকগুলি পুরাণই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিবেচনা করিলে নারায়ণের কেবল মাত্র মানবাবতার হওয়াই সম্ভব। সেই মানবও প্রদীপ্ত প্রতিভা পূর্ণ এবং অতুল ধর্ম্ম-শক্তি সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব।

কিন্তু পুরাণে মীন কূর্ম্মাদিওত নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল কথার অর্থ কি? ধর্ম্ম স্থিতি সংরক্ষণাদি জন্য ভগবান মীন কূর্ম্মাদি-রূপ পরিগ্রহ করিলেন কেন? এই সকল পৌরাণিকী কথার কি কোনরূপ পৌরাণিক অর্থ নাই?

অনেকের মনে অবতার তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সংকল্প বাদ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ অনেকে এই রূপ মনে করেন, যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, বা ধর্ম্ম-সংরক্ষণ জন্য ভগবান সময় বিশেষে, হয়ত দেব মানব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হন। তাহাতে ভগবানের বিশেষ সংকল্প থাকে এবং তাঁহাকে সেই জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তবিক পৌরাণিক বৃত্তান্তের ভাষা দেখিলে, ঐরূপ বোধ হয় বটে। কিন্তু পৌরাণিক তত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের এটুকু বুঝা চাই, যে অনেক সময়েই পুরাণের ভাষা সম্পূর্ণরূপে রূপকের ভাষা। যদি যাত্রা শুনিতে গিয়া কেহ বাস্তবিক মনে করেন, যে সত্য সত্যই মা যশোদা বালক কৃষ্ণের দেখা পাইয়া ভৈরবী রাগিণীতে—

"হারাণ ধন আয় রে রতন মণি কোলে করি তোরে।
তোরে বুকে রেখে বদনখানি হেরি রে।"

বলিয়া গান গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যেমন ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি, পুরাণাদির ভাষা মাত্র বুঝিয়া যিনি সত্য সত্যই মনে করেন, যে নারায়ণ বিশেষ সংকল্প করিয়া কার্য্য বিশেষের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেও আমরা সেইরূপ ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি।

বাস্তবিক জগদীশ্বরে সংকল্প বিকল্প; কৌশল, অকৌশল আরোপ করা বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। মনুষ্য অবশ্য মনুষ্য ভাবেই ঈশ্বরভাব বুঝিবে; আপনার প্রজ্ঞার প্রকৃতি মনুষ্য কোন কালেই পরীবর্ত্তন করিতে পারে না। আমরা ঈশ্বরকে অগত্যা মানব মনের বিষয়ীভূত করিয়া তাঁহার প্রকৃতির একরূপ ক্ষীণধারণা করিতে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু ঈশ্বর আলোচনার সময় এতটুকু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে ঈশ্বরে অগত্যা আমরা মানবীয় গুণ আরোপ করি বলিয়া, আমরা আবার সেই সকলকে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐশ্বরিক গুণ মনে করিয়া, কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে যেন না যাই।

য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানে এইরূপ সিদ্ধান্ত ও বিতণ্ডার বড়ই বাড়াবাড়ি। মানবীয় দয়া প্রথমে ঈশ্বরে আরোপিত হইল; তাহার পর ঈশ্বর পূর্ণ বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির করা হইল, যে তিনি পূর্ণ দয়ালু অর্থাৎ পরম দয়ালু। আবার আর একদিক দেখিয়া স্থির হইল, ঈশ্বর ন্যায়পর, পরম ন্যায়পর। তাহার পর বিতণ্ডা বাধিল, যে যদি পরম ন্যায়পর, তবে আবার তিনি পরম দয়ালু কি রূপে? যদি পরম দয়ালু তবে আবার পরম ন্যায়পর কেমন করিয়া?

এইরূপে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার সহিত তাঁহার কৌশলময় ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধ। জগতের অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া কৌশলীর অনুমান অবশ্য-ম্ভাবী,—এই যুক্তি আস্ফালন দিন কতক য়ুরোপে বড়ই হইয়াছিল; মিল বলিলেন, যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বল, তাঁহাকে আবার কৌশলী বলিতেছ কেন? ঘড়িওয়ালা সহজে দুইটা কাঁটা ঘুরিবার উপায় করিতে পারে না বলিয়াই ত, স্প্রিং, লীবর, চাকা, ফ্লাইহুউল, কত কি যোজনা করে; তাহার শক্তি নিতান্ত অল্প বলিয়া সে কৌশল করিতে যায়। তবে আবার যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহাকে কৌশলী বলিবে কেন?

আমরা বলি ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় ঈশ্বরে মানবগুণ আরোপ করিতে আমরা বাধ্য হই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এত টুকু জ্ঞান কেন থাকিবে না, যে সেই সকল আরোপিত গুণ লইয়া আবার বিচার বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইব।

অতএব অবতার তত্ত্বের সহিত সংকল্প বাদ বা সংকল্পময় কৌশল বাদ আমরা একেবারেই মিশ্রিত করিব না।

কোন পুরাণে ২৪টি অবতার: কোন খানিতে ২২টি* কোথাও ১৮টি;

* শ্রীমদ্ভাগবতে ২২টি অবতারের উল্লেখ আছে; (১) বিরাট।

কোথাও বা ১০টি। বর্ত্তমান কালের সাধারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাসে দশটি অবতারেরই প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই দশটির নাম এবং ক্রম সকলেই জানেন। (১) মৎস্য। (২) কূর্ম্ম। (৩) বরাহ। (৪) নৃসিংহ। (৫) বামন। (৬) পরশুরাম। (৭) রাম। (৮) বলরাম। (৯) বুদ্ধ। (১০) কল্কী। বরাহ পুরাণ প্রভৃতিতে ঐ রূপ নাম ও ক্রম আছে; বাঙ্গালায় জয়দেব ঠাকুরের প্রসাদে এই মতই গৃহে গৃহে গীত হইয়া প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া গণিত নহেন; তিনি পূর্ণাবতার। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে দশমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

এই দশাবতার সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ বলেন;—

যদ্‌যদ্ভাবগতো জীবস্তত্তদ্ভাবগতো হরিঃ।
অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কূর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ॥
নৃসিংহো মধ্যভাবোহি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা॥
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কল্কিরেব চ॥
অবতারা হরের্ভাবাঃ ক্রমোর্দ্ধগতিমদ্ধৃদি।
ন তেষাং জন্মকর্ম্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ত্ততে ক্বচিৎ॥
জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ।
কালোবিভজ্যতে শাস্ত্রে দশধা ঋষিভিঃ পৃথক্॥
তত্তৎকালগতো ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ।
সএব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারো হরেঃ কিল॥

---

(২) বরাহ। (৩) নারদ। (৪) নরনারায়ণ। (৫) কপিল। (৬) দত্তাত্রেয়। (৭) যজ্ঞ বা ইন্দ্র। (৮) ঋষভ (৯) পৃথু। (১০) মৎস্য। (১১) কূর্ম্ম। (১২) (১৩) ধন্বন্তরি, মোহিনী। (১৪) নারসিংহ। (১৫) বামন। (১৬) পরশুরাম। (১৭) ব্যাস। (১৮) নরদেব বা রাম। (১৯) (২০) রাম, কৃষ্ণ। (২১) বুদ্ধ। (২২) কল্কি। দশমাবতার মৎস্যের বিবরণ এইরূপ;—

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে
নাব্যারোপ্য মহীময্যা মপাদ্বৈবস্বতং মনুং।

এই বর্ণনায় য়ুদীয় পুরাণোক্ত নোয়ার নৌকা দ্বারা সৃষ্টি রক্ষার কথা স্পষ্টই লক্ষিত হয়।

মায়াবদ্ধ জীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান তখন মৎস্যাবতার। মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার, বজ্রদণ্ড ক্রমশ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার হন। নরপশু ভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কল্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্য সকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটি একটি অবস্থান্তর লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। [শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা।]

ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীবের ক্রম বিকাশ অনুসারে বিষ্ণু অবতারেরও ক্রম বিকাশ হইয়াছে। জীবের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক হইলেও তাহার মধ্যে মধ্যে সন্ধি বা গ্রন্থিস্বরূপ একটি একটি পরিচ্ছেদ আছে; সেই এক এক পরিচ্ছেদে এক একটি বিষয়ের চরমোৎকর্ষ হয়। তাহার পর হইতে অন্যরূপ বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই সেই সন্ধিস্থলে জীবের চরমোৎকর্ষ ভাবই, ঈশ্বরের অবতার। এইরূপে অবতার তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে দেখা যায়, যে ইহাতে মানবাবতার গুলিতে প্রতিভা থাকিতেই হইবে, এবং কাজে কাজেই সেগুলি আদর্শ হইয়া উঠিবে।

এখন জীব বিকাশের সন্ধিস্থলে মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি কিরূপে আসিল, তাহাই বুঝিতে হইতেছে। জীব বিকাশ বা জড়বিকাশ তত্ত্ব, হিন্দু পুরাণ দর্শনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আধুনিক য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে বিবর্ত্তবাদ কিছু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এইস্থলে য়ুরোপীয় বিবর্ত্তবাদের সাহায্য লইয়া এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুপ্রসিদ্ধ ডারবিন্ বৈদেশিক বিবর্ত্তবাদের অধিনেতা, সৌভাগ্যক্রমে জীবের ক্রম বিকাশ কথায় আমরা তাঁহারই সাহায্য পাইয়াছি। ডারবিন্ বলেন;—

We thus learn that man is descended from a hairy quadruped furnished with a tail and pointed ears, probably arboreal in its habits, and an inhabitant of the old world.****This quadrumana

with all the higher mammals are probably derived from an ancient *marsupial animal,* and this through a long line of diversified forms either from some reptile-like or some *amphibian-like creature,* and this again from some *fish-like* animal.

Chap. XXI. Part 2. Vol. II. *Descent of Man. Darwin.*

এইরূপে আমরা বুঝিলাম, যে কোন একরূপ লোমশ, সকোণ কর্ণ বিশিষ্ট, এবং সম্ভবত বৃক্ষচর জম্বুদ্বীপবাসী চতুষ্পদ পশু হইতেই মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। * * * * * * এই চতুষ্পদ জীবের এবং সকল প্রকার উচ্চতর শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি সম্ভবত কোনরূপ পুরাকালিক বৃহৎ গর্ভ-কোষ-বিশিষ্ট জীব হইতে হইয়া থাকিবে। কোনরূপ সরীসৃপবৎ, অথবা কোনরূপ উভচর জীব হইতে আবার সেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, এবং সেই উভচর জীব কোনরূপ মৎস্যবৎ জীব হইতে উৎপন্ন।

অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ পর্য্যালোচনায় ডারবিন্ এইরূপ অনুমান করেন, যে উচ্চতর জীব সৃষ্টিতে প্রথমে মৎস্য, পরে উভচর (কচ্ছপ), তাহার পর বরাহের মত কোনরূপ বৃহজ্জঠর জীব, তাহার পর লোমশ কোন পশু, এবং পরে মানব শরীর বিকশিত হইয়াছে। সেই আদি মানবগণ প্রথমে খর্ব্ব বা বামন ছিল, এমন সিদ্ধান্তও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে দেখা যায়। সুতরাং পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে জীব সৃষ্টির যেরূপ ক্রম বিকাশের আভাস দেখাযায়, তাহা যে নিতান্ত আধুনিক বিবর্ত্তবাদের বিরোধী তাহা বোধ হয় না। বরং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ *, বামন—এইরূপ ক্রমই বিজ্ঞান সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রথম পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাশে উৎকৃষ্ট জীব মানবের অবতারণা বুঝিলাম। তাহার পর, মানবের সামাজিক বিকাশ; এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি; অবতারও তিনটি। পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম।

পরশুরামাবতারে বাহুবলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য,

---

* ঠিক নৃসিংহ ভাব অবশ্য ডারবিন্ হইতে পাওয়া যায় না, তবে পুরাণে যখন নৃ-সিংহকে নৃ-বরাহও বলা হইয়াছে, তখন নৃ-মর্কট বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

নৃ-বরাহস্য বসতির্মহর্লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
নৃসিংহস্য তথা প্রোক্তা জন লোকে মহাত্মনঃ॥ পাদ্ম।

সর্ব্বত্রই বন্যমানুষ মাংস-লোলুপ হিংস্রজীব; তাহাতে বামনাবতারের পূর্ব্বাবতার নৃ-মর্কট না হইয়া নৃসিংহ বৎ হওয়াই পৌরাণিক মতে সম্ভব।

জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ব্রতী ছিলেন, কিন্তু পরশুরামে সেই ব্রতের পরাকাষ্ঠা; পরশুরাম ভারতের উত্তরের ক্ষত্রিয়গণকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া, এবং দক্ষিণে উপনয়ন দ্বারা নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ্যের প্রভুত্বের চরমোৎকর্ষে পরশুরাম অবতার।

মানবের সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্দ্র রাবণ জয় করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যেরূপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য স্থাপন করেন, তেমনই প্রজারঞ্জনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া রাজা নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্দ্র রাজাবতার। রাম রাজার তুল্য রাজা হয় না, রামরাজ্যের মত রাজ্য হয় না।

তাহার পর বলরাম। বলরামে সামাজিক তৃতীয় সোপান; বলরাম বাল্যে গোপালন নিরত; বয়সে হলধারী। বলরামে কৃষিযুগের উৎপত্তি; বলরামের সময়ে ভারতের গৃহবিবাদ শান্তিলাভ করিল; বলরামের হলই তাহার পর ভারতের প্রধান অস্ত্র হইল, মনুষ্য পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ হইতে বিষম রক্তারক্তির পর নিরস্ত হইয়া, সর্ব্বংসহা ধরণীর উপর আপনার অস্ত্র চালনা করিতে ব্যস্ত হইল; পূর্ব্বে ম্লেচ্ছ যবনের মত আর্য্যগণ মধুপর্কের জন্য গো-সেবা করিতেন; এই সময় হইতে প্রকৃত গোপালন হইতে লাগিল; হিন্দুর যথার্থ গো-সেবায় এবং কৃষিচর্চ্চায় ভারতবর্ষ অচিরাৎ ধন ধান্য দধি দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইল। ভারতের কৃষিযুগের মানব বৃন্দের সামাজিক উন্নিতির এই চরম সীমা।

তাহার পর আধ্যাত্মিক বিকাশ। ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের দুই অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য। প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি।

সামাজিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইতে আধ্যাত্মিক সোপান আসিল। সামাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বাস ঘোরতর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। বুদ্ধের একটি নাম বিজ্ঞানমাতৃক। শব্দটি শুনিলে বোধ হয়, যেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ওটি সৃজন করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা নহে; ওটি হেমচন্দ্রের অভিধান ধৃত বুদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ। বুদ্ধের ঐ নামকরণেই বুঝা যায়, যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যুক্তিই মূল। সেই যুক্তিতে বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইল। ইহাই ভক্তিহীন ধর্ম্ম যুক্তির শেষ সীমা। বুদ্ধ সেই যুক্তির অবতার।

যুক্তির নিরাশ্রয়তায় চক্ষুষ্মতী ভক্তির উৎপত্তি। এই ভক্তি অন্ধ বিশ্বাসের সহচরী নহে; ইহা যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়া যুক্তির কন্যা অথচ সংহারিণীরূপে অবনীতে অবতীর্ণা হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তির আবির্ভাবে, বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র। সেই ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য, তাঁহাতেই মানবের ধর্ম্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ। আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের ভক্তরূপে জন্ম গ্রহণের বিচিত্র কথার এইটি আমাদের প্রস্তাবনা।

[illegible] —ভারতের নিদ্রাভঙ্গ।

ভাঙিল কি ঘুম— এতদিন পরে—
ভাঙিল কি ঘুম ভারতমাতা ?
জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা ?
উঠ—উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবজন
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী—
ডাকিছে পারসী—পঞ্জাবী—শীক্,
ডাকিছে তোমার বীরপুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥
তোমার নন্দন মহম্মদীগণ,—
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে তোমায় সবে একস্বর
জাগো মা ভারত—জাগো মা ব'লে ; ॥
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান—
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ ॥
"আর ঘুমাইওনা' ব'লে কতদিন
কেঁদেছি—কেঁদেছে কত সে আর,
আজি জন্মভূমি জীবন সার্থক—
তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার ॥
কতবারই মাতঃ উদাসীর মত
দেখেছি তোমায় ভুবনময়
ঘুরেছি জনম কত দিকে কত
অরণ্য যেমন ছড়ায়ে রয় ॥
দেখেছি তোমার গিরি উপত্যকা,—
শস্যক্ষেত্র ভূমি, নগর, দেশ,

ছায়ামাত্র তার প্রাণিবৃন্দ যত
কালের কালীতে কালিম বেশ ॥
জীবনের বিন্দু না হেরি কোথাই,
সব শূন্যময়—সকলি খালি,
চারিদিকে যত নরাস্থি কঙ্কাল,
চারিদিকে ধূ ধূ করিছে বালি ॥
উঠ গো জননি দেখো চক্ষু মেলি
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে,
মৃদুল হিল্লোলে দেখো কি নিশ্বাস
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥
একমাত্র শ্বাস মিলিত ভারত
নাসিকারন্ধ্রেতে ছাড়িল যেই
কি মহা উৎসব বহিল উচ্ছ্বাসে—
ভারতে যাহার তুলনা নেই ॥
"আর ঘুমাইও না" ডাকি মা আবার
ভাবী আশাফল ভাবিয়া দেখো,
"রীপণ-উৎসব" সোণার অক্ষরে
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো ॥
শূন্যতল হ'তে নেমেছে পবন
বহিছে তোমার ভুবনময়,
নব-পল্লবিত করিতে তোমারে
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয় ॥
এ ধীর হিল্লোলে যে বায়ু উঠেছে
কার সাধ্য আর নিবারে তারে,
অগ্রসর গতি কেবা রোধে তার—
কেবা আর তারে বাঁধিতে পারে ?
নব শিখাময় নব প্রভারাশি
ভারত ভস্মেতে মিশেছে ফের,
যে অস্থি কোলেতে কাঁদিলে ভারত
সজীব হ'বে সে শিখাতে এর ॥

জীবন কাহিনী এ দহন শিখা
ভারত অন্তরে ধরেছে ধীরে,
নারায়ণ মুখে হয়েছে উদ্ভব—
ভারতের বুকে থাকিবে স্থিরে ॥
জ্বলিয়ে আরো এ যাবে যত কাল,
জ্ঞানের আলোক—বিদ্যুৎছটা
দমে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ
ধরে খরতর তেজের ঘটা ॥
ভুলো না ভারত "রীপণ-উৎসব"
ছিঁড়ো না যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত সন্তান
যেখানে যে থাকো—পরো যে সাজ ॥
মনে ক'রো সবে নিভৃতে—উৎসবে
"রীপণ-বিদায়" নহে এ খালি,
সম আশা ভয় ভারত অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি ॥
নহে আকস্মিক দৈব সুঘটনা—
বহুদিন হ'তে অঙ্কুর এর
জড়ায়ে জড়ায়ে ভারত অন্তরে
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফের ॥
আজি প্রস্ফুটিত হ'য়ে দিছে দেখা,
তরুমূল যেন পল্লবময়
ধরণীর গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে,
ফলে ফুলে শেষে সাজিয়া রয় ॥
ভারতের আশা ভারত-প্রত্যাশা—
জীবন উন্নতি ইহারই সার,
সুবারি-সেচক সে সব লতার
"রীপণ" কেবলি লক্ষ্য রে তার ॥
হবো অগ্রসর সেই আশাপথে
তিলেক তাহাতে নাহি সংশয়,

দিয়াছে যেখানে [illegible] যে পথ [illegible]
[illegible] পবিত্র [illegible] মিলন।
দিয়াছে [illegible] সেখানে [illegible]
দিয়াছে যখন যেখানে পথ,
আজি আর কালি তাহাতে পশ্রিব
সাধনে পুরাবো স্ব-মনোরথ ॥
আজি আর কালি পাবো রে সকলি—
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়,
সম তৃষ্ণাতুর সব পুত্র তার
একি পথপানে চাহিয়া রয় ॥
একি পথ পানে চাহে মহারাষ্ট্র
চাহে সে পারসী—পঞ্জাবী—শীক্,
চাহে ভারতের বীরপুত্রগণ—
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥
ভারতনন্দন মহম্মদীগণ—
তাহারাও আজি—জাগো মা-বলে,
সেই পথপানে একদৃষ্টে চাহে
সাধনা সাধিতে সে পথে চলে।
উঠ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোমায়
তোমার সন্তান যে যেথা আজ,
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদল
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥
একা বঙ্গ নয়— হিমালয় হতে
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ো নিদ্রা ঘোর
পূরিয়া নিশ্বাস ফেলোগো-মাতঃ,
দেখি কি না হয় [illegible]—
[illegible] ছটাতে প্রভাত [illegible] ॥

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবজীবন।

১ম ভাগ। } মাঘ ১২৯১। { ৭ম সংখ্যা।

সঙ্কর্ষণাগ্নি,—অনন্ত—বলরাম।

সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, পরলোক প্রভৃতি তত্ত্ব সমূহ পুরাণশাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণে অর্থবাদ বিস্তর। শাস্ত্রবিচারে অর্থবাদ প্রমাণ হইতে পারে না। অর্থবাদ বাক্যসমূহকে ব্যতিরেকপূর্ব্বক বেদ ও স্মৃতি-মূলক সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। পুরাণ শাস্ত্রে পৃথিবীর অভ্যন্তর-নিহিত সঙ্কর্ষণ নামক তমোগুণ-প্রতিপালিত এক মহাভয়ঙ্কর অগ্নির উল্লেখ আছে; এবং বিশ্বের প্রাণস্বরূপ 'ব্রহ্মা' নামক ঈশ্বরাধিষ্ঠানের স্থিতি, নিদ্রা ও প্রলয়-কাল সম্বন্ধে বিস্তর অঙ্কপাত আছে। সে সমস্ত তত্ত্ব সামান্যবুদ্ধির অনুগত নহে। ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহা ভাল লাগে না। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক বা শ্রোতার নিকট অর্থবাদ প্রতিবন্ধক হয় না। অশ্রদ্ধালুর নিকট অর্থবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেও ফল হয় না। তথাপি শাস্ত্রানুরাগী জনগণের বোধ সৌক-র্য্যার্থে আমরা উক্ত তত্ত্ব সমূহের মর্ম্মোদ্ভেদে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইতেছি।

উপরি উক্ত তত্ত্বচয়ের মধ্যে সঙ্কর্ষণাগ্নি নামক তত্ত্বটি এই প্রস্তাবের বিচার্য্য বিষয়। এই অগ্নি প্রলয়ের এক প্রকার কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে। 'সঙ্কর্ষণ' শব্দের অর্থ 'আকর্ষণ'। ভাগবতে আছে;

'সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণং সঙ্কর্ষণমিত্যা-চক্ষতে'। (৫।২৫।১)

ভগবদ্ভক্ত জনগণ তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলেন, কেন না আমি ও আমার ইত্যাদি সংসারাভিমান দ্বারা তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য এই যে, সেই সঙ্কর্ষণ নামক কালাগ্নির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা তমোময় অধোভুবন হইতে সকলকে তামসিক প্রলোভনে আকর্ষণ করিতেছেন। তাহাতে স্বার্থপরতা উৎপন্ন হওয়াতে সংসার স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। সয়তান যেমন ঈব ও আদমের সাংসারিকতা উৎপত্তির হেতু, সেইরূপ তিনিই সংসারের মল-বৃদ্ধির হেতু। এই অভিমান ও প্রলোভনরূপ মলহেতুত্ব জ্ঞাপনার্থে শাস্ত্র তাঁহাকে মদোন্মত্ত বিশেষণ দিয়াছেন।

'নীলবাসামদোৎসিক্তঃ।' (বিঃ পুঃ ২।৫।১৭।)

তাঁহার পরিধান নীলবসন এবং তিনি সর্ব্বদা মদোন্মত্ত।

পুনশ্চ ;

'উপাস্যতে স্বয়ং কান্ত্যা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া।' (ঐ।১৮)

তিনি কান্তি অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সুরাদেবী কর্ত্তৃক উপাস্য হয়েন।

প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রলোভন ও স্বার্থরূপ সেই মল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ধরণীর ভোগ ও ভোগ্যশক্তিকে বিনাশ করে। তখন এইভূমণ্ডল ঐ সঙ্কর্ষণ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সাধনা দ্বারা উক্ত প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কেবল যোগিগণই তাহার অধিকারী।

'সঙ্কর্ষণ' শব্দের আর এক অর্থ "সম্যক প্রকারেণ লাঙ্গলাদিনা ভূম্যাদি কর্ষণং।" অর্থাৎ ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধিকরণ। ঐ অগ্নিকে, এস্থলে তদীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরিকল্পনা পূর্ব্বক তাঁহার লক্ষণ নিরূপণ করা হইতেছে তিনি যেমন প্রলোভনের মূর্ত্তি—বাড়বানলরূপ পাতালাগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেইরূপ তিনি কৃষিকর্ম্মেরও অধিষ্ঠাতৃরূপে কথিত হন। তাৎপর্য্য এই যে এই সংসারের স্থিতিকালে পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী ঐ মহান্ অনল কৃষিকর্ম্মের উত্তরসাধকরূপ-উর্ব্বরাশক্তি-সম্পাদক। প্রলয়কালে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী দগ্ধ হয় সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া পুনঃ সৃষ্টিতে অধিকতর উর্ব্বরতা হইয়া থাকে। তাঁহার এই লক্ষণটি জ্ঞাপন করিবার জন্য বলরামরূপে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। 'সঙ্কর্ষণোবলদেবইত্যমরঃ।' 'লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রঃ' (বিঃ পুঃ ২।৫।১৮) তাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল আছে। এই লাঙ্গল চিহ্ন তৎসম্পাদ্য কৃষিশক্তি ও উর্ব্বরতাশক্তির জ্ঞাপক।

সঙ্কর্ষণাগ্নির আরও কয়েকটি লক্ষণ আছে। তাহা প্রধানতঃ প্রলয়া

স্বরূপ। দ্বিতীয়ত তাহা ভূমণ্ডলের শূন্যাবস্থান শক্তিস্বরূপ, ভূতলের উন্নয়ন-শক্তিরূপী ও তাহার দার্ঢ্যসম্পাদক। এই লক্ষণসমূহ জ্ঞাপনার্থ তাহা অনন্ত-দেব বা শেষনাগরূপে কথিত হয়। শুকদেব কহিলেন—

"তস্য (পাতালস্য) মূলদেশে ত্রিংশযোজন সহস্রান্তর আস্তে, যাবৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি' (ভাঃ বঃ ৫।২৫।১)

পাতালের মূলদেশে সহস্র যোজনের অন্তরে ত্রিংশ যোজনের মধ্যে ভগবানের তামসী নামে বিখ্যাতা এক কলা আছে। তাহার নাম অনন্ত। 'সঙ্কর্ষণ-মিত্যাচক্ষতে' তাহার আর এক নাম 'সঙ্কর্ষণ'।

"পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ"॥ (বিঃ পুঃ ২।৫।১৩)।

পাতালের অধোদেশে বিষ্ণুর এক তামসী মূর্ত্তি আছে।

'শেষাখ্যা যদ্‌গুণান্ বক্তুং নশক্তা দৈত্যদানবাঃ॥' (ঐ)

তাঁহার নাম শেষ। পুনশ্চ "যোঽনন্তঃ" তিনিই অনন্ত নাগ। তিনি নীলবাসা অর্থাৎ নীলবর্ণ।

"কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ।
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্।" (ঐ ১৯)।

প্রলয়কালে তাঁহার মুখ হইতে বিষানলশিখা-সমুজ্জ্বলিত সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্রমূর্ত্তি অগ্নি নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকে।

এস্থলে তাঁহার মুখ ও সেই মুখ হইতে রুদ্রমূর্ত্তির উদ্ভব ঔপচারিক ভেদ মাত্র। মূলত অগ্নি-প্লবনই তাৎপর্য্য। ভূগর্ভে নানাবিধ ধাতুরূপ উপাধিতে স্থিতি করায় উহা নীলবর্ণ অগ্নি। তমোগুণে প্রতিপালিত কালানল স্বরূপ। সেই অগ্নির আর এক লক্ষণ এই যে, তাহার মস্তকে এই অবনীমণ্ডল অবস্থিত আছে।

"স বিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্।
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষ সুরার্চ্চিতঃ॥" (বিঃ পুঃ ২।৫।২০)।

অশেষ সুরগণ কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত শেষমূর্ত্তি ভগবান পাতালতলে অবস্থিতি পূর্ব্বক মস্তকের শেখর স্বরূপ সমুদয় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন।

"তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।" (ঐ ২৭)

সেই নাগরাজের ফণা দ্বারা এই অবনীমণ্ডল বিধৃত হইয়া আছে।

"যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদা-ঘূর্ণিত লোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাব্ধিতোয়াব্ধি কাননা।" (ঐ ২৩)

এই অনন্ত যখন মদঘূর্ণিতলোচন হইয়া জৃম্ভা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে পর্ব্বত, সমুদ্র ও কানন সমূহের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে যে সঙ্কর্ষণানলে ভূমণ্ডল দগ্ধ হয় তাহা রুদ্রমূর্ত্তি, অতি ভয়ানক। তাহা সেই অনন্ত নাগাগ্নির গ্রাসরূপী। কিন্তু জলকম্প বা ভূমিকম্প কালে যে অগ্নি সাগরের তলদেশে বা ভূগর্ত্ত মধ্যে বিলোড়িত হয় বা আগ্নেয়-গিরি-বিবর ভেদ পূর্ব্বক উত্থিত হয় তাহা সেই সঙ্কর্ষণেরই জৃম্ভা স্বরূপ। অর্থাৎ তাহা স্বতন্ত্র অগ্নি নহে। ঐ সঙ্কর্ষণাগ্নিরই শাখা প্রশাখা বিশেষ; যাহা আগ্নেয় ভূধর তলস্থ গভীর বিবর সমূহে অবস্থিতি পূর্ব্বক নীলবর্ণ বা তমোময় অবয়বে অহরহ প্রজ্বলিত থাকিয়া পাতালস্থ জলকে উত্তপ্ত করত প্রভূত বাষ্প সহকারে অবনীপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত করে, এবং কখন কখন ভূধর বিদারণ, তরলধাতু পদার্থ উদ্গীরণ, উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশিদ্বারা গগনমণ্ডলে মেঘমালা উৎপাদন, পয়োধিকম্প ও ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত করিয়া থাকে। এ সমস্তই সেই পাতালস্থ অনন্ত নাগাগ্নির ক্রিয়া। অতএব ভারতবাসীরা শাস্ত্রানুসারেই বলিয়া থাকেন যে, সেই নাগরাজ বাসুকির জৃম্ভা বা মস্তক বিলোড়ন দ্বারা ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পৌরাণিক অর্থবাদ ও অলঙ্কার বর্জন পূর্ব্বক বুঝ, জানিতে পারিবে যে ভূমিকম্প, জলকম্প প্রভৃতি ঐ চিরপ্রতিপালিত ভূগর্ত্তস্থ অনন্ত অগ্নিরই কার্য্য। ঐ তাৎপর্য্য সংবৃত রাখিয়া উষ্ণকুণ্ড বা আগ্নেয়-জলকে নাগকূপও কহা গিয়া থাকে। ঐ অগ্নির স্থূলাংশ ধরণীর অভ্যন্তরে গভীর বিবর মধ্যে মহাব্যাপক ভাবে বাস করে এবং তাহার জ্বালাজিহ্বা সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা আগ্নেয় গিরি-গহ্বরে ও সাগরগর্ত্তে নির্গমন-পথ অন্বেষণ করে বলিয়া তাহাকে সহস্র-ফণা-যুক্ত অনন্ত-সর্প-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্বালামুখী, বাড়বানল, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি উষ্ণজলাশয় সমূহ সেই ভূগর্ত্তোত্থিত সহস্রমুখ নাগানলের উদ্গীরিত আগ্নেয় শাখা প্রশাখা কর্ত্তৃক উত্তপ্ত উদক-রাশিমাত্র। অতিপূর্ব্বকালে ভারতীয় জ্ঞানী লোকেরা এ সকল গভীর ভূতত্ত্ববিদ্যা অবগত ছিলেন। শাস্ত্রের বচন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের ব্যবহৃত শব্দ সমূহ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। তৎসমস্ত সহজ কথায় লিখিত থাকিলে এখন এত সন্দেহ জন্মিত না। কিন্তু পূর্ব্বকালে বিচার শাস্ত্র সমূহ ব্যতীত সহজ লেখার গৌরব ছিলনা। এখনও ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-দিগের মধ্যে সহজ-বর্ণনার যশ নাই তাহা অনেকে জানেন। এই কারণে ঋষিরা পুরাণশাস্ত্রে এত অলঙ্কার, রূপক ও অর্থবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাগ্নিকে "অনন্ত নাগ" কহিয়া কেন আবার "শেষ নাগ" কহিয়াছেন; বরং "অশেষ নাগ" বলিলেই অনন্তের অর্থ-বোধক হইত? এই কথার উত্তর এই যে নৈমিত্তিক-প্রলয়কালে ঐ অগ্নি সমস্ত দাহন ও জলপ্লাবন পূর্ব্বক পৃথিবীর তমোবীজ স্বরূপে অবশিষ্ট থাকে। তাহাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তখন ব্রহ্মা সেই অবশিষ্ট বীজকে আশ্রয় পূর্ব্বক শয়ন করেন।

"একার্ণবে তু তত্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ।"

তখন আদিদেব ভগবান হরি ব্রহ্মার রূপ ধারণ পূর্ব্বক একার্ণবে ঐ শেষ শয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে তিনি একার্ণবে ভাসমান থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ হয়। কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার "আপোনারা" প্রভৃতি শ্লোকের টীকায় ঐ অর্থকে এইরূপে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

'আপোঽস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতস্য পূর্ব্বময়নমাশ্রয়ইত্যসৌ নারায়ণ ইতি।'(মনু ১।১০)

প্রলয়কালীন জলরাশি ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়, এই জন্য তিনি নারায়ণ শব্দে কথিত হইয়াছেন। তথাচ কৌর্ম্মে "দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্যা তামসী শেষ সংজ্ঞিতা"। (৪৮অঃ)

অর্থাৎ উপরি উক্ত শেষমূর্ত্তিটি ভগবানের কালরূপা তামসী-শক্তি। তাহা ঐশীশক্তির তমঃপ্রভাব। তাহা প্রলয়কালে অগ্নি ও অগ্নিজ উদকপ্লাবনদ্বারা সমস্ত সংহার পূর্ব্বক নিদ্রাগত ব্রহ্মার প্রলয়-পয়োধি-বক্ষে শয্যারূপ হইয়া থাকে। তখনও ঐ শেষসংজ্ঞিত নাগের তমোময় রূপের অন্তর্দ্ধান হয় না। অতএব তাহা তখন সর্পরূপে থাকে বলিয়া কথিত হয়। ফলে পৃথিব্যাদি সুব্যক্ত পদার্থের অভাব বশত তখন তাহার কালানল ও মহাবিষ নিস্তেজ হইয়া যায়। অন্যান্য জলবাসী সর্প যেরূপ নির্ব্বিষ হয়, তখন ঐ সংহারানল জলবাসী হওয়াতে তাহারও আর বিষ থাকে না। কেবল সৃষ্টির শেষাংশ রূপে, ভাবি সৃষ্টির বীজরূপে, ভাবিধরণীর ধারণ-শক্তিরূপে এবং ভাবি-প্রলয়ের গুপ্তবীজরূপে অবস্থিতি করে।

এতাবতা সঙ্কর্ষণাগ্নির কয়েকটি অবয়ব প্রদর্শিত হইল। প্রলোড়ন, কর্ষণ, ভূধারণ, ভূকম্পোত্থান, ভূতলচ্ছটীকরণ, প্রলয়সাধন, অনন্তশক্তিত্ব ও শেষ

বীজস্ব এই সমস্ত উহার মূর্ত্তি। এই সমস্ত মূর্ত্তিতেই উহা হয় সর্প, না হয় অগ্নির স্বভাব প্রকাশ করে। প্রলোভন-মূর্ত্তিতে উহা যেন খলসর্প। কর্ষণে উহা অগ্নি। ভূমণ্ডল-ধারণে উহা যেন অনন্ততেজঃশক্তি। অর্থাৎ বিনা আধারে ভূমণ্ডল যে আকাশে স্থিতি করে তাহার শক্তি ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরেই আছে। ঐ অগ্নিই সেই শক্তি। অতঃপর উহাই ভূপৃষ্ঠকে নিম্নদেশে প্রোথিত হইতে না দিয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সদা উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার সুশীতল ঘনীভূত কঠিন বহিঃস্তরকে ধারণ করিতেছে। প্রলয় সম্বন্ধে উহা অগ্নি ও সংহার-বিষরূপী এবং প্রলয়পয়োধিতে উহা শেষ তামসবীজ।

অপরঞ্চ, অনুমান হয় পূর্ব্বকালে জ্যোতিষের কোনরূপ গণনা-সূত্রে সঙ্কর্ষণাগ্নিদ্বারা সামান্য সামান্য শুভাশুভ সংঘটনের কাল এবং প্রলয়-ঘটনের কাল নির্ণীত হইত। পক্ষান্তরে উক্ত অগ্নির উৎপাত সকল দেখিয়া জ্যোতিষ্কগণের শুভাশুভ ফলজনকত্ব নিরূপিত হইত। এক্ষণে সে বিদ্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত আছে,

"যমারাধ্যপুরাণর্ষি গর্গোজ্যোতীংষিতত্ত্বতঃ।
জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলং।" বিঃ পুঃ ২।৫।২৬

পুরাণ মহর্ষি গর্গ সঙ্কর্ষণনাগের আরাধনা করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের তত্ত্ব ও তাবিশুভাশুভফলজনক সুনিমিত্ত ও দুর্নিমিত্তাদি অবগত হইয়াছেন। এস্থলে গণিত ও ফলিত উভয় জ্যোতিষই অভিপ্রেত হইয়াছে। উল্লিখিত সুনিমিত্ত ও দুর্নিমিত্তাদির জ্ঞান যেমন গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চার-গণনায় লব্ধ হয়, সেইরূপ পশু পক্ষীর গতিবিধি ও রবাদি হইতেও পাওয়া যায়। মানবদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্পন্দন হইতেও লাভ করা যায়। (বিঃ পুঃ উইসন কৃত ইংটীকা ২।৫)। মহর্ষিগণ সঙ্কর্ষণাগ্নির ভাব গতিক হইতে ঐ সমুদয় লাভ করিতেন ইহাই তাৎপর্য্য। পুরাণ শাস্ত্রের এই উক্তিটি অর্থবাদ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ তত্ত্ব অবগত না হইলে নির্যাস করিয়া বলা অসম্ভব।